জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা

প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

উপক্রমণিকা

১.১ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের পটভূমি ০৩
১.২ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের ভিত্তি ০৪
১.৩ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন প্রক্রিয়া ০৯

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা : প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি

২.১ রূপকল্প ১২
২.২ অভিলক্ষ্য ১২
২.৩ শিক্ষাক্রমের ধরন ১২
২.৪ যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষা ১৩
২.৫.১ যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম: ১৪
২.৫.২ যোগ্যতার ধারণা ১৫
২.৫.২.১ মূল্যবোধ ১৮
২.৫.২.২ শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত গুণাবলি ১৯
২.৫.২.৩ শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা ১৯
২.৫.২.৪ জ্ঞান ২৪
২.৬ মূলনীতি ২৪
২.৭ মূল যোগ্যতা ২৫
২.৮ শিখন-ক্ষেত্র ২৬
২.৯ শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতা ২৭
২.১০ শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরের উদ্দেশ্য ২৯
২.১১ শিখন-ক্ষেত্র থেকে বিষয় নির্বাচন ৩০
২.১২ বিষয়, বিষয়ের ধারণায়ণ এবং বিষয় ও শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখনক্রম ৩১
২.১৩ মাধ্যমিক স্তর (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি) ৮৫
২.১৩.১ একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বিষয় নির্ধারণ ৮৫
২.১৩.২ একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির আবশ্যিক বিষয়সমূহের প্রকৃতি ও বিন্যাস ৮৬
২.১৪ শিখন সময় ও শিখন সময়ের বিষয়ভিত্তিক বণ্টন ৮৭
২.১৫ শিখন-শেখানো কৌশল ৯১
২.১৬ মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং ব্যবস্থা ৯৫
২.১৭ শিক্ষাক্রমে একীভূতকরণ ও জেন্ডার সংবেদনশীলতা ৯৯
২.১৮ সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষায় টিভিইটি বিষয় অন্তর্ভুক্তি এবং কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

Working Draft

ও প্রশিক্ষণ ধারার ৬ষ্ঠ থেকে মাধ্যমিকোত্তর (ডিপ্লোমা) স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের রূপরেখা ১০১
২.১৯ মাদ্রাসা শিক্ষার সংগে সমন্বয় ১০৪
২.২০ শিক্ষাক্রম বিস্তরণ ১০৬
২.২১ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ১০৬

Bibliography ১১০

Working Draft

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা - প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি

১.১ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের পটভূমি

প্রতিটি মানুষের প্রত্যাশা থাকে একটি পরিপূর্ণ জীবনের। সেই জীবন সে যেমন আনন্দময়, নান্দনিক ও মানবিক করে তুলতে চায়, ঠিক তেমনি চায় জীবিকার উপায় নির্ধারণে দক্ষতার পরিচয় দিতে। পাশাপাশি সে পারিবারিক, সামাজিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নিজেকে একটি অর্থপূর্ণ অবস্থানে দেখতে চায়। শিক্ষার প্রধানতম উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবনকে অর্থবহ করার দৃষ্টিভঙ্গি ও সুযোগ তৈরি করে দেয়া এবং একই সঙ্গে জীবিকা অর্জনের উপযোগী একজন দক্ষ ও মানবিক মানুষে পরিণত করা। কিন্তু পরিবর্তনশীল এই পৃথিবী মানুষের জীবন ও জীবিকার ধরনকে নিয়ত বদলে দিচ্ছে। বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বব্যবস্থা এই পরিবর্তনের গতিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, যার ফলে পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজনের কোন বিকল্প নেই।

বর্তমানে সমগ্র পৃথিবী জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করে চলেছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাত্রা পৃথিবীর ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে অভাবনীয় গতিতে এগিয়ে চলেছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ নজিরবিহীন পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে মানুষের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালীতে, যেখানে যন্ত্র ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক আরো নিবিড় হচ্ছে। এমনকি কাজের ক্ষেত্রে মানুষ এবং যন্ত্রের ভেতর ব্যবধানও অনেক কমে যাচ্ছে। এর ফলে বর্তমান সময়ের কর্মজগতের অনেক কিছুই ভবিষ্যতে যেমন বিরাজ করবেনা, ভবিষ্যতে তেমনি অনেক নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে যা বর্তমান সময়ে অবস্থান করে ধারণা করাও অসম্ভব। বিশ্বায়নের কারণে যেমন দেশে-দেশে, সমাজে-সমাজে ভৌগোলিক দূরত্ব ঘুচে যাচ্ছে, তেমনি আবার অবিমিশ্র নগরায়ণ, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্দেশিক অভিবাসন আমূল পাল্টে ফেলছে সনাতন গ্রামীণ সমাজ। পৃথিবী জুড়েই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটলেও, তার সুষম বণ্টন যেমন ঘটেনি, তেমনি সামাজিক উন্নয়নও তাল মেলাতে পারছেনা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতির সঙ্গে। যার ফলে এই একই পৃথিবীতে রয়ে গেছে ক্ষুধা, দারিদ্র, অশিক্ষার মত মৌলিক সমস্যাবলি। ঘনীভূত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন বা জাতিগত সহিংসতাজনিত সমস্যাসমূহ। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং মাত্রা।

এসব সমস্যা ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং সম্ভাবনার পূর্ণ সুফল গ্রহণের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক এবং যোগ্য বিশ্ব-নাগরিক দরকার। একবিংশ শতাব্দীর তথ্য ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেরকম নাগরিক তৈরিতে হিমশিম খাচ্ছে সনাতনী শিক্ষাব্যবস্থা। কারণ এই সনাতন মুখস্থ ও পরীক্ষানির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল আজ থেকে তিনশত বছর আগের তৎকালীন সমাজের জীবন ও জীবিকার প্রয়োজন মেটানোর জন্য, এরপর শিক্ষা-কাঠামোর গুণগত পরিবর্তন হয়েছে খুব কমই। এখন প্রয়োজন এমন সৃষ্টিশীল অভিনব শিক্ষাব্যবস্থা, যা নমনীয়, দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সক্ষম এবং উদ্ভূত আর্থসামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন চলমান পুরনো সমস্যার টেকসই সমাধান, আর নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার চেষ্টা ও আত্মবিশ্বাস।

এই সামগ্রিক বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এই অভিলক্ষ্য পূরণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার শিক্ষা। আর সেজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া

উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের শুরুটা হতে হবে অবশ্যই একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম উন্নয়নের মাধ্যমে যা সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে, বর্তমানে যা প্রচলিত আছে। সময়ের পরিক্রমায় প্রচলিত এই শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল ব্যাপী বিভিন্ন গবেষণা এবং কারিগরী অনুশীলন পরিচালিত হয়। তারই উপর ভিত্তি করে, প্রেক্ষাপট, প্রয়োজন এবং নতুন বিশ্বপরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য করে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১.২ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের ভিত্তি

গবেষণা ও বিশ্লেষণের আলোকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন মূলত পাঁচটি ভিত্তির দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এই পাঁচটি ভিত্তি হল:

- দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical foundation)
- মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Psychological foundation)
- ঐতিহাসিক ভিত্তি (Historic foundation)
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকার (Global and national priorities) এবং
- প্রমাণনির্ভর ভিত্তি (Evidence based Foundation)

দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical foundation)

শিক্ষাক্রমের একটি দার্শনিক ভিত্তি থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলত দার্শনিক ভিত্তিকে কেন্দ্র করে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য প্রভৃতি নির্ধারিত হয়। শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞরা (Ogwora et al., 2013) শিক্ষাক্রমের দার্শনিক ভিত্তিকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন : অপরিবর্তনশীলতা/অবিনশ্বরতাবাদ; অপরিহার্যতাবাদ; প্রগতিশীলতাবাদ এবং পুনর্গঠনবাদ।

অপরিবর্তনশীলতা/অবিনশ্বরতাবাদ (Perennialism)-এর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষাক্রমকে একটি গতানুগতিক অপরিবর্তনীয় এবং বিষয়ভিত্তিক ধারণানির্ভর টেকসই জ্ঞান-দক্ষতা-দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অপর দিকে অপরিহার্যতাবাদ (Essentialism) অনুযায়ী শিক্ষাক্রমের দার্শনিক উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং বিদেশি ভাষা শিক্ষা শিখনের মাধ্যমে সাক্ষরতা (3 R'S) অর্জন করানো। তৃতীয়ত, প্রগতিশীলতাবাদ (Progressivism) অনুযায়ী শিক্ষাক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো মানবজাতির দৈনন্দিন জীবন এবং সমস্যা নিয়ে শিক্ষার্থীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি জানা এবং আগ্রহ সৃষ্টি করা। এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর শিখন হতে হবে আন্তঃবিষয়ক (interdisciplinary), সমন্বিত (integrative) এবং প্রক্রিয়া হবে মিথস্ক্রিয়ামুলক (interactive)। সর্বশেষ, পুনর্গঠনবাদের (Re-constructivism) দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য হলো মানব বিকাশের এবং সামাজিক উন্নয়নের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রবণতা এবং জাতীয় ও

Working Draft

আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকারের বিষয়সমুহ বিবেচনা করে শিক্ষার্থীর উপযোগী শিখন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা। প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রগতিশীলতাবাদ এবং পুনর্গঠনবাদকে মূল দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে কাঠামো ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে এবং অন্যান্য মতবাদসমূহের উদ্দেশ্যও প্রগতিশীলতাবাদ এবং পুনর্গঠনবাদের আলোকে রূপান্তর ঘটানো হয়েছে।

মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Psychological foundation)

শিক্ষাক্রমের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার ধরন কেমন হবে তার নির্দেশনা প্রদান করে। এই ভিত্তিটি তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের শিখন মতবাদের ধারণাসমূহ বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে। আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন শিখন একটি ধারাবাহিক পূর্ব নির্ধারিত প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ধাপে ধাপে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করতে হবে। অপর দিকে জ্ঞানীয় বিকাশতত্ত্বভিত্তিক মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন শিখন নির্ভর করে শিক্ষার্থীর তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রতি মনোযোগ এবং চিন্তন প্রক্রিয়ার চর্চার ওপর। কাজেই এই মতবাদ অনুযায়ী শিখন প্রক্রিয়া লুকিয়ে আছে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটি সমস্যা সমাধানমূলক চর্চার ওপর যা চিন্তন প্রক্রিয়াকে স্বজ্ঞাত, সৃষ্টিশীল এবং প্রতিফলনমূলক উপায়ে চর্চার মাধ্যমে অর্জিত হয়। অপর দিকে সামগ্রিকতাবাদে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন শিখন নির্ভর করে সমস্যাকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করে তা সমাধানের পথ বের করার ওপর, এই প্রক্রিয়ায় সমস্যার চারপাশের পরিবেশের উপাদান ও তার প্রভাব বিশ্লেষণ অতীব জরুরি একটি প্রক্রিয়া। কাজেই সামগ্রিকতাবাদ অনুযায়ী শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন নিশ্চিত করতে পারলেই প্রকৃত শিখন ঘটে। এই সামগ্রিকতাবাদের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী কালে সামাজিক গঠনবাদ নামে একটি নতুন মনোবৈজ্ঞানিক ধারণার উদ্ভব ঘটেছে যা শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা করে সমস্যা সমাধানের জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে দেয়া এবং পারস্পরিক যোগাযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টিশীল সমাধান বের করার কৌশল নির্ধারণকে উৎসাহিত করে। । পরিবেশ ও প্রতিবেশের সঙ্গে মানুষের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে যে সহাবস্থান তার ওপরে ভিত্তি করে মানুষের শিখন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে আরেকটি মতবাদ প্রবর্তিত হয়েছে, যা ব্রর্নফ্রেনব্রেনারের ইকলজিকাল সিস্টেম থিওরি নামে পরিচিত। বর্তমান প্রেক্ষাপটে, ডিজিটাল টেকনোলজি প্রয়োগের ফলে মানুষের শিখনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিনির্ভর স্বাধীনতা (শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও প্রেষণা অনুযায়ী শিখনের সময়, বিষয়বস্তু, শিখনের স্থান, উদ্দেশ্য ও শিখনের প্রক্রিয়াতে বহুমাত্রিক নমনীয়তা নিশ্চিত করা) এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ স্থাপন করার ভিত্তিতে এক নতুন শিখন ধারণার উদ্ভব ঘটেছে, যা সংযোগবাদ (Connectivism) নামে পরিচিত (Siemens, 2004)। এই শিক্ষাক্রম রূপরেখায় সামাজিক গঠনবাদ মতবাদ এবং এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মতবাদসমূহকে মূল মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, এবং এর সঙ্গে Howard Gardner-এর বহুমুখী বুদ্ধিমত্তার তত্ত্ব (Gardner, ১৯৮২) – যা সামাজিক গঠনবাদের ভিত্তির ওপরেই গড়ে উঠেছে, এবং যা ধারণা দেয় যে, মানুষের বুদ্ধিমত্তার বহুমুখী মাত্রা রয়েছে এবং একজন মানুষ এক বা একাধিক মাত্রার বুদ্ধিমত্তায় পারদর্শী হতে পারে, তাও এখানে বিবেচিত হয়েছে। সর্বোপরি এই রূপরেখায় প্রয়োজনভেদে অন্যান্য মতবাদেরও সীমিত ও যৌক্তিক চর্চা নিশ্চিত করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক ভিত্তি (Historic foundation)

এ উপমহাদেশে প্রথম শিক্ষা কমিশন গড়ে উঠে ১৮৮২ সালে Sir William Wilson Hunter এর নেতৃত্বে যা হান্টার কমিশন নামে পরিচিতি লাভ করে। হান্টার কমিশন ১৮৮৩ সালে তার রিপোর্টে সর্বপ্রথম কোর্স এ (সাহিত্য) ও কোর্স বি (কারিগরি শিক্ষা) নামে দু'টি ধারার শিক্ষাব্যবস্থা প্রস্তাব করে। এর মাধ্যম ব্রিটিশ ভারতে সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে একই ধারার শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন হয় এবং ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত তা বহাল থাকে। ১৯৪৯ সালে গঠিত মওলানা আকরাম খান শিক্ষা কমিটি'র রিপোর্ট অনুযায়ী যুক্তফ্রন্ট সরকার একটি সার্বজনীন বিজ্ঞানভিত্তিক একই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রর্বতন করতে চেয়েছিল। ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনও তার রিপোর্টে একই ধারার শিক্ষার কথা বলে। কিন্তু ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসক আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করার পর শরীফ খান শিক্ষা কমিশন গঠন করে এবং ১৯৫৯ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থায় নবম শ্রেণি থেকে সাধারণ শিক্ষাকে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা নামে তিনটি ধারায় বিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। আজ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে। তবে স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয় এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজে ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে এই শিক্ষা কমিশন উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে, তিনি এমন একটি শিক্ষাকাঠামো চান যার মাধ্যমে একটি সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে যার ভিত্তি হবে সমতা। তাঁর দিক নির্দেশনা অনুযায়ীই এই কমিশন ১৯৭৪ সালে সার্বজনীন বিজ্ঞানভিত্তিক একই ধারার সাধারণ শিক্ষার কথা সুপারিশ করেছিল। এই শিক্ষাক্রম রূপরেখাটি ঐতিহাসিক এ প্রেক্ষাপট ও নির্দেশনাকে সামনে রেখে উন্নয়ন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় অগ্রাধিকার (Global and national context and priorities):

পরিবর্তনশীল এই পৃথিবী মানুষের জীবন ও জীবিকার ধরনকে নিয়ত বদলে দিচ্ছে। বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বব্যবস্থা এই পরিবর্তনের গতিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, যার ফলে পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজনের কোন বিকল্প নেই।

আজকের পৃথিবী যেসব সমস্যা ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, সেসব সমস্যার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং সম্ভাবনার পূর্ণ সুফল গ্রহণের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজনক্ষম মানবিক যোগ্য বিশ্ব-নাগরিক দরকার। এখন প্রয়োজন এমন সৃষ্টিশীল অভিনব শিক্ষাব্যবস্থা, যা নমনীয়, দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সক্ষম এবং উদ্ভূত আর্থসামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। শিক্ষাব্যবস্থার যুগোপযোগীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে একটি উন্নত সমাজ গঠনের, যার প্রতিফলন ঘটেছে নানা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারে। বাংলাদেশের জাতীয় সংবিধান ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ সকল নাগরিকের জন্য সার্বজনীন মানসম্মত শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাতেও "সকলের জন্য একীভূত ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিখনের সুযোগ সৃষ্টি" করার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার এবং অষ্টম পাঁচশালা পরিকল্পনাতেও একই অঙ্গীকারের প্রতিফলন বিদ্যমান। এছাড়াও সরকারের ভিশন ২০২১, ২০৪১, ২০৭১ এবং ২১০০ (ডেল্টাপ্ল্যান) প্রভৃতি লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য একটি যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম রূপরেখা উন্নয়ন জরুরি। বাংলাদেশকে তার বিশাল জনগোষ্ঠীর জনমিতিক সুফল পেতে হলে এ জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর সেজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের শুরুটা হতে হবে অবশ্যই একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম উন্নয়নের মাধ্যমে যা সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

Working Draft

প্রমাণনির্ভর ভিত্তি (Evidence based Foundation):

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত এবং বিভিন্ন অনুসৃত মডেল পর্যবেক্ষণ করে পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রচলনের একটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। এই বিশ্লেষণটিই শিক্ষাক্রম রূপরেখার প্রমাণ নির্ভর ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা OECD (২০১৮)-এর Learning Framework 2030-র বিশ্লেষণ অনুযায়ী ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিপার্শ্বিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ভাল থাকার জন্য শিখনের কিছু সাধারণ অংশীদারিত্বমূলক লক্ষ্য থাকতে হবে, তেমনি বৈশ্বিক সমস্যা সমাধান ও অনিশ্চিত পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান-দক্ষতা-দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। এগুলো নিশ্চিত করার জন্য যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের কোন বিকল্প নেই। OECD (২০১৮) রিপোর্ট অনুযায়ী এই যোগ্যতার ধারণা গতানুগতিক জ্ঞান-দক্ষতা-দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবেনা, বরং যোগ্যতা হতে হবে রূপান্তরমূলক (Transformative)। রূপান্তরমূলক যোগ্যতা (Transformative Competencies) অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সৃষ্টিশীলতা, দায়িত্বশীলতা ও সচেতনতা চর্চার মাধ্যমে নতুন মূল্যবোধ তৈরিতে, ও সমস্যা সমাধানে অর্থপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। Brookings Report (2016) on Skills for a Changing World পৃথিবীর ১০২টি দেশের শিক্ষানীতি ও নির্দেশনা বিষয়ক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন দেশ তাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মাঝে যোগ্যতার পাশাপাশি কী কী ধরনের দক্ষতা অর্জন করানোর পরিকল্পনা করছে তা বের করার চেষ্টা করেছে। এই গবেষণা থেকে পরিলক্ষিত হয় যে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের শিক্ষাক্রম রূপান্তর প্রক্রিয়ায় গতানুগতিক ধারা থেকে বের হয়ে যোগ্যতানির্ভর এবং আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে ভবিষ্যৎ দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নের একটা ধারা সুচিত হয়েছে। গবেষণায় ১০২টি দেশের নীতি, নির্দেশনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৭৬ টি দেশে সুনির্দিষ্টভাবে দক্ষতাভিত্তিক যোগ্যতাকে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ৩৬টি দেশের নীতি নির্দেশনায় এর রূপকল্প ও অভিলক্ষ্যে দক্ষতাভিত্তিক যোগ্যতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও ১০২টি দেশের মধ্যে ৫১টি দেশের শিক্ষাক্রম সরাসরি সুনির্দিষ্টভাবে দক্ষতাভিত্তিক যোগ্যতাকে নির্ধারণ করেছে এবং ১১টি দেশ বিষয় এবং অন্যান্য নথি ও পদ্ধতিতে দক্ষতাভিত্তিক যোগ্যতাকে নির্ধারণ করেছে। এই ফলাফল থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবী সুনির্দিষ্টভাবে দক্ষতাভিত্তিক অর্থাৎ, যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে যা প্রচলিত আছে । প্রচলিত এই শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন ও গবেষণালব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, স্তরভিত্তিতে পৃথক উদ্যোগে এই শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছিল, ফলে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রণীত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বপরিস্থিতিতে যোগ্যতা নিয়ে টিকে থাকতে এবং আত্মপরিচয় সমুন্নত রেখে মানবিকগুণসম্পন্ন মানুষ তৈরিতে নতুনভাবে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় ও প্রাথমিক স্তরের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণ ও প্রচলিত শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ শীর্ষক সমীক্ষার (NCTB, 2019) উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

- বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাসমূহতে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সুষম প্রতিফলন নিশ্চিত করা দরকার।

- বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রমে ক্রস কাটিং বিষয়ের প্রতিফলন নিশ্চিত করা জরুরি।
- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হলে সুদক্ষ শিক্ষক প্রয়োজন যারা শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পাঠদান ও যৌক্তিকভাবে মূল্যায়নে সক্ষম
- বিষয়ভিত্তিক সময় বণ্টন সুষম হওয়া প্রয়োজন।
- শিক্ষাক্রমে পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক বিষয় (যেমন, ডিজিটাল টেকনোলজি) ও যোগ্যতাসমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে।
- শিখন শেখানো এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় সামাজিক গঠনবাদনির্ভর, শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক, একীভূত শিক্ষার কৌশলের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

একইভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণে যে গবেষণা পরিচালিত হয় (NCTB, 2019) তার আলোকে উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য মাধ্যমিক স্তরেও যোগ্যতাভিত্তিক (Competency Based) শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরি। বিশ্বের অন্যান্য দেশের শিক্ষাক্রমও এক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।
- শিক্ষাক্রম পরিমার্জন/নবায়ন করে মনোপেশিজ ও আবেগিক ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন।
- প্রাক-বৃত্তিমূলক ও বৃত্তিমূলক বিষয়ের অন্তর্ভূক্তি প্রয়োজন।
- শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অর্জনযোগ্য যোগ্যতা ও শিখনফল এমনভাবে বিন্যস্ত করা প্রয়োজন যাতে SDG, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ ও রূপকল্প ২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়।
- বিজ্ঞান, টেকসই উন্নয়ন, মানবাধিকারের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শিক্ষাক্রম পরিমার্জনে/নবায়নে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন।
- শিখন অনেক বেশি কার্যক্রম ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক (Activity and experiential learning based) হওয়া প্রয়োজন।

সার্বিকভাবে বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে পরিচালিত গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাংলাদেশের শিক্ষাক্রমের বর্তমান পরিমার্জন ও উন্নয়নের ফলে যে গুণগত পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তা হলো:

- প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষাক্রম একই সময়ে পরিমার্জনের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম আধুনিক ও যুগোপযোগী করার পাশাপাশি এই প্রথম শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য রূপান্তরযোগ্য যোগ্যতার স্তর অনুযায়ী জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ যথাযথ অর্জনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
- গবেষণালব্ধ তথ্য এবং যৌক্তিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বাড়তি চাপ কমানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই ক্ষেত্রে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে আন্তঃবিষয়ক

(interdisciplinary), সমন্বিত (integrative), মিথস্ক্রিয়ামূলক (interactive) অভিজ্ঞতাভিত্তিক করে শিক্ষাক্রমে বিষয়বস্তুর ভার কমানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।|

- বৈশ্বিক পরিবর্তন এবং বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুকিশোরদের একীভূত, সুনির্দিষ্ট ও সুসংগঠিতভাবে প্রস্তুত করে গড়ে তুলতে একটি অবিচ্ছিন্ন কাঠামোতে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সুযোগ তৈরি হয়েছে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১.৩ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন করার বহুল প্রচলিত ধাপ রয়েছে। এনসিটিবি শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে এই ধাপগুলো অনুসরণ করে থাকে। ধাপসমূহ হলো:

ধাপ ১- গবেষণা, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং চাহিদা নিরূপণ

শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে প্রচলিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য বিস্তৃত পরিসরে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এর পাশাপাশি শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্যও গবেষণা পরিচালিত হয়। উক্ত গবেষণাসমূহ পরিচালনকালে সরকারের লক্ষ্য, পরিকল্পনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পর্যালোচনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা, বিভিন্ন দেশের শিক্ষাক্রম, তথ্য ও দলিল ইত্যাদি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয় এবং থিমভিত্তিক কারিগরি কর্মশালা পরিচালনা করা হয়। এসকল গবেষণার সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে পরবর্তিতে শিক্ষাক্রমের কাঙ্ক্ষিত পরিমার্জন বা উন্নয়ন কেমন হবে তা নির্ধারণ করা হয়।

ধাপ ২- শিক্ষাক্রম রূপরেখা প্রণয়ন

গবেষণা ও নথি পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ ও দিক নির্দেশনা এবং বিস্তৃত পরিসরে কারিগরি অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন এ প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপ। এনসিটিবি-র প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম উইং-এর নেতৃত্বে এ রূপরেখা প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়। কাজটি সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নীতিমালা অনুযায়ী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কারিকুলাম উন্নয়ন ও পরিমার্জন কোর কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিকে সহায়তা এবং এর পাশাপাশি মূল কাজটির খসড়া প্রণয়নের জন্য শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ এবং বিষয় বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কার্য সম্পাদন কমিটিও গঠন করা হয়। কার্য সম্পাদন কমিটি প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কর্মশালা, কারিগরী সভা, অংশীজনের অংশগ্রহণ ও মতামত ইত্যাদির মাধ্যমে খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু করেন। পরবর্তিতে আরো বিস্তৃত নীতি নির্দেশনা, গবেষণা, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ, কারিগরি কর্মশালা ও অংশীজন মতামত ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত তত্ত্ব, তথ্য ও সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ নিয়ে এই কমিটিগুলো জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখার চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করে যা প্রক্রিয়া মেনে অনুমোদিত হয়।

ধাপ ৩- শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন

অনুমোদিত শিক্ষাক্রম রূপরেখার আলোকে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরবর্তিতে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের শ্রেণি এবং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন করা হবে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম যৌক্তিকীকরণ, চূড়ান্তকরণ এবং অনুমোদনের পরে বিষয়বিশেষজ্ঞগণ নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে চূড়ান্ত শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও সামগ্রী প্রণয়নের কাজ শুরু করবেন।

Working Draft

এখানে উল্লেখ্য যে, এই শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল ব্যাপী বিস্তৃত পরিসরে তিনটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণার পাশাপাশি শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য বিভিন্ন কারিগরী কর্মশালা, ইস্যুভিত্তিক আলোচনা ইত্যাদি পরিচালিত হয়। এসকল গবেষণা ও কারিগরী অনুশীলন হতে প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে শিক্ষাক্রমের কাঙ্ক্ষিত পরিমার্জন ও উন্নয়ন কেমন হবে সেই ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে বর্ণিত কমিটি ও কার্যসম্পাদন দলের মাধ্যমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গনের প্রত্যক্ষ নিদের্শনায় ও অন্যান্য নীতি নির্ধারকদের পরামর্শে ১৫টির বেশী কারিগরী কর্মশালা, ৩০-এর অধিক ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে ৩৩টি সংস্থার, ২৪ ধরনের, মোট ১৫৬ জন বিশেষজ্ঞের সরাসরি অংশগ্রহণে এ শিক্ষাক্রম রূপরেখার খসড়াটি প্রণয়ন করা হয়।

পরবর্তী কালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিশেষজ্ঞগণের সরাসরি পরিচালনায় ১৩টি দলের মাধ্যমে খসড়া শিক্ষাক্রম রূপরেখার উপর ৮০০-এর অধিক অংশীজনের মতামত গ্রহণ করা হয়। অংশীজনদের মধ্যে রয়েছেন নীতি নির্ধারক (মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়গণ, মাননীয় সংসদ সদস্যগণ, সচিব ও উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ); প্রতিথযশা শিক্ষাবিদ; শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা (বেসরকারি উদ্যোক্তা); শিক্ষা বিশেষজ্ঞ (বিজ্ঞান শিক্ষা, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা, ভাষা শিক্ষা, বিশেষ শিক্ষা, ব্যবসায় শিক্ষা, একীভূত শিক্ষা, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক প্রশিক্ষক (নায়েম, নেপ, এইচএসটিটিআই, পিটিআই, টিটিসি, টিটিটিসি, বিএমটিটিআই); অভিভাবক (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বৃত্তিমূলক); শিক্ষক (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা, শিক্ষা); শিক্ষার্থী (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা, শিক্ষা); বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক (বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা, কারিগরি, মেডিকেল, প্রকৌশল, কৃষি, পরিবেশ, সামাজিক বিজ্ঞান); পেশাজীবী (প্রযুক্তিবিদ, ডাক্তার, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, ব্যবসায়ি, বিজ্ঞানি, অর্থনীতিবিদ, কৃষিবিদ, পরিবেশবিদ, উন্নয়ন কর্মী); নিয়োগকর্তা (ইন্ডাস্ট্রি, পিএসসি, এনজিও, উদ্যোক্তা, মানবসম্পদ বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন সেক্টর - আইসিটি, কৃষি, গার্মেন্টস, গণমাধ্যম, সৃজনশীল মিডিয়া); মাদ্রাসা (শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ); কারিগরি (শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ); এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সদস্য। অংশীজন পরামর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট মতামতগুলোর যথাযথ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে পরবর্তী কালে খসড়া শিক্ষাক্রম রূপরেখাটি পরিমার্জন করে চূড়ান্ত করা হয়।

Working Draft

পরিবর্তিত ফোকাস

জ্ঞান বিষয়বস্তু নির্দেশনামূলক শেখানো গ্রহণকারী বিষয় আদর্শ মানে পৌঁছানো প্রতিষ্ঠানভিত্তিক একাডেমিক সনদ বিমূর্ত	অভিজ্ঞতা ধারণা অনুসন্ধানমূলক সহায়তা করা উৎপাদনকারী আন্তঃবিষয় বৈচিত্র্য বাড়ানো যে-কোন জায়গায় জীবন ও জীবিকা-সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার রেকর্ড প্রয়োগ	

২.১ রূপকল্প

'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক, উৎপাদনমুখী, অভিযোজনে সক্ষম সুখী ও বৈশ্বিক নাগরিক।'

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ, জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি লালনকারী সৎ, নৈতিক, মূল্যবোধসম্পন্ন, বিজ্ঞানমনস্ক, আত্মবিশ্বাসী, দক্ষ, সৃজনশীল ও সুখী একটি প্রজন্ম তৈরির লক্ষ্যে রূপকল্পটি নির্ধারিত হয়েছে। যে প্রজন্ম স্বকীয়তা বজায় রেখে অপরের কল্যাণে নিবেদিত হওয়ার পাশাপাশি সমাজের ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সচেষ্ট হবে। সৃজনশীলতা ও রূপান্তরযোগ্য দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে স্বাধীনতার সুফল নিশ্চিত করে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে অবদান রাখতে পারবে। এছাড়াও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে আত্মপরিচয়ের বহুমাত্রিকতাকে স্বাগত জানিয়ে অভিযোজনে সক্ষম বিশ্বনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে।

২.২ অভিলক্ষ্য

শিক্ষার মাধ্যমে এ রূপকল্প অর্জনে বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্রম এবং তার বাস্তবায়নে সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাপনায় কিছু কৌশলগত বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন নিশ্চিত করা। একটি কার্যকর পরিকল্পনা ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নই এ রূপকল্প অর্জন নিশ্চিত করতে পারে। রূপকল্প বাস্তবায়নের অভিলক্ষ্য সমূহ নিম্নরূপ;

- সকল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশে কার্যকর ও নমনীয় শিক্ষাক্রম;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীর বিকাশ ও উৎকর্ষের সামাজিক কেন্দ্র;
- প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের বাইরেও বহুমাত্রিক শিখনের সুযোগ ও স্বীকৃতি;
- সংবেদনশীল, জবাবদিহিতামূলক একীভূত ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষাব্যবস্থা;
- শিক্ষাব্যবস্থার সকল পর্যায়ে দায়িত্বশীল, স্ব-প্রণোদিত, দক্ষ ও পেশাদার জনশক্তি।

২.৩ শিক্ষাক্রমের ধরন

বাংলাদেশের শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় অভিষেক ঘটে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তির মাধ্যমে। এখান থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সম্পন্ন করে একজন শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ করে বা কর্মজীবনে প্রবেশ করে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। কী কী যোগ্যতা অর্জন করলে শিক্ষার্থীরা এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠবে সেগুলোকে বিবেচনার কেন্দ্রে রেখে প্রাক-প্রাথমিক হতে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের যথাযথ উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষার একটি পরিপূর্ণ ধারণায়ন (Conceptualization) করা জরুরি।

২.৪ যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষা

Working Draft

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষার সংজ্ঞার্থ, বৈশিষ্ট্য, কৌশল ও গুরুত্ব সম্পর্কে জেনে এবং অনুধাবন করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটানোর জন্য এ সংক্রান্ত বৈশ্বিক সংজ্ঞার্থ এবং দেশীয় পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাকে নিম্নলিখিতভাবে ধারণায়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষা হলো :

শিখন পরিবেশ	যেখানে শিক্ষার্থী নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে শিখন অভিজ্ঞতা এবং পথ তৈরির মাধ্যমে যোগ্যতাসমূহ অর্জন করে এবং নিজের মতো তার প্রয়োগ ও প্রদর্শন করে প্রতিনিয়ত ক্ষমতায়িত হতে পারে
শিখন সহায়তা	যেখানে শিক্ষার্থী তার নিজস্ব শিখন চাহিদা অনুযায়ী সময়মত পৃথক বা সমন্বিত সহায়তা প্রাপ্তির মাধ্যমে কার্যকরী শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যোগ্যতাসমূহ অর্জন করতে পারে
শিখন অংশগ্রহণ	যেখানে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বিভিন্ন পথে এবং ভিন্ন ভিন্ন গতিতে শেখতে পারে
শিখন অগ্রগতি	যেখানে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির ভিত্তি তার পারদর্শিতার রেকর্ড, শিখন সময় নয় বা অংশগ্রহণের ধরন ইত্যাদি নয়।
শিখন মুল্যায়ন	যেখানে মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর জন্য ইতিবাচক ও অর্থপূর্ণ শিখন অভিজ্ঞতা যা সময়মতো শিখন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমভিত্তিক পারদর্শিতার প্রমাণের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়
শিখন সমতা	যেখানে শিক্ষার্থীদের মাঝে সমতা নিশ্চিত করার বিষয়টি শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাক্রম ও তার বাস্তবায়ন এবং মুল্যায়নের মাঝেই নিবিড়ভাবে বিদ্যমান থাকে।
শিখন প্রত্যাশা	স্বচ্ছ, সুনির্দিষ্ট, পরিমাপ ও রূপান্তরযোগ্য।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষা বাস্তবায়নে যে বিশ্বাসসমূহ ধারণ করা জরুরি তা হলো:

- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষার অর্থ হল: সার্বিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থা, কাঠামো, শিক্ষাক্রম ও শিখন-শেখানো কৌশলের পরিবর্তন। আংশিক বাস্তবায়নে ফল পাওয়া যায় না।
- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষা মানে শিক্ষায় সমতাকে মূলে রেখে চালিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন যেখানে সকল শিক্ষার্থী পূর্ণ অংশগ্রহণ, সহায়তা এবং উন্নত শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শ্রেণিকক্ষ ও শ্রেণিকক্ষের বাইরের পরিবেশে শিখতে পারে।
- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার সুনির্দিষ্ট প্রত্যাশা অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থী শিখতে পারে, বাধা প্রাপ্ত হয় আবার বিশ্বাস নিয়ে গভীর শিখন যোগ্যতা নিজের মতো করে অর্জন করতে পারে।
- শিখন চাহিদা অনুযায়ী উদ্ভাবনী ও কার্যকরী শিখন পরিবেশ তৈরি করলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ইচ্ছেমতো বিভিন্ন পথে, প্রক্রিয়ায় ও সময়ে শিখতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিখন যোগ্যতা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রয়োগের সুযোগ রাখতে হয়।
- শিখন যেকোনো সময়ে যেকোনো স্থানে হতে পারে।
- গভীর শিখন সহযোগিতামূলক এবং সামাজিকভাবে গ্রথিত।
- উন্নত শিখন সংস্কৃতি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে শিক্ষার প্রত্যাশা স্বচ্ছ, সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য হওয়া উচিৎ।

২.৫ যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম

২.৫.১ যোগ্যতা নির্ধারণের প্রেরণা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

চেতনা হলো আবেগিক ও সামাজিক বুদ্ধিমত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট, সময় ও পরিস্থিতিতে ব্যক্তিক মূল্যবোধ, আবেগ, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রবণতা, গুণাবলি, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির সমন্বয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সে অনুযায়ী আচরণ করতে প্রেরণা যোগায়। সেই আলোকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে শিক্ষাক্রম রূপরেখার সকল ধারনা নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রমের মূল ভিত্তি হলো মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত চেতনা ও স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি।

এই শিক্ষাক্রম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও তার মুল ভিত্তিসমুহকে নিম্নবর্ণিতভাবে ধারণ করেছে :

মানবিক মর্যাদা: মানবিক মর্যাদা হচ্ছে প্রতিটি মানুষের সম্মান এবং আত্মমর্যাদা যা স্থান, কাল, পরিস্থিতিভেদেও অক্ষুন্ন থাকে। মানবিক মর্যাদা মানবাধিকারের মূল ভিত্তি যার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব এবং যা কোনভাবেই স্থগিত করা যায় না। প্রতিটি মানুষের ন্যূনতম সম্মান এবং মর্যাদা নিশ্চিত করা মুক্তিযুদ্ধের চেতনালব্ধ অঙ্গীকার।

সামাজিক ন্যায়বিচার: মানবিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে মানবাধিকার, সংবিধান, আইন, ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোকে ন্যায্যতার ভিত্তিতে সামাজিক সহাবস্থান নিশ্চিত করাই সামাজিক ন্যায়বিচার। শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার।

সাম্য: ভিন্নতা, বৈচিত্র্য ও শ্রেণিভেদকে সম্মান ও গ্রহণ করে ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রেক্ষিত বিবেচনায় সকলের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করা এবং তা বজায় রাখাই হচ্ছে সাম্য।

বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে নিম্নবর্ণিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে; (http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957.html)

> *৮। [(১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।]*
>
> ***জাতীয়তাবাদ***
>
> *[৯। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।]*
>
> ***সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি***
>
> *[১০।মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।]*
>
> ***গণতন্ত্র ও মানবাধিকার***

[১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে ১২[* *] ১৩[এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে]।*

ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা

[১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য
(ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,
(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,
(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,
(ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে।]

বাংলাদেশের নাগরিকদেরকে দেশপ্রেমিক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত উৎপাদনক্ষম জনগোষ্ঠীতে রূপান্তর করা প্রয়োজন। একইসাথে আত্মপরিচয় বহাল রেখে অভিযোজনে সক্ষম বিশ্বনাগরিক হিসেবে প্রস্তুত করার জন্যও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শিক্ষাক্রম রূপরেখায় যোগ্যতার বিভিন্ন উপাদানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

২.৫.২ যোগ্যতার ধারণা

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম নাগরিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশই যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম অনুসরণ করছে। বাংলাদেশেও শিক্ষাক্রম রূপরেখাটি যোগ্যতার ধারণাকে কেন্দ্র করেই উন্নয়ন করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায়, জ্ঞান, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সমন্বিতভাবে একজন শিক্ষার্থীর মাঝে অর্জিত হলে তার যোগ্যতা গড়ে উঠে। উদাহরণস্বরূপ, একটি গাড়ি কীভাবে চালনা করতে হয় তা যখন বই পড়ে বা শুনে বা দেখে একজন শিক্ষার্থী জানতে পারে, তার জ্ঞান অর্জিত হয়। ঐ শিক্ষার্থী যদি গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশগুলো হাতে-কলমে পরিচালনা করতে শেখে অর্থাৎ গাড়ি সামনে, পেছনে, ডানে বা বামে চালাতে পারে, ব্রেক করতে পারে ইত্যাদি, তবে তার দক্ষতা তৈরি হয়। আর যদি সে গাড়ি চালিয়ে নিজের ও রাস্তার সকল মানুষ, প্রাণী ও সম্পদের নিরাপত্তা রক্ষা করে গন্তব্যে পৌঁছানোর সক্ষমতা অর্জন করে তবে ঐ শিক্ষার্থীর গাড়ি চালনা বিষয়ে যোগ্যতা অর্জিত হয়। এখানে জ্ঞান, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও মনোভাব সমন্বিতভাবে কাজ করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের ধারণা জনপ্রিয়তা পেলেও "যোগ্যতা"র সুনির্দিষ্ট বা একক কোনো তত্ত্ব বা সংজ্ঞার্থ গড়ে উঠেনি যার মাধ্যমে প্রচলিত সকল ধারণাকে একটি অভিন্ন ফ্রেমে বাঁধা যায় (Winterton et al., 2005)। প্রেক্ষাপট যোগ্যতার ধারণায়নকে প্রভাবিত করে বলেই বিভিন্ন দেশের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে যোগ্যতাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আবার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ বা পেশা প্রভৃতি প্রয়োগের ক্ষেত্র ভেদেও যোগ্যতা সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা ব্যবহার করা হয়েছে (Kennedy D & Hyland A, 2009)। এমনকি নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রেও রয়েছে ব্যাপক বৈচিত্র্য, কেননা কোনো শিক্ষাবিদ বা গবেষক 'যোগ্যতা' বোঝাতে ব্যবহার করেছেন সক্ষমতা, আবার অনেকেই ব্যবহার করেছেন দক্ষতা বা Capacity, Capability, Performance Standard ইত্যাদি শব্দকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে খুবই সংকীর্ণ অর্থে, অর্থাৎ, যোগ্যতা আর দক্ষতাকে প্রায় সমার্থক করে দেখা হয়েছে। (Adam 2004, Brown and Knight 1995)। অন্য দিকে ECTS (Europian Credit Transfer System) Users' Guide

2009 সংজ্ঞা অনুযায়ী ব্যক্তিগত এবং পেশাগত উন্নয়নের প্রয়োজনে শিক্ষা বা কর্মক্ষেত্রে জ্ঞান, দক্ষতা এবং ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পদ্ধতিগত সক্ষমতা প্রয়োগের প্রমাণিত ক্ষমতাই যোগ্যতা। নার্সিং পেশায় সেবা দেয়ার সময় জ্ঞানমূলক, আবেগীয় ও মনোপেশিজ দক্ষতাসমূহ যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারাই যোগ্যতার পরিচায়ক (Miller et al (1988)। পেশাগত ক্ষেত্রে যোগ্যতা হলো জ্ঞান, মনোভাব এবং আচরণের এমন এক প্যাটার্ন যা একত্রে কোন পেশাগত কাজ সম্পাদনের সামর্থ্য তৈরি করে (Neary, 2002)। শুধু জ্ঞান আর দক্ষতা নয় বরং মূল্যবোধ, সূক্ষ্ম চিন্তন, পেশাগত বিচার-বিবেচনা, মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজ ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের সন্নিবেশনও অনেক ক্ষেত্রে যোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত।

একইভাবে দেশ ভেদেও যোগ্যতার ধারণায় পার্থক্য দেখা যায়। The Higher Education and Training Awards Council of Ireland (HETAC)-এর মতে, বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে জ্ঞান ও দক্ষতার সৃজনশীল ও কার্যকর প্রদর্শন এবং প্রয়োগ করতে পারাকেই যোগ্যতা বলে। এ কাউন্সিল আরো মনে করে যে, শিক্ষার্থী নিজের দুর্বলতা নিজেই চিহ্নিত করতে পারা এবং সে অনুযায়ী নতুন কিছু শিখতে পারাও যোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত। ২০০০ সালে Tuning Educational Structures in Europe নামক প্রকল্প ইউরোপের শিক্ষার ক্ষেত্রে যোগ্যতার সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ করতে গিয়ে উল্লেখ করেছে যে, যোগ্যতা হচ্ছে জ্ঞান, অনুধাবন, দক্ষতা এবং সক্ষমতার এক সমন্বয়। আবার ইংল্যান্ডে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে কর্মসম্পাদন ও পেশাগত ভূমিকা পালনের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগ্যতা বলতে দক্ষতা, জ্ঞান ও ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেমন : প্রবণতা, মনোভাব, আত্ম-ধারণা প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে (Van der Klink and Boon, 2002)। অস্ট্রেলিয়ান শিক্ষাক্রমে যোগ্যতাকে উল্লেখ করা হয়েছে 'Capability' হিসেবে। এই শিক্ষাক্রমে ধরে নেয়া হয়েছে জ্ঞান, দক্ষতা, আচরণ আর স্বভাব বা অন্তর্গত বিন্যাস (Dispositions)-এর সম্মিলনে গড়ে ওঠে যোগ্যতা। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন জটিল ও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কার্যকর ও যথার্থভাবে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে তখন যোগ্যতা অর্জন করে। জার্মানিতে যোগ্যতাকে গ্রহণ করা হয়েছে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে বা কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রেক্ষাপট বিচারে প্রয়োজনীয় ও শিখনের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়...

- প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জনের জন্য আমি প্রয়োজনীয় শিখন পরিবেশ ও সহায়তা পাচ্ছি এবং অর্জিত যোগ্যতাসমূহ বাস্তব সমস্যা সমাধানে কাজে লাগানোর সুযোগ পাচ্ছি।
- শিখন পরিবেশ আমার জন্য নিরাপদ ও নিজস্ব তাই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করি।
- এখানে সকলের সংস্কৃতি ও মতামতের মূল্য দেয়া হয়। আমি প্রতিদিন অনুভব করি যে, এখানে সবাই আমার শিখন নিশ্চিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
- এখানে আমি এমন যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ ও সহায়তা পাই যা আমাকে স্বাধীনভাবে আমার শিখনের দায়িত্ব নিতে দেয়।
- আমি এখানে সমন্বিতভাবে যোগ্যতাসমূহের পারদর্শিতা অর্জনের সুযোগ পাই।
- আমি যেকোনো সময়ে যেকোনো স্থানে আমার প্রযোজন মতো সময় নিয়ে শিখি, পারদর্শী হই এবং প্রদর্শন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করি।
- আমি আমার অগ্রগতি নিয়ে সময়মতো নির্দেশনা, সহায়তা ও ফলাবর্তন পাই।
- আমি এখানে মনোসামাজিক সহায়তা পাই যা আমাকে আমার শেখার ব্যক্তিগত পথ তৈরিতে ভূমিকা রাখে।
- আমার শিখন মূল্যায়ন হয় শিখন যোগ্যতা ও পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে।
- নম্বর বা গ্রেড দেয়া হয় শিখন যোগ্যতা অর্জন করতে আমাকে কোথায় কিভাবে কাজ করতে হবে তা জানার জন্য।

পুনর্বিন্যাসকে। অন্যদিকে, এস্তোনিয়া তার শিক্ষাক্রমে যোগ্যতার সাধারণ ধারণা-জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ-সংস্কৃতিকে নিজস্ব প্রেক্ষাপট অনুযায়ী গ্রহণ করেছে (Estonia, 2014)।

ভিন্ন ভিন্ন ধারণায়নের মধ্যেও যোগ্যতা সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে, তা হলো, শিক্ষার্থী যদি কোন প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, নৈতিকতা প্রভৃতির সন্নিবেশ ঘটিয়ে কর্মসম্পাদনে পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারে তবে তাকে ঐ বিশেষ প্রেক্ষাপটে যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ বলা যায় (Kennedy D & Hyland A, 2009)। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে যে ধারণাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো নিজস্ব প্রেক্ষাপট বিবেচনা। কেননা শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেকোনো যোগ্যতা গড়ে তোলাই দুরূহ হয়ে যেতে পারে যদি না তাদেরকে নিজস্ব প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় (Klieme E. et al. 2008)।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে, যোগ্যতার ধারণাসমূহের ভেতর কিছু উপাদান সার্বজনীন; যেমন : জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ প্রভৃতি, আবার কিছু উপাদান বিভিন্ন দেশের নিজস্ব প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সংযুক্ত হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় যোগ্যতাকে চারটি উপাদানের সমন্বয়ে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সেগুলো হল: মূল্যবোধ, গুণাবলি, দক্ষতা ও জ্ঞান।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে যোগ্যতার ধারণায়নের প্রেরণা হিসেবে উপলব্ধি ও অনুধাবন করে জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও গুণাবলি এই চারটি উপাদানের মধ্যে নিবিড় আন্তঃসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে যোগ্যতার ধারণাকে এই শিক্ষাক্রমে ব্যবহার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বিবৃত উপাদানগুলোর সরলরৈখিক আন্তঃসম্পর্কের পরিবর্তে জটিল বহুমাত্রিক সম্পর্ক বিদ্যমান[১]।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে অভিযোজনের জন্য জ্ঞান, মূল্যবোধ ও গুণাবলির সমন্বয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রয়োগের সক্ষমতাকে যোগ্যতা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

---

[1] মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে তার সক্ষমতা বা যোগ্যতায় রূপান্তরিত হয় এবং এই উপাদানগুলো আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করে কীভাবে আচরণের দ্বারা প্রকাশ পায়, এই বিষয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে ও মানব উন্নয়নে বহুল ব্যবহৃত একটি তত্ত্ব (The theory of planned behavior-**Icek Ajzen, 1991**) প্রচলিত আছে। মানুষের জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (যেমনঃ বয়স, লিঙ্গ) নির্বিশেষে অর্জিত জ্ঞান (Knowledge) ও এর প্রয়োগ অভিজ্ঞতা (Application Experience) তিন ধরনের বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটায়:

১. সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সুনির্দিষ্ট আচরণ করার দৃষ্টিভঙ্গি (Attitude) তৈরি করে;
২. নিজের কাজ করা বা সমস্যা সমাধানের সক্ষমতার ওপরে আত্মবিশ্বাস (Self-efficacy Belief) প্রস্তুত করে
৩. রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত আদর্শ (Norm) বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তার মাঝে মূল্যবোধ ও আদর্শগত বিশ্বাস (Normative Belief) তৈরি হয়।

জ্ঞান ও প্রয়োগ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যদি এই তিনটি উপাদানের মাঝে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়, তবে মানুষের মাঝে পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিক আচরণ প্রকাশের সামষ্টিক বিশ্বাস তৈরি হয় এবং তা সঠিকভাবে প্রয়োগের চর্চা করার সক্ষমতাও পরিলক্ষিত হয়।

যোগ্যতার ধারণায়নের আলোকে নিম্নে তার উপাদানসমূহকেও সংজ্ঞায়িত ও উন্মুক্ত করা হয়েছে যেন তা ভালোভাবে উপলব্ধি করে শিক্ষাক্রমের মূল যোগ্যতা, শিখনক্রম, শিখন-শেখানো কৌশল, সামগ্রী ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে প্রতিফলিত করা যায়।

২.৫.২.১ মূল্যবোধ

মূল্যবোধ হচ্ছে এক ধরনের পথ নির্দেশক নীতি বা বিশ্বাস (Guiding principles/beleifs) যা যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত, সমাধান বা অগ্রাধিকার নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, জাতীয় এবং বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের দীর্ঘ দিনের চর্চার মধ্য দিয়ে মূল্যবোধ গড়ে উঠে যা পরবর্তী কালে অনুসৃত হয়। মূল্যবোধ, জ্ঞান দক্ষতা দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তাদের মাঝে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাও বিদ্যমান। ধরন অনুযায়ী মূল্যবোধকে বিভিন্নভাবে গুচ্ছবদ্ধ করা যায় যেমন, ব্যক্তিগত, সামাজিক, ধর্মীয়, মানবিক ইত্যাদি।

শিক্ষায় মূল্যবোধের চর্চা, অনুসরণ ও উন্নয়ন জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ক্রমেই গুরুত্ব পাচ্ছে। যেহেতু মূল্যবোধ সকল ধরনের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপকেই প্রভাবিত করতে পারে সেহেতু শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে নিজ দেশ ও সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত ইতিবাচক মূল্যবোধ তৈরি, চর্চা, অনুসরণকে উৎসাহিত করা হবে – যা শিক্ষাক্রমের রূপকল্প অর্জনে ভূমিকা রাখবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করতে হলে সেগুলো অর্জন করতে হবে চেতনা সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধের চর্চার মাধ্যমে। এই মূল্যবোধসমূহের উৎস হলো বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় পরিচয় ও ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও চর্চা, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট এবং বৈশ্বিক মূল্যবোধসমূহ। এই পরিপ্রেক্ষিতে যেসব মূল্যবোধ চর্চার বিষয় এই শিক্ষাক্রম উন্নয়নে বিবেচিত হয়েছে, সেগুলো হলো:

- **সংহতি** : এক হয়ে থাকার মানসিকতা। ভিন্নতা, বৈচিত্র্য ও শ্রেণিভেদ সত্ত্বেও ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও অগ্রাধিকারকে পেছনে রেখে কতগুলো সামষ্টিক ইচ্ছা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মানবিক মূল্যবোধের পরিপ্রক্ষিতে সকলে মিলে বড় কোনো লক্ষ্য অর্জনে কাজ করা।
- **দেশপ্রেম** : যেকোনো পদক্ষেপে নিজ দেশের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে দেশের প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসা ও সম্মান প্রর্দশন করে দেশের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখা হচ্ছে দেশপ্রেম।
- **সম্প্রীতি** : ভিন্নতা, বৈচিত্র্য ও শ্রেণিভেদের মধ্যেও বিদ্যমান দৃঢ়তাসমূহের সম্মিলনে সর্বোচ্চ ঐক্য প্রদর্শন এবং বজায় রাখাই হচ্ছে সম্প্রীতি।
- **পরমতসহিষ্ণুতা** : ভিন্নমত বা ভিন্ন চিন্তাধারাকে সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে গ্রহণ বা বর্জনের স্বাধীনতা এবং এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সহনশীলতা প্রর্দশন হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা। বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা ও ধর্মের অনুসারীদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা।
- **শ্রদ্ধা/সম্মান** : বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও গুণাবলির আলোকে পারস্পরিক ইতিবাচক অনুভূতির প্রকাশই শ্রদ্ধা বা সম্মান। স্থায়িত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ সহাবস্থানে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **শুদ্ধাচার** : শুদ্ধাচার মানে নিজের কাছে দায়বদ্ধ থেকে যেকোনো পরিস্থিতিতে নৈতিকভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক কোন পরীবীক্ষণ ছাড়াই নিজ দায়বদ্ধতা থেকে নৈতিকভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেয়াই শুদ্ধাচার।

২.৫.২.২ শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত গুণাবলি

চেতনা ও মূল্যবোধ বিমূর্ত অনুভূতি, বোধ বা ধারণা। এগুলোর অনুসরণ ও চর্চা হলো কিনা তা বোধগম্যতার সূচক হল মানুষের মাঝে কী কী গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য অর্জিত হল তা পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করা। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক গুণাবলি প্রত্যাশা করা হয়েছে যা অর্জন করলে চেতনা ও মূল্যবোধের চর্চার প্রতিফলন অনুভব করা যাবে।

গুণাবলি	বর্ণনা
সততা	একটি নৈতিক গুণ যা সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করে
পরিশ্রমী	সকল দায়িত্ব ও কাজ সময়মত, গুরুত্ব সহকারে ও যথাযথভাবে সম্পাদন করা
গণতান্ত্রিক	পরমতসহিষ্ণু এবং সকলের মত প্রকাশের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল
অসাম্প্রদায়িক	নিজ সম্প্রদায়সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের বিশ্বাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল
উদ্যোগী	কোনো কাজ বা সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হওয়া ও শেষ পর্যন্ত অনুপ্রাণিত থাকা
ইতিবাচক	কোনো কাজ, কথা, ঘটনা বা বিষয়ের ভাল দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেয়া
নান্দনিক	সৃজনশীল কাজের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে তার চর্চা করার মননশীল মনোভাব পোষণ করা
মানবিক	মানুষ ও সৃষ্টি জগতকে ভালবাসা, পরিচর্যা করা, সংরক্ষণ করা ও নিরাপত্তা প্রদানে সচেষ্ট হওয়া
দায়িত্বশীল	কোনো কথা বা কাজ বা অঙ্গীকার দায়িত্ব সহকারে পালন করা
সহমর্মিতা	অন্যের মনের অবস্থা ও অনুভূতি আন্তরিকভাবে অনুধাবন করে তার সঙ্গে একাত্ম হওয়া

২.৫.২.৩ শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা

দক্ষতা হচ্ছে এক ধরনের ক্ষমতা (Ability or Capability) যা সুচিন্তিত, পদ্ধতিগত এবং স্থায়ী প্রচেষ্টার (Efforts) মাধ্যমে সাবলীল বা অভিযোজনক্ষম কার্যক্রম বা ক্রিয়াকলাপ দ্বারা অর্জন করা যায়। কার্যক্রম বা ক্রিয়াকলাপের ধরন, লক্ষ্য বা পদ্ধতির উপর নির্ভর করে দক্ষতাও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়। যেমন কোন ধারণা নিয়ে কার্যক্রম হলে তা যেমন জ্ঞানগত দক্ষতা আবার বস্তু নিয়ে হলে তা ব্যবহারিক বা কারিগরি দক্ষতা এবং মানুষ বা সমাজ নিয়ে হলে তা সামাজিক, মনোসামাজিক বা আবেগীয় দক্ষতা।

কোন প্রেক্ষাপটে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে দক্ষতাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধারণায়ন (Conceptualization) করা হয়। যেমন : শিক্ষাক্রমে দক্ষতা হচ্ছে যোগ্যতার (Competencies) সামগ্রিক ধারণার অংশ যেখানে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ইত্যাদির সম্মিলিত অর্জন যোগ্যতাকে নির্দেশ করে। অন্য দিকে আবার জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ইত্যাদির অর্জন পারস্পরিক নির্ভরশীল। যেমন, জ্ঞান অর্জনের জন্য জ্ঞানগত দক্ষতার প্রয়োজন আবার মূল্যবোধ চর্চার জন্য মনোসামাজিক ও আবেগিক দক্ষতার প্রয়োজন। একইভাবে ব্যবহারিক দক্ষতা বা আবেগীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য জ্ঞান অর্জন এবং মূল্যবোধ চর্চা জরুরি।

নিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে পরিবর্তনের ইতিবাচক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মপরিচয় সমুন্নত রেখে সক্রিয়, উৎপাদনমুখী, মানবিক মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্ন যোগ্যতা, দক্ষতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, চেতনা ইত্যাদির সমন্বয়ে প্রস্তুত করতে হয়। প্রেক্ষাপট বিবেচনায় যেভাবে সংমিশ্রণ করলে সর্বোচ্চ

ফলাফল পাওয়া সম্ভব, অনেক ক্ষেত্রে সে বিবেচনায় যোগ্যতা, দক্ষতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গিকে যেমন সংজ্ঞায়িত করা হয় তেমনি ধরন অনুযায়ী দল বা গুচ্ছবদ্ধও করা হয়। বৃহত্তর পরিসরে সকল ধরণের দক্ষতাকে মূলত তিনটি গুচ্ছে ভাগ করা যায় :

১. **মৌলিক দক্ষতা (Foundational skills) :** যে দক্ষতাসমূহ অন্যান্য দক্ষতা, যোগ্যতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য্য, যেমন : সাক্ষরতা (Literacy, Numeracy), ডিজিটাল সাক্ষরতা (Digital literacy) ইত্যাদি।
২. **রূপান্তরযোগ্য দক্ষতা (Transferable skills) :** যে দক্ষতাসমূহ প্রেক্ষাপট ও সময় অনুযায়ী রূপান্তর করে প্রয়োগ করা যায় এবং যা সময়ের সঙ্গে টিকে থাকতে সহায়তা করে, যেমন : সূক্ষ্ম চিন্তন, সৃজনশীল চিন্তন, সমস্যা সমাধান ইত্যাদি।
৩. **জীবিকা-সংশ্লিষ্ট দক্ষতা (Livelihood related skills) :** যে দক্ষতাসমূহ মানুষকে কোনো কাজ করতে পারদর্শী করে গড়ে তোলে। যেমন : অকুপেশনাল বা ট্রেডভিত্তিক দক্ষতা।

এখানে উল্লেখ্য যে, গুচ্ছসমূহের দক্ষতাকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করা যায় না। এদের মধ্যেও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা যেমন শক্তভাবে থাকে তেমনি এক গুচ্ছের দক্ষতা অন্য গুচ্ছেও প্রবেশ করে।

শিক্ষায় দক্ষতার ধারণা অনেক পুরোনো হলেও তার বিশ্লেষণের মাধ্যমে যথাযথ সংজ্ঞায়ন এবং বিস্তারিত বিবরণ অপেক্ষাকৃত নতুন ধারণা। বিশেষ করে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষায় যোগ্যতার অর্জনে/ সংজ্ঞায়নে দক্ষতার জোড় ভূমিকা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দক্ষতার সংজ্ঞার্থ এবং তা কীভাবে অর্জিত হয় তা স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন পরে। এক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত ডেলর কমিশনের (১৯৯৬) সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষার চারটি স্তম্ভ দক্ষতাসমূহকে সংজ্ঞায়িত ও গুচ্ছবদ্ধ করতে সহায়তা করেছে। ডেলর কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দক্ষতাসমূহ নিম্নলিখিতভাবে গুচ্ছবদ্ধ করা হয়েছে।

ডেলর কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষার স্তম্ভ	**দক্ষতার গুচ্ছ**
জানার জন্য শিখন (Learning to know)	শেখার দক্ষতা (Skills for learning)
পারদর্শিতার জন্য শিখন (Learning to do)	জীবিকার দক্ষতা (Skills for livelihood)
ক্ষমতায়নের জন্য শিখন (Learning to be)	নিজের ক্ষমতায়নের দক্ষতা (Skills for self-empowerment)
সকলের সঙ্গে বসবাসের জন্য শিখন (Learning to live together)	সক্রিয় নাগরিকের দক্ষতা (Skills for citizenship)

তাছাড়া OECD তাদের ২০৩০ সালের জন্য শিক্ষা ও দক্ষতা রূপরেখায় দক্ষতাসমূহকে মূলত তিনটি গুচ্ছে সংজ্ঞায়িত করেছে।

১. জ্ঞানগত এবং চিন্তা নিয়ে চিন্তা করার দক্ষতা (Cognitive and meta cognitive skills)
২. সামাজিক ও আবেগীয় দক্ষতা (Social and emotional skills)
৩. বাস্তব বা ব্যবহারিক দক্ষতা (Physical and practical skills)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশে জাতীয় ও পরিবর্তিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ও অঙ্গীকার এবং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করে ২০৩০ বা তার পরবর্তী সময় তরুণদের পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ ইতিবাচক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মোকাবেলায় সক্ষম ও সফল করে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা নিরূপণের

Working Draft

জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে ব্যাপক কারিগরি অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতার খসড়া রূপরেখা প্রণয়ন করেছে। এই দক্ষতা রূপরেখার বিশেষত্ব হচ্ছে, এটি বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম বর্তমানে ও ভবিষ্যতে যে চ্যালেঞ্জ ও বাধা মোকাবেলা করছে বা করবে তা বিবেচনায় নিয়ে ভবিষ্যৎমুখী করে প্রণয়ন করা ফলে তা একেবারেই আমাদের নিজস্ব প্রেক্ষাপটভিত্তিক।

উপর্যুক্ত আন্তর্জাতিক ধারণায়নসমূহের প্রতিফলনে এবং বাংলাদেশে প্রণয়নকৃত দক্ষতার রূপরেখা অনুসরণে জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় নিম্নবর্ণিতভাবে দক্ষতাসমূহকে গুচ্ছবদ্ধ করা হয়েছে।

শিখতে শেখার দক্ষতা (Skills for learning to learn)	সূক্ষ্মচিন্তন (Critical thinking) সৃজনশীল চিন্তন (Creative Thinking) সমস্যা সমাধান (Problem solving)
ব্যক্তিগত ক্ষমতায়নের জন্য দক্ষতা (Skills for personal empowerment)	স্ব-ব্যবস্থাপনা (Self-management) (আত্ম সচেতনতা ও বিশ্লেষণ, আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা, সামাজিক বুদ্ধিমত্তা, স্ব-কার্যকারিতা), সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision Making) যোগাযোগ (Communication)
ব্যবহারিক ও সামাজিক দক্ষতা (Practical and social skills)	জীবন ও জীবিকার জন্য প্রস্তুতি (Life & Livelihood) সহযোগিতা (Cooperation) বিশ্ব নাগরিকত্ব (Global citizenship)
মৌলিক দক্ষতা (Foundational skills)	মৌলিক সাক্ষরতা, (Literacy & Numeracy) পরিবর্তন সাক্ষরতা ডিজিটাল সাক্ষরতা (Digital Literacy) (তথ্য, প্রযুক্তি, মিডিয়া)

বর্ণিত দক্ষতাসমূহ যেন শিখনক্রম, যোগ্যতা, শিখন-শেখানো কৌশল এবং মূল্যায়ন কৌশলে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় সেজন্য গুচ্ছভিত্তিক দক্ষতাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

- **সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা (Critical thinking skills)**

  কোন বিমূর্ত ও তাত্ত্বিক বিষয় বা বাস্তব জীবনের সমস্যা অনুপুঙ্খভাবে অনুধাবন বা সমাধান করার জন্য তথ্য-উপাত্ত অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করার বিশেষ ধরনের পদ্ধতিগত চিন্তন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারাকে সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা (Critical Thinking) নামে অভিহিত করা হয় । অধিকাংশ সময়েই মানুষ সচেতনভাবে উপলব্ধি করতে না পারলেও সূক্ষ্ম চিন্তন করার সময় সে আসলে চিন্তনের কতগুলো শৃঙ্খলাবদ্ধ ধাপ অনুসরণ করে কোন একটি সমাধান বা সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। এমন দক্ষতায় পারদর্শী শিক্ষার্থীরা যেকোনো জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় অনুসন্ধানী দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক সূক্ষ্ম দক্ষতাকে সমন্বয় করে কাজ করেন; যেমন : বিষয়টির ধরন অনুযায়ী চিন্তার কৌশল নিয়ে চিন্তা করা, অনুসন্ধানী প্রশ্ন করার কৌশল অনুসরণ, বিশ্লেষণ-সংযোজন ও যৌক্তিকতা নির্ধারণ ইত্যাদি। এর ফলে জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়।

- **সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা (Creative thinking skills)**

Working Draft

গতানুগতিক চিন্তাভাবনার বাইরে নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে নতুন ধারণা সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের দক্ষতাই সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা। এমন দক্ষতায় পারদর্শী শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় গতানুগতিক চিন্তা ধারার পরিবর্তে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে; এর মাধ্যমে যেমন নতুন কৌশল ও উপায় বেরিয়ে আসে অন্য দিকে তেমনি নতুন পথের এবং সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। পরিবর্তনশীল বিশ্বে এমন দক্ষতাই ব্যক্তি ও সমাজকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে।

- **সমস্যা সমাধান দক্ষতা (Problem solving skills)**

  সমস্যা চিহ্নিত করে পদ্ধতিগতভাবে সে সমস্যার সহজ সমাধানে উপনীত হওয়ার দক্ষতাই সমস্যা সমাধান দক্ষতা। সমস্যা সমাধানের নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চর্চা করার মধ্য দিয়ে এই দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে তা বিশ্লেষণ করা, সে অনুযায়ী সমাধানের সম্ভাব্য উপায়সমূহ যাচাই বাছাই করে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

- **সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা (Decision making skills)**

  পরিস্থিতি অনুধাবন করে কোনো সমস্যার তথ্যভিত্তিক একাধিক সমাধানে উপনীত হওয়া এবং যৌক্তিকভাবে একটি সমাধান বাছাই করাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা। অনেকেই যৌক্তিক চিন্তা না করেই সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে যারা পারদর্শী তারা সুনির্দিষ্টভাবে বিষয়েটিকে চিহ্নিত করে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেন, এরপর সম্ভাবনা ও ঝুঁকি বিবেচনা করে সম্ভাব্য উপায়সমূহ যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেন। ফলে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

- **যোগাযোগ দক্ষতা (Communication skills)**

  কার্যকর এবং সহজবোধ্যভাবে তথ্য বা মতামত প্রকাশ করার দক্ষতাই যোগাযোগ দক্ষতা। আমরা মৌখিক, অভিব্যক্তি এবং লিখিত বার্তা ব্যবহার করে তথ্য, মতামত, অনুভূতি ইত্যাদি প্রকাশ করি। এক্ষেত্রে সক্রিয় শ্রবণ, উপস্থাপন শৈলি, আগ্রহের সঙ্গে বার্তা দেয়া-নেয়ার দক্ষতার সমন্বিত প্রয়োগ যোগাযোগ দক্ষতাকে বৃদ্ধি করে।

- **স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা (Self-management skills)**

  সমৃদ্ধ জীবন ও উন্নত সমাজ গঠনে ব্যক্তির বিভিন্ন দক্ষতার পাশাপাশি প্রয়োজন স্ব-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কার্যকরভাবে আত্ম-পরিচর্যা বা নিজেকে ইতিবাচকভাবে পরিচালিত করার সক্ষমতা অর্জন করে ভালো থাকা। এজন্যে বিশেষ কিছু দক্ষতার সমন্বয় প্রয়োজন, যেমন : আত্মসচেতনতা ও আত্ম-বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, আবেগিক বুদ্ধিমত্তা, সামাজিক বুদ্ধিমত্তা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব নিয়ন্ত্রণ, পারস্পরিক সম্পর্কের ফলপ্রসূ ব্যবহার, প্রাত্যহিক জীবনযাপন দক্ষতা এবং সর্বোপরি সময় ব্যবস্থাপনা দক্ষতা।

- **সহযোগিতামূলক দক্ষতা (Collaboration skills)**

  কোনো কাজ সম্পাদনে ও উৎকর্ষ অর্জনে পারস্পরিক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্যে প্রয়োজন সম-মনোভাব ও দলগত চেতনা সৃষ্টি করা। বৈচিত্র্যকে মূল্য দিয়ে বিভেদ কমিয়ে আনা, সহযোগিতার ক্ষেত্র ও কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতার পরিধি প্রসারিত করা মূলত এই দক্ষতার অন্তর্গত।

- **বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা (Global citizenship skills)**

Working Draft

বিশ্ব নাগরিকত্ব হল এমন একটি ধারণা যা মানুষকে বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট উপলব্ধি করে সেখানে তার অবস্থান সুনির্দিষ্ট করতে সহায়তা করে। বিশ্ব নাগরিকত্বের দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার নিজ পরিসর, সমাজ, সংস্কৃতি তথা দেশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে একটি যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন করেন যা বৈষম্যহীন বিশ্ব তৈরিতে এবং মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখে। বিশ্ব নাগরিকত্বের দক্ষতাসম্পন্ন প্রজন্ম দেশ তথা বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বৈশ্বিক নাগরিকত্ব মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে সকলের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ, সহনশীল, একীভূত, সুরক্ষিত এবং টেকসই বিশ্ব গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে।

- **জীবিকায়ন দক্ষতা (Employability skills)**

  কর্মজগতের জন্য প্রস্তুত হতে এবং নিজেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে যে দক্ষতাসমূহ প্রয়োজন তাই হচ্ছে জীবিকায়ন দক্ষতা। কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার পাশাপাশি নিজের কাজ নিজে করতে পারার দক্ষতা, আর্থিক সাক্ষরতা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দক্ষতা, ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও উদ্যোক্তা হওয়ার দক্ষতা, কর্মক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা, নিরাপত্তা ও চাকুরি অনুসন্ধানের দক্ষতা, ভবিষ্যত কর্মদক্ষতা সুনির্দিষ্ট পেশায় নিয়োগের যোগ্যতা বৃদ্ধি করে। এসকল দক্ষতাসমূহের উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা কর্মক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন কর্মে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে।

- **মৌলিক দক্ষতা (Foundational skills – Literacy, Numeracy and Digital literacy)**

  মৌলিক দক্ষতা বলতে পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ উপলব্ধি করে পড়তে, বলতে ও লিখতে বা প্রকাশ করতে, পরিমাপ, হিসাব কষতে এবং মাধ্যম (তথ্য প্রযুক্তি) ব্যবহার করে অনুসন্ধান করতে যেসব দক্ষতার প্রয়োজন হয় এক কথায় সেগুলোকেই বোঝায়। দক্ষতাগুলো হলো :

  - নিজের জানার জন্য প্রয়োজন : সক্রিয়ভাবে পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে (দেখে, শুনে, স্পর্শ করে, স্বাদ ও গন্ধ নিয়ে) পড়ে বুঝার দক্ষতা, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনুসন্ধানের দক্ষতা, গণ ও সামাজিক মাধ্যম থেকে তথ্য যাচাই বাছাইয়ের দক্ষতা
  - অন্যকে জানাতে প্রয়োজন : বলা, লেখার বা বহুমাত্রিক উপায়ে মনের ভাব এবং তথ্য প্রকাশ করার দক্ষতা; তথ্যপ্রযুক্তি এবং গণ ও সামাজিক মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানের দক্ষতা
  - হিসাব নিকাশের জন্য প্রয়োজন : পরিমাপ এবং গাণিতিক দক্ষতা

এছাড়া দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে যেসকল মৌলিক দক্ষতার প্রয়োজন তা হলো বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা, প্রযুক্তি ও ডিজিটাল সাক্ষরতা।

এখানে উল্লেখ্য যে, শিক্ষাক্রমের মূল যোগ্যতাসমূহ অর্জন করতে হলে দক্ষতাসমূহ অর্জন করতে হবে। তাই শিক্ষাক্রমকে ভারাক্রান্ত না করে নিম্নবর্ণিত উপায়ে দক্ষতাসমূহ অর্জনের কৌশল প্রণয়ন করা হবে।

- এমনভাবে শিখন-শেখানো কৌশল প্রণয়ন করা যেন দক্ষতাসমূহ অর্জনের জন্য কার্যক্রম বা পদ্ধতি সকল বিষয়ের শিখন-শেখানো কৌশলে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

Working Draft

- সকল বিষয়ের শিখনক্রম ও অর্জিতব্য যোগ্যতায় দক্ষতাসমূহের প্রতিফলন করা।
- বিশেষ কিছু দক্ষতা বিষয়ভিত্তিক শিখনক্রমের মাধ্যমে অর্জনের ব্যবস্থা করা (ভালো থাকা, জীবন ও জীবিকা, শিল্প ও সংস্কৃতি)

এক্ষেত্রে আরো উল্লেখ্য যে, এটা প্রমাণিত, এককভাবে বিষয়ভিত্তিক ধারণা শেখার চেয়ে আন্তঃবিষয়ক সমন্বয়ের মাধ্যমে শিখলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

২.৫.২.৪ জ্ঞান

জ্ঞান হচ্ছে কোনো বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত তথ্য, ধারণা বা তত্ত্ব। জ্ঞান যেমন তত্ত্বীয় ধারণা নির্ভর তেমনি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোনো কার্যক্রম পারদর্শিতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারার বাস্তব অনুধাবননির্ভরও। জ্ঞানকে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। OECD দেশসমূহে ব্যবহৃত জ্ঞানের সংজ্ঞা ও ধরণ অনুসরণে এই শিক্ষাক্রম রূপরেখায় জ্ঞানকে চারটি ধরণে বিভাজিত করা হয়েছে।

১. বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান (Disciplinary knowledge) : বিষয়ভিত্তিক ধারণা ও বিষয়বস্তু
২. আন্তঃবিষয়ক জ্ঞান (Inter-disciplinary knowledge) : একটি বিষয়ের ধারণা ও বিষয়বস্তুর সংগে অন্য বিষয়ের ধারণা ও বিষয়বস্তুর সংযোগ করতে পারা
৩. বিষয়ভিত্তিক বিশেষ জ্ঞান (Epistemic knowledge) : বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের কাজ ও চিন্তা বুঝতে পারা
৪. পদ্ধতিগত জ্ঞান (Procedural knowledge) : কোন কাজ ধাপে ধাপে কীভাবে করতে হয় সে সম্পর্কিত জ্ঞান

২.৬ মূলনীতি

শিক্ষাক্রম রূপরেখার রূপকল্প, অভিলক্ষ্যসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন ও অনুসরণের মাধ্যমে সঠিকভাবে অর্জন নিশ্চিত করতে দেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কিছু মূলনীতি সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যা এই শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে, সেগুলো হলো:

- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ
- একীভূত (অন্তর্ভুক্তিমূলক)
- বৈষম্যহীন
- বহুমাত্রিক
- যোগ্যতাভিত্তিক
- সক্রিয় ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন
- প্রাসঙ্গিক ও নমনীয়
- জীবন ও জীবিকা-সংশ্লিষ্ট
- অংশগ্রহণমূলক
- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও আনন্দময়

২.৭ মূল যোগ্যতা

Working Draft

রূপকল্প ও অভিলক্ষ্যকে সামনে রেখে তা অর্জনের কৌশল নির্ধারণের জন্য একটি বিস্তারিত কারিগরি পর্যালোচনা করে একজন শিক্ষার্থী এই শিক্ষাক্রমের সর্বোচ্চ স্তর শেষ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অভিযোজনের জন্য চেতনা, মূল্যবোধ, গুণাবলি, দক্ষতা ও জ্ঞানের সমন্বয়ে কী কী যোগ্যতাসমূহ অবশ্যই অর্জন করতে হবে তা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ যোগ্যতাসমূহই মূল যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত। এখানে উল্লেখ্য যে, ক্রমপরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট বিবেচনায় যোগ্যতাসমূহকে রূপান্তরযোগ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। মূল্যবোধ, গুণাবলি, দক্ষতা ও জ্ঞানের সংমিশ্রণে যোগ্যতার ধারণায়ন হলেও যোগ্যতাসমূহকে গতিশীল ও রূপান্তরযোগ্য করতে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে।

১. উদ্ভাবনী – যেন নতুন কিছু সৃষ্টি করার প্রয়াস থাকে
২. পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন – যার মাধ্যমে চাপ, দ্বিধা ইত্যাদি নিরসন হয় এবং নতুন শক্তি সঞ্চয় হয়
৩. দায়িত্ব – জবাবদিহিতার সঙ্গে দায়িত্ব নেয়া

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত যে দশটি মূল যোগ্যতা অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে সেগুলো হলো :

১. অন্যের মতামত ও অবস্থানকে সম্মান ও অনুধাবন করে, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের ভাব, মতামত যথাযথ মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারা।

২. যেকোনো ইস্যুতে সূক্ষ্ম চিন্তার মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সকলের জন্য যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা।

৩. ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করে নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক হয়ে নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনপূর্বক বিশ্ব নাগরিকের যোগ্যতা অর্জন করা।

৪. সমস্যার প্রক্ষেপণ, দ্রুত অনুধাবন, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ তাৎপর্য বিবেচনা করে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে ও সমাধান করতে পারা।

৫. পারস্পারিক সহযোগিতা, সম্মান ও সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারা।

৬. নতুন দৃষ্টিকোণ, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে নতুনপথ, কৌশল ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করে শৈল্পিকভাবে তা উপস্থাপন এবং জাতীয় ও বিশ্বকল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা।

৭. নিজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে নিজ অবস্থান ও ভূমিকা জেনে ঝুঁকিহীন নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ তৈরি করতে ও বজায় রাখতে পারা।

৮. প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ঝুঁকি মোকাবেলা এবং মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবন ও জীবিকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারা।

Working Draft

৯. পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে দৈনন্দিন উদ্ভূত সমস্যা গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ব্যবহার করে সমাধান করতে পারা।

১০. ধর্মীয় অনুশাসন, সততা ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন এবং শুদ্ধাচার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানব-কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারা।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যোগ্যতাকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে সেই অনুযায়ী যোগ্যতার মূল চারটি উপাদান আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল : মূল্যবোধ, গুণাবলি, দক্ষতা ও জ্ঞান। উপর্যুক্ত দশটি মূল যোগ্যতায় ইতোমধ্যে নির্ধারিত মূল্যবোধ, দক্ষতা, গুণাবলি ও জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। প্রতিটি মূল যোগ্যতায় কোনো একটি দক্ষতার প্রাধান্য থাকলেও অন্যান্য দক্ষতাও সেখানে নিহিত রয়েছে। যোগ্যতার সকল উপাদান অর্জন নিশ্চিত করতে শুধু শিখন-ক্ষেত্র এবং নির্দিষ্ট বিষয়গুচ্ছ নয়, বরং শিখন-প্রক্রিয়া কেমন হবে তারও দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যোগ্যতা, চেতনা, মূল্যবোধ – এসকলই যেহেতু ক্রস-কাটিং হিসেবে সকল বিষয়ের শিখনের মধ্য দিয়ে অর্জিত হবে, তাই এই রূপরেখায় ইন্টারডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

২.৮ শিখন-ক্ষেত্র

শিক্ষাক্রমের দশটি মূল যোগ্যতা অর্জনে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের শিখনের দশটি ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর বিকাশের ক্ষেত্র, পূর্বে নির্ধারিত নীতি, মূল্যবোধ, মূল যোগ্যতা ও দক্ষতা, পরিস্থিতি বিশ্লেষণমূলক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং জাতীয় পর্যালোচনাসমূহের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ শিখন-বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে শিখন-ক্ষেত্র নির্বাচন করা হয়েছে। এই নির্বাচনের সময় স্থানীয় ও বৈশ্বিক বিভিন্ন চাহিদা ও প্রেক্ষাপট যেমন বিবেচনা করা হয়েছে, একই সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে একাডেমিক অগ্রাধিকার এবং উচ্চশিক্ষা ও কর্মজগতের বর্তমান ও ভবিষ্যত পরিপ্রেক্ষিত।

যোগ্যতাগুলো অর্জনকল্পে শিক্ষাক্রমে যেসকল শিখন-ক্ষেত্র নির্বাচন করা হয়েছে, সেগুলো হলো :

১. ভাষা ও যোগাযোগ (Language & Communication),
২. গণিত ও যুক্তি (Mathematics & Reasoning),
৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Science & Technology),
৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information & Communication Technology)
৫. পরিবেশ ও জলবায়ু (Environment & Climate),
৬. সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব (Society & Global Citizenship),
৭. জীবন ও জীবিকা (Life & Livelihood),
৮. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা (Values & Morality),
৯. শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা (Physical-Mental Health & Protection),
১০. শিল্প ও সংস্কৃতি (Arts & Culture)

২.৯ শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতা

Working Draft

উন্নয়ন এবং পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের যে দশটি শিখন-ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভেতর কী ধরনের যোগ্যতা অর্জন করা প্রয়োজন তা সুনির্দিষ্টভাবে বোঝার জন্য প্রতিটি শিখন-ক্ষেত্র এবং তার চাহিদা ও ব্যাপ্তি বিবেচনা করে শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী প্রণয়ন ও নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলো হলো :

শিখন-ক্ষেত্র	**শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী**
১. ভাষা ও যোগাযোগ	একাধিক ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার মৌলিক দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা, সাহিত্যের রস আস্বাদনে সমর্থ হওয়া; বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে সৃজনশীল ও শৈল্পিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারা এবং পরমতসহিষ্ণুতার সঙ্গে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কার্যকর ও কল্যাণমুখী যোগাযোগে সমর্থ হওয়া।
২. গণিত ও যুক্তি	সংখ্যা ও প্রক্রিয়া (অপারেশন), গণনা, জ্যামিতিক পরিমাপ এবং তথ্য বিষয়ক মৌলিক দক্ষতা অর্জন ও তা ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রমপরিবর্তনশীল ব্যক্তিগত, সামাজিক জাতীয় ও বৈশ্বিক সমস্যা দ্রুত মূল্যায়ন করে এর তাৎপর্য, ভবিষ্যৎ ফলাফল ও করণীয় জেনে যথাযথ মাধ্যম ব্যবহার করে কার্যকরী যোগাযোগ করতে পারা। এছাড়াও সৃজনশীলতার সঙ্গে গাণিতিক দক্ষতা প্রয়োগ করে যৌক্তিক, কল্যাণকর সমাধান ও সিদ্ধান্ত নিতে পারা এবং উদ্ভাবনী সক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারা।
৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি ব্যবহার করে ভৌত বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট প্রপঞ্চ, ঘটনা ও ঘটনা প্রবাহ ইত্যাদি ব্যাখ্যার আলোকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও বৈশ্বিক সমস্যা দ্রুত মূল্যায়ন ও সমাধান করতে পারা। এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ফলাফল, তাৎপর্য ও করণীয় নির্ধারণ এবং যথাযথ মাধ্যম ব্যবহার করে সৃজনশীল, যৌক্তিক ও কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা এবং উদ্ভাবনী দক্ষতা প্রদর্শন ও বাস্তবায়ন করতে পারা।
৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	তথ্য অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ, যাচাই ও ব্যবস্থাপনা; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ, নৈতিক, যথাযথ, পরিমিত, দায়িত্বশীল ও সৃজনশীল ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যকর যোগাযোগ, সমস্যা সমাধান এবং নতুন উদ্ভাবনে ভূমিকা রাখতে পারা; ডিজিটাল প্রযুক্তির সক্ষমতা অর্জন করে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তব সমস্যার অভিনব ডিজিটাল সমাধান উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিস্তরণ; এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে পারা।
৫. সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব	নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও লালন করে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করতে পারা। প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের ও অন্যের মতামতকে বিবেচনা করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করে নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে ভূমিকা রাখা।

শিখন-ক্ষেত্র	শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী
৬. জীবন ও জীবিকা	ক্রমপরিবর্তনশীল স্থানীয় ও বৈশ্বিক কর্মবাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ও টেকসই প্রাক-কর্ম যোগ্যতা অর্জন করা এবং ভবিষ্যৎ দক্ষতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারা। কর্মের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মাধ্যমে দৈনন্দিন কর্ম-দক্ষতা অর্জন ও উৎপাদনমুখিনতা প্রদর্শন করে নিজ জীবনে তার প্রয়োগ করতে পারা। পেশাদারি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে সৃজনশীল কর্মজগতের উপযোগী ও উপার্জনক্ষম করে গড়ে তুলতে পারা এবং কর্মজগতের ঝুঁকি মোকাবেলার সক্ষমতা অর্জন করে নিজ ও সকলের জন্য সুরক্ষিত, নিরাপদ কর্মজীবন তৈরিতে অবদান রাখতে পারা।
৭. পরিবেশ ও জলবায়ু	পরিবেশের উপাদান, পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত ধারণার আলোকে প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করা। জলবায়ুর ধারণা, পরিবর্তনের কারণ, ব্যক্তি, পরিবেশ ও সামাজিক অর্থনীতিতে এর প্রভাব সম্পর্কে জেনে, বিভিন্ন কৌশল অনুসরণ করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারা।
৮. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	নিজ নিজ ধর্মসহ সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ব্যক্তিস্বাধীনতা, বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান, শুদ্ধাচার, সাংস্কৃতিক নীতিবোধ, মানবিকতাবোধ, মানুষ-প্রকৃতি-পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি মূল্যবোধের গুরুত্ব জেনে তা চর্চার মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও অসাম্প্রদায়িক পৃথিবী সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করা ।
৯. শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা	শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তন ও এর প্রভাব এবং ঝুঁকি সম্পর্কে জেনে যথাযথ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার মাধ্যমে সুস্থ, নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবনযাপনে সক্ষম হয়ে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসাবে অবদান রাখার যোগ্যতা অর্জন করা। নিজের ও অন্যের অবস্থান, পরিচিতি, প্রেক্ষাপট ও মতামতকে সম্মান করে ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবর্তনের সংগে খাপ খাইয়ে সক্রিয় নাগরিক হিসেবে অবদান রাখা।
১০. শিল্প ও সংস্কৃতি	শিল্পকলার বিভিন্ন সৃজনশীল ধারা (চারু ও কারুকলা, নৃত্য, সংগীত, বাদ্যযন্ত্র, আবৃত্তি, অভিনয়, সাহিত্য ইত্যাদি) ও সংস্কৃতির সম্পর্কে ধারণা লাভ করে রস আস্বাদন করতে পারা, চর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো; সংবেদনশীলতা ও নান্দনিকতার বিকাশ এবং নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ ও লালন করে অন্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং শিল্পকলাকে উপজীব্য করে কর্মমুখী ও আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

২.১০ শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরের উদ্দেশ্য

শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষার প্রতিটি স্তরের কিছু সার্বজনীন এবং কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। সার্বজনীন উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ভাষিক, নন্দনতাত্ত্বিক

তথা সার্বিক বিকাশ – যা শিক্ষার সব স্তরেই গুরুত্ব পায়। তবে প্রাক-শৈশব, শৈশব, কৈশোর এবং কৈশোর-পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীর বয়স, আগ্রহ, পরিপক্বতা ও মিথষ্ক্রিয়ার ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের বিকাশ ও শিখনের চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই শিক্ষার নির্দিষ্ট পর্যায়ের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর বিকাশের পর্যায় অনুযায়ী একেকটি নির্দিষ্ট চাহিদাকে কেন্দ্র করে বিবেচনা করা হয়। এর পাশাপাশি নির্দিষ্ট স্তরের উদ্দেশ্য নির্ধারণে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটও বিবেচনায় নেয়া হয়, যা ধাপে ধাপে শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যেমন : প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের মূল উদ্দেশ্য থাকে বাড়ির চেনা পরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম যা শিশুর সার্বিক বিকাশের ধারণাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। আবার প্রাথমিক স্তরে মূলত গুরুত্ব আরোপ করা হয় পড়তে, লিখতে ও গুণতে শেখার মতো মৌলিক বা ভিত্তিমূলক দক্ষতা অর্জনের উপর যা ব্যবহার করে শিশু পরবর্তী স্তরে নানাবিধ যোগ্যতা অর্জন ও স্বশিখন অব্যাহত রাখতে পারে। মাধ্যমিক স্তরে এসে শিক্ষার্থী একদিকে যেমন ভিত্তিমূলক দক্ষতার মজবুতিকরণের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন অব্যাহত রাখবে, তেমনি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় অধিকতর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে যা তাকে সমাজের বৃহত্তর পরিসরে ক্রমশ ক্রিয়াশীল হতে সহায়তা করবে। উচ্চ মাধ্যমিক ও তৎপরবর্তী সময়ে সে বিশেষায়িত ক্ষেত্রে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে পেশাগত প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

উক্ত শিক্ষাক্রমে ব্যক্তিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর বিকাশের ধরন ও চাহিদার পাশাপাশি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে স্তরভিত্তিক যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা নিচের চিত্রে উপস্থাপিত হলো। এখানে আবারও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রতিটি স্তরে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের উপর অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব দেয়া হলেও, এই স্তরভিত্তিক উদ্দেশ্যসমূহ শুধু সংশ্লিষ্ট স্তরেই অর্জিত হবে এমন নয়, বরং প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সকল স্তরেই তা নিহিত থাকবে।

২.১১ শিখন-ক্ষেত্র থেকে বিষয় নির্বাচন

নির্ধারিত দশটি শিখন-ক্ষেত্রের যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। যেহেতু প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় হলো শিশুদের পরবর্তী শিখনের জন্য প্রস্তুতিমূলক

Working Draft

একটি পর্যায়, এই পর্যায়ে শিশুরা কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে আলাদাভাবে শিখনের পরিবর্তে সমন্বিতভাবে একাধিক বিষয় একসঙ্গে শিখনের জন্য অনুশীলন করবে। তবে প্রাথমিক (প্রথম থেকে পঞ্চম) এবং মাধ্যমিক (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি) পর্যায়ে সুনির্দিষ্টভাবে যথাক্রমে আটটি ও দশটি বিষয় পাঠ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন পরিকল্পনার ফলে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিষয়ের বিন্যাসে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয়েছে, এবং শিক্ষার্থীর ধাপে ধাপে উত্তরণ যাতে স্বচ্ছন্দ এবং চাপমুক্ত হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের এই বিষয়সমূহ নির্বাচনের সময় অনেকগুলো দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীর বয়স, আগ্রহ এবং বিকাশের চাহিদা অনুযায়ী বিষয়ের সংখ্যা ও ধরন ঠিক করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষাক্রমের নির্ধারিত মূল যোগ্যতাসমূহ এবং তার ধারাবাহিকতায় শিখন-ক্ষেত্রসমূহের যোগ্যতাসমূহ অর্জনে সমর্থ হয়, কিন্তু একই সঙ্গে বিষয়বস্তুর চাপ যাতে বেড়ে না যায় সেজন্য থিমভিত্তিক ও ইন্টারডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করা হয়েছে। শিখনকে কার্যকরী ও আনন্দময় করতে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের উপর জোর দেয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে একই শিখন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে একাধিক বিষয়ের যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব।

নিচের ছকে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিষয়সমূহের বিন্যাস দেয়া হয়েছে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শিখনক্ষেত্রের সঙ্গে নির্দিষ্ট বিষয়ের সম্পর্ক স্পষ্টত লক্ষণীয়, বস্তুত সকল বিষয়ই সকল শিখন-ক্ষেত্রের যোগ্যতা অর্জনে ভূমিকা রাখবে। কেননা শিখন-ক্ষেত্র ও বিষয়ের মধ্যকার সম্পর্কটি একমুখী নয়।

শিখন-ক্ষেত্র	**স্তরভিত্তিক নির্বাচিত বিষয়সমূহ**		
	প্রাক-প্রাথমিক	প্রাথমিক	মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ- ১০ম শ্রেণি)
ভাষা ও যোগাযোগ	সমন্বিত বিষয়	বাংলা ইংরেজি গণিত সামাজিক বিজ্ঞান বিজ্ঞান ধর্মশিক্ষা ভাল থাকা শিল্প ও সংস্কৃতি	বাংলা ইংরেজি গণিত জীবন ও জীবিকা সামাজিক বিজ্ঞান বিজ্ঞান ডিজিটাল প্রযুক্তি ভালো থাকা ধর্মশিক্ষা শিল্প ও সংস্কৃতি
গণিত ও যুক্তি			
জীবন ও জীবিকা			
সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব			
পরিবেশ ও জলবায়ু			
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি			
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি			
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা			
মূল্যবোধ ও নৈতিকতা			
শিল্প ও সংস্কৃতি			

সাম্প্রতিক সময়ে থিমভিত্তিক ও আন্তঃবিষয়ক কৌশলের (ইন্টারডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ) ইতিবাচক ফলাফলকে নজরে এনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষাক্রমে এই কৌশল বা অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করা হয়েছে। এই বাস্তবতা সামনে রেখে, এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে এই রূপরেখায় মাধ্যমিক পর্যায়ে মূল বিষয়ের পাশাপাশি থিমভিত্তিক বিষয়ও রাখা হয়েছে। শিক্ষাক্রমে নমনীয়তা নীতি গ্রহণ করার ফলে ভবিষ্যতেও এই বিষয় বিন্যাসকে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সাজানোর সুযোগ রয়েছে। থিমভিত্তিক বিষয়গুলো ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও একাধিক আলোচনার ক্ষেত্রের সমন্বয় ঘটেছে, যেমন সামাজিক বিজ্ঞানকে একটি মূল বিষয় হিসেবে ধরা হলেও, ইতিহাস, অর্থনীতি, পৌরনীতি, ভূগোল এসকল বিষয়ের সমন্বয় ঘটেছে এখানে। একইভাবে, বিজ্ঞান বিষয়ে ভৌতবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান

এসকল ক্ষেত্রের শিখনযোগ্যতার সমন্বয় থাকছে। ভাষা শিক্ষায় শোনা, বলা, পড়া, লেখার মত মৌলিক দক্ষতা শুধু নয়, বিকল্প যোগাযোগ দক্ষতাও বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

যেহেতু প্রাক-প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর জন্য শিখনক্ষেত্রসমূহ অভিন্ন থাকছে, কাজেই শিক্ষার্থীরা যাতে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করতে পারে সেজন্য স্তরভিত্তিক উদ্দেশ্য সামনে রেখে স্তরভেদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপেক্ষিত গুরুত্ব বেশি বা কম দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে যেহেতু ভিত্তিমূলক দক্ষতা অর্জনকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, কাজেই মাতৃভাষা, যোগাযোগ ও গাণিতিক দক্ষতা অর্জনকে এই স্তরে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে; অর্থাৎ বাংলা ও গণিত বিষয়-সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অধিকতর গুরুত্ব পাবে। একইভাবে, মাধ্যমিক (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি) স্তরের সকল শিক্ষার্থী যাতে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পারে এবং সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের যোগ্যতাসমূহ অর্জন করে জাতীয়তাবোধসম্পন্ন বিশ্বনাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য এই স্তরে বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান ও ইংরেজি বিষয় অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে।

একাদশ দ্বাদশ শ্রেণিতে মোট ভরের তিন চতুর্থাংশ বিশেষায়িত বিষয়সমূহে জন্য এবং এক চতুর্থাংশ ভর আবশ্যিক বিষয়সমূহের জন্য বরাদ্দ থাকবে এবং এই বিষয়গুলোতে বিভিন্ন শিখনক্ষেত্রের যোগ্যতাসমূহের সমন্বয় থাকবে। এই সমন্বিত বিষয়সমূহে প্রায় সকল শিখনক্ষেত্রের বিভিন্ন মাত্রায় প্রতিফলন থাকতে পারে।

২.১২ বিষয়, বিষয়ের ধারণায়ণ এবং বিষয় ও শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখনক্রম

শিক্ষাক্রম রূপরেখায় উল্লেখিত দশটি মূল যোগ্যতা অর্জনে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দশটি শিখন-ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। আবার এই দশটি শিখন-ক্ষেত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কী ধরনের যোগ্যতা অর্জন করা প্রয়োজন তা সুনির্দিষ্টভাবে বোঝার জন্য শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী প্রণয়ন করা হয়েছে। শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক এই যোগ্যতাবিবরণীর আলোকে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কী কী বিষয় থাকবে সেগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সেই বিষয়সমূহের জন্য বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী প্রণয়ন করা হয়েছে।

দশটি মূল যোগ্যতা, সংশ্লিষ্ট শিখন-ক্ষেত্রের যোগ্যতা এবং সর্বোপরি বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিটি বিষয়ের প্রকৃতি ও পরিসরসহ বিভিন্ন দিক বিবেচনায় নিয়ে বিষয়ের ধারণায়ন করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের এই ধারণায়ন থেকে প্রাপ্ত বিষয়-সংশ্লিষ্ট কয়েকটি মাত্রা বা ডাইমেনশনের উপর ভিত্তি করেই শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখনক্রম ম্যাট্রিক্স প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিখন-ক্ষেত্র থেকে বিষয় **ধারণায়ণ** করার সময় যে দিকগুলোতে লক্ষ্য রাখা হয়েছে :

- শিখনক্ষেত্রের ধরন, মূল যোগ্যতাসমূহ অর্জনে কী কী দক্ষতা প্রয়োজন সেগুলো গুরুত্ব পেয়েছে।
- বিষয়ভিত্তিক মাত্রা বা ডাইমেনশন অনুসারে বিষয়ের ক্রমবিকাশ বিবেচনায় রাখা হয়েছে।
- বিষয়ের মৌলিক/ প্রয়োজনীয় শিখন তত্ত্ব ও তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মূল বিষয়বস্তুসমূহের প্রতিফলন ঘটে।
- বিষয়ের প্রকৃতি বিবেচনায় নিয়ে এর পরিসর নির্ধারণ করা হয়েছে।
- বিষয়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে।
- শিক্ষাক্রমের বর্তমান প্রেক্ষাপট ও পরিবর্তনশীল পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা প্রতিফলিত হয়েছে।

শিখনক্রম ম্যাট্রিক্স-এ প্রথমেই সেই বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক প্রত্যাশার বিবরণী এবং তার নিচে একে একে যোগ্যতাসমূহ বিবৃত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই ম্যাট্রিক্সে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণির শিখনযোগ্যতাসমূহ স্থান পেলেও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যেহেতু একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির মূল লক্ষ্য বিশেষায়ণের জন্য প্রস্তুতি, এই পর্যায়ের বিশেষায়িত বিষয়সমূহের উপর অধিক জোর দেওয়া হবে যা উচ্চ শিক্ষা ও কর্মজগতের জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করবে। আবশ্যিক বিষয়সমূহ এমনভাবে বিন্যস্ত হবে যেখানে একাধিক শিখন-ক্ষেত্রের প্রতিফলন থাকবে। শিক্ষার্থীকে কর্মজগতের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য একটি প্রায়োগিক বা ঐচ্ছিক বিষয় পছন্দ করারও সুযোগ থাকবে।

Working Draft

বিষয় : বাংলা

পটভূমি

অন্যান্য বিষয় শেখার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হবে একই সঙ্গে অন্যান্য বিষয় শিখনের মাধ্যমেও বাংলা ভাষার ভিত্তি দৃঢ় হবে।

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

প্রমিত বাংলা ভাষায় ভাব আদান-প্রদানের (শোনা, বলা, পড়া, লেখা, দেখা ও অনুভব করার) মৌলিক দক্ষতা অর্জন করতে পারা; বাংলা ভাষার মৌলিক দক্ষতা ব্যবহার করে শিখনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞান অন্বেষণে সমর্থ হওয়া। সাহিত্যপাঠে আনন্দ লাভ করতে পারা; বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে বিভিন্ন মাধ্যমে সৃজনশীল ও শৈল্পিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারা এবং পরমতসহিষ্ণুতার সঙ্গে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কার্যকর ও কল্যাণমুখী যোগাযোগে সমর্থ হওয়া।

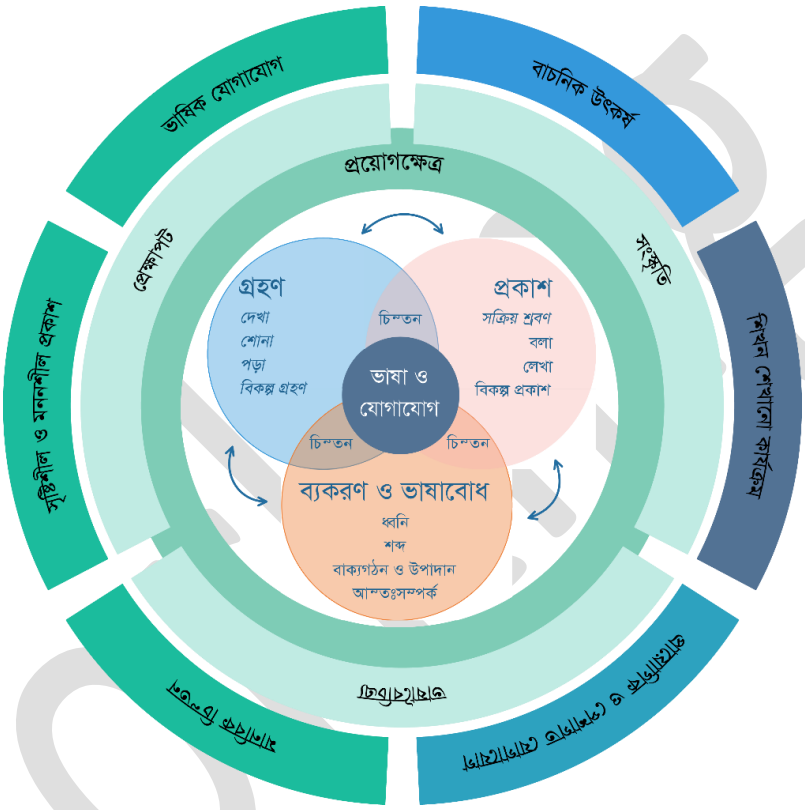

বিষয়ের ধারণায়ন

ভাষা সকল ধরনের যোগাযোগের মাধ্যম, একই সঙ্গে জ্ঞান ও চিন্তার বাহন। শিক্ষাতাত্ত্বিক দিক থেকে ভাষা শিখন-প্রক্রিয়া ও শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রধান ভিত্তি। শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২০-এ বাংলা বিষয়কে প্রধানত ভাষা ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, সেই সঙ্গে অন্যান্য বিষয় শিখনের মাধ্যম হিসেবেও বিবেচনা করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী পরিবেশ, পরিস্থিতি ও পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী যোগাযোগে পারদর্শী হয়ে উঠবে। রূপরেখায় ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতা অর্জনে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার পাশাপাশি দেখা ও অনুভবকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে ।

রূপরেখায় শিক্ষার্থীর ভাষাবোধ ও ভাষাপ্রয়োগকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ভাষাবোধ গড়ে ওঠে প্রধানত ইন্দ্রিয় সংবেদনা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত এবং ভাষা-সংগঠন বা ব্যাকরণ প্রভৃতির আন্তঃসম্পর্কসূত্রে। ভাষাবোধের দৃঢ় ভিত্তির ওপর নির্ভর করে ভাষার যথাযথ, শুদ্ধ ও পরিশীলিত প্রয়োগ অর্থাৎ ভাষা এক দিকে গ্রহণমূলক, অন্য দিকে প্রকাশমূলক। দেখা, শোনা, অনুভব, পড়া প্রভৃতির মাধ্যমে ভাষাভাষীর মধ্যে গড়ে ওঠে গ্রহণমূলক পারদর্শিতা। সেই সঙ্গে বলা, লেখা, ইশারা, স্পর্শ, সক্রিয় শ্রবণ প্রভৃতির মাধ্যমে গড়ে ওঠে ভাষার প্রকাশমূলক পারদর্শিতা। শিক্ষাক্রম

রূপরেখায় বিকল্প গ্রহণ ও বিকল্প প্রকাশকেও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা সকল শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তা ও আবেগিক বুদ্ধিবৃত্তিতে (emotional intelligence) বৈচিত্র্য রয়েছে। শিক্ষার্থীরা অনুভব, স্পর্শ, ঘ্রাণ, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে বিচিত্রভাবে বাস্তব বিশ্বকে অনুভব ও অনুধাবন করে থাকে; এ-কারণে তাদের প্রকাশও হয়ে থাকে ভিন্ন মাধ্যম ও প্রক্রিয়ায়।

ভাষা ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার ৬টি প্রধান প্রয়োগ-ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে :

১. ভাষিক যোগাযোগ;
২. বাচনিক উৎকর্ষ;
৩. শিখন-শেখানো কার্যক্রম;
৪. প্রায়োগিক ও পেশাগত যোগাযোগ;
৫. মানবিক চিন্তন;
৬. সৃষ্টিশীল ও মননশীল প্রকাশ।

ভাষিক যোগাযোগ বলতে বুঝানো হয়েছে বাচনিক ও অ-বাচনিক বিভিন্ন প্রক্রিয়ার যোগাযোগ ও সংজ্ঞাপনকে। শিক্ষার্থীর বলার ধারাক্রমিক দক্ষতা বৃদ্ধিকে চিহ্নিত করা হয়েছে বাচনিক উৎকর্ষ হিসেবে। প্রায়োগিক ও পেশাগত যোগাযোগ বলতে বোঝানো হয়েছে ব্যবহারিক ও পেশাগত জীবনে বাংলা ভাষার যথাযথ প্রয়োগকে; মূলত বিভিন্ন পরিসর এবং পেশাগত জীবনে বাংলা ভাষা প্রয়োগের প্রয়োজনীয় দক্ষতা তৈরি করে দেবে বাংলা বিষয়। বাংলা ভাষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ-ক্ষেত্র হয়ে উঠবে শিখন-শেখানো কার্যক্রম; সকল বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জিত হবার প্রধান মাধ্যম বাংলা ভাষা। তাই বাংলা ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান-অর্জন দক্ষতাকে বৃদ্ধি করবে, শিখন-শেখানো কার্যক্রম হয়ে উঠবে সহজতর ও সহজবোধ্য। বর্তমান শিক্ষাক্রমে বাংলাকে বিবেচনা করা হয়েছে শিক্ষার্থীর মানবিক চিন্তন দক্ষতার প্রয়োগ ও বৃদ্ধির ভাষা হিসেবে। রূপরেখায় চিন্তাকে দেখা হয়েছে মানবিক, যৌক্তিক, সহনশীল ও ইতিবাচকভাবে। চিন্তন-দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ভাষাশৈলিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যেমন : বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, বিশ্লেষণাত্মক ইত্যাদি। সৃষ্টিশীল ও মননশীল প্রকাশ বলতে বোঝানো হয়েছে শিক্ষার্থীর সৃজন ও যুক্তিশীল কর্মকাণ্ডকে; এই প্রকাশ হতে পারে লিখন, বাচন, অংকন, সৃজন, সংজ্ঞাপননির্ভর। সামগ্রিকভাবে বাংলা বিষয় হয়ে উঠবে যোগাযোগ, সংজ্ঞাপন, শিখন-শেখানো কার্যক্রম, চিন্তন ও প্রকাশের প্রধান ভাষা-মাধ্যম।

Working Draft

বিষয় : বাংলা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখনক্রম

প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি	৯ম শ্রেণি	১০ম শ্রেণি
পারিবারিক পরিসর থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের পরিবর্তিত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় যোগাযোগে সক্ষম হওয়া। প্রাক-পঠন ও প্রাক-লিখনে আগ্রহী হওয়া। স্থানীয়, লোকজ, প্রচলিত শিশুতোষ ছড়া, গান ও গল্প স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারা। চারপাশের বস্তু, উপকরণ, চিত্র, দৃশ্য, ঘটনা অনুভূতি প্রকাশ করতে পারা। শিশুদের প্রেক্ষাপটে বক্তব্য বা ঘটনাকে মনোযোগ সহকারে দেখে, শুনে বা স্পর্শ করে অভিব্যক্তিতে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারা।	ব্যক্তিক, পারিবারিক প্রেক্ষাপট ও পরিচিত পরিবেশে প্রমিত/চলিত বাংলা ভাষা শুনে বুঝতে পারা এবং প্রমিত/চলিত বাংলায় কথা বলতে পারা। বাংলা বর্ণ, নির্বাচিত যুক্তবর্ণ, শব্দ এবং সহজ বাক্য পড়তে পারা। স্পষ্ট ও সঠিক আকৃতিতে বাংলা বর্ণমালা, কারচিহ্ন, নির্বাচিত যুক্তবর্ণ, শব্দ ও বাক্য শুনে/দেখে লিখে/ প্রকাশ করতে পারা।	ব্যক্তিক, পারিবারিক প্রেক্ষাপট ও পরিচিত পরিবেশে প্রমিত/চলিত বাংলা ভাষা শুনে বুঝতে পারাএবং প্রমিত/চলিত বাংলায় কথোপকথনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারা। নির্বাচিত যুক্তবর্ণ, কার ও ফলা চিহ্নযোগে গঠিত পরিচিত শব্দ, বাক্য ও সহজ অনুচ্ছেদ পড়ে বুঝতে পারা। বাক্য, অনুচ্ছেদ ও তথ্যমূলক রচনার মূলভাব লিখে/ প্রকাশ করতে পারা।	ব্যক্তিক, পারিবারিক প্রেক্ষাপট ও পরিচিত পরিবেশে প্রমিত/চলিত বাংলায় সাধারণ নির্দেশনা, আদেশ, অনুরোধ, আলোচনা ও কথোপকথন শুনে বুঝতে পারবে এবং নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে পারা। বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক রচনা, প্রতিবেদন, জীবনী, রূপকথা, কবিতা ইত্যাদি পড়ে বুঝতে পারা। অধীত বিষয়বস্তুর মূলভাব লিখে পকাশ করতে পারা এবং নিজ অভিজ্ঞতা/মতামত লিখে/ প্রকাশ করতে পারা।	ব্যক্তিক, পারিবারিক ও সামাজিক পরিসরে প্রমিত বাংলায় সাধারণ নির্দেশনা, কথোপকথন, আলোচনা, ঘোষণা ও বক্তৃতা শুনে বুঝতে পারা। প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে নিজস্ব মতামত/যুক্তি প্রকাশ করতে এবং সৌজন্য বিনিময় করতে পারা। বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও সৃজনশীল রচনা পড়ে বুঝতে পারা। পাঠের অর্ন্তভূক্ত বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণধর্মী মূলভাব এবং সৃজনশীল রচনা লিখে/ প্রকাশ করতে পারা।	ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে প্রমিত বাংলায় বিভিন্ন মাধ্যমে (অডিও ভিজুয়াল) উপস্থাপিত নির্দেশনা, কথোপকথন, আলোচনা, ঘোষণা, বক্তৃতা শুনে বুঝতে পারা। প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে নিজস্ব মতামত/যুক্তি প্রকাশ করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারা। বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও সৃজনশীল রচনা পড়ে আনন্দ লাভ করতে এবং উপস্থাপিত বর্ণনা ও তথ্যের তুলনা করতে পারা। অধীত বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণধর্মী মুলভাব এবং সৃজনশীল রচনা লিখে/ প্রকাশ করতে পারা।	ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে প্রমিত বাংলায় ভাষা শুনে বুঝতে পারা এবং প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা। অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের লেখা বুঝে পড়তে পারা এবং আনন্দের সঙ্গে সাহিত্যপাঠে সমর্থ হবে। উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে প্রায়োগিক, বিশ্লেষণাত্মক, বিবরণমূলক ও সৃজনশীল লিখে প্রকাশ করতে পারা।	ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে প্রমিত বাংলা ভাষা শুনে/ অনুভব ও অনুধাবণ করে বুঝতে পারা এবং প্রমিত বাংলায় কথা বলতে/ প্রকাশ করতে পারা। অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের লেখা বুঝে পড়তে পারবে এবং আনন্দ ও উপলব্ধির সঙ্গে সাহিত্য আস্বাদনে সমর্থ হওয়া। উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে ভাষার সংগঠনসূত্র অনুযায়ী প্রায়োগিক, তথ্যমূলক, বিবরণমূলক, বিশেষণাত্মক ও সৃজনশীল লেখা লিখে/ প্রকাশ করতে পারা।	ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে প্রমিত বাংলা ভাষা শুনে/ অনুভব ও অনুধাবন করে বুঝতে পারা এবং প্রমিত বাংলায় কথা বলতে/ প্রকাশ করতে পারা। অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের লেখা বুঝে পড়তে পারবে এবং আনন্দ ও উপলব্ধির সঙ্গে সাহিত্য আস্বাদনে সমর্থ হওয়া। উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে ভাষার সংগঠনসূত্র অনুযায়ী প্রায়োগিক, তথ্যমূলক, বিবরণমূলক, বিশ্লেষণাত্মক ও সৃজনশীল লেখা লিখে/ প্রকাশ করতে পারা।	ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে প্রমিত বাংলা ভাষা শুনে/ অনুভব ও অনুধাবন করে বুঝতে পারা এবং প্রমিত বাংলায় কথা বলতে/ প্রকাশ করতে পারা। বিভিন্ন ধরনের লেখা বুঝে পড়তে পারা এবং আনন্দ ও উপলব্ধির সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য আস্বাদনে সমর্থ হওয়া। উপযুক্ত শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করে ভাষার সংগঠনসূত্র অনুযায়ী প্রায়োগিক, তথ্যমূলক, বিবরণমূলক, বিশ্লেষণাত্মক ও সৃজনশীল লেখা লিখে/ প্রকাশ করতে পারা।	ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে প্রমিত বাংলা ভাষা শুনে/ অনুভব ও অনুধাবন করে বুঝতে পারা এবং প্রমিত বাংলায় কথা বলতে/ প্রকাশ করতে পারা। বিভিন্ন ধরনের লেখা বুঝে পড়তে পারা এবং আনন্দ ও উপলব্ধির সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য আস্বাদনে সমর্থ হওয়া। পরিশীলিত শব্দ ব্যবহার করে ভাষার সংগঠনসূত্র অনুযায়ী প্রমিত বানান রীতিতে প্রায়োগিক, বিশ্লেষণাত্মক ও সৃজনশীল লেখা লিখে/ প্রকাশ করতে পারা।
পারিবারিক পরিসর থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের পরিবর্তিত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যোগাযোগে সক্ষম হওয়া	শিশুর পারিপার্শ্বিক প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে সাবলীলভাবে পারস্পরিক যোগাযোগে সক্ষম হওয়া	পারিপার্শ্বিক পরিবেশে বয়সের ভিন্নতা অনুযায়ী সম্মান ও মর্যাদা বজায় রেখে সাধারণ যোগাযোগে সক্ষম হওয়া	সৌজন্যমূলক শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে যোগাযোগে সক্ষম হওয়া	ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ, পরিস্থিতি ও ব্যক্তিকে বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগের কৌশল নির্ধারণ করতে পারা	পরিবেশ, পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রেখে ব্যক্তি-মর্যাদা বজায় রেখে যথাযথ স্বরভঙ্গি ও শরীরী ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারা	পরিবেশ, পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা অনুযায়ী মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারা	পরিবেশ, পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা অনুযায়ী প্রসঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে যোগাযোগ করতে পারা	পরিবেশ, পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা অনুযায়ী প্রসঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে ভাববিনিময়মূলক ভাষায় যোগাযোগ করতে পারা	পরিবেশ, পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা অনুযায়ী প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে বিভিন্ন মাধ্যম ও উপকরণ (...) ব্যবহার করে যোগাযোগ করতে পারা	পরিবেশ, পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা অনুযায়ী প্রসঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে বিভিন্ন মাধ্যম ও উপকরণ ব্যবহার করে কার্যকর ভাষায় যোগাযোগ করতে পারা
ধ্বনিসচেতন হয়ে ওঠা।	ধ্বনির প্রমিত উচ্চারণ করতে পারা (ও কাছাকাছি ধ্বনি উচ্চারণ প্রকাশ করতে পারা)	প্রমিত রীতিতে ধ্বনি ও শব্দ উচ্চারণ প্রকাশ করতে পারা	প্রমিত রীতিতে ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য উচ্চারণ/ প্রকাশ করতে করতে পারা	প্রমিত রীতিতে সাবলীলভাবে শব্দ ও বাক্য বলতে পারা	পরিচিত পরিবেশে প্রমিত রীতিতে যোগাযোগ করতে পারা	নতুন ও পরিবর্তিত প্রতিবেশে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা	ব্যক্তিক, সামাজিক পরিসরে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে / প্রকাশ করতে পারা	ব্যক্তিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় পরিসরে যথাযথভাবে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে/ প্রকাশ করতে পারা	ব্যক্তিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় পরিসরে সাবলীলভাবে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা	ব্যক্তিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় পরিসরে সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে/ প্রকাশ করতে পারা
প্রাক-পঠনে আগ্রহী হয়ে ওা	পরিচিত সহজ ও সরল শব্দ ও বাক্য পড়তে পার	একাধিক ছোট বাক্যের অনুচ্ছেদ পড়ে বুঝতে পারা	বিভিন্ন ধরনের বাক্যের অনুচ্ছেদ পড়ে বুঝতে পারা							
কাল্পনিক ও বাস্তব বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠা	কাল্পনিক ও বাস্তব ঘটনাকে আলাদা করে বুঝতে পারা এবং বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারা	ছোট বাক্যের একাধিক অনুচ্ছেদের বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও কল্পনানির্ভর রচনা পড়ে বুঝতে পারা	একাধিক অনুচ্ছেদের বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও কল্পনানির্ভর রচনা পড়ে বুঝতে পারা	বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, কল্পনানির্ভর ও বিশ্লেষণধর্মী রচনা পড়ে বুঝতে পারা	বিভিন্ন রচনাশৈলিতে রচিত লেখা সাবলীলভাবে পড়ে বিষয়বস্তু ও মূলভাব বুঝতে পারা	প্রায়োগিক, বর্ণনা, তথ্য, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর কোনো লেখা পড়ে বিষয়বস্তু বুঝে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে পারা	প্রায়োগিক, বর্ণনা, তথ্য, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর লেখা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজের মতের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারা	প্রায়োগিক, বর্ণনা, তথ্য, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর লেখা এবং কোনো লেখা পড়ে বুঝে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করতে পারা	প্রায়োগিক, বর্ণনা, তথ্য, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর লেখা এবং একাধিক লেখা পড়ে বুঝে লেখার বিষয়বস্তুর সঙ্গে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক বিচার করতে পারা	প্রায়োগিক, বর্ণনা, তথ্য, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর একাধিক লেখা পড়ে বুঝে লেখার বিষয়বস্তুর সঙ্গে লেখকের অবস্থান ও নিজের অবস্থানের তুলনামূলক বিচার করতে পারা

Working Draft

প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি	৯ম শ্রেণি	১০ম শ্রেণি
প্রাক-লিখনে আগ্রহী হওয়া	পরিচিত সহজ ও সরল শব্দ ও বাক্য লিখতে/ প্রকাশ করতে পারা	ছোট বাক্যে ভাব প্রকাশ (লেখা, আঁকা, ব্রেইল...) করতে পারা	বিভিন্ন ধরনের বাক্যে ভাব প্রকাশ (লেখা, আঁকা, ব্রেইল...) করতে পারা	বাক্যের ভাব/বক্তব্য অক্ষুণ্ন রেখে বৈচিত্র্যময় শব্দ প্রয়োগ করতে পারা	বৈচিত্র্যময় শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে ভাব/বক্তব্য অক্ষুণ্ন রেখে বিভিন্ন ধরনের বাক্য গঠন করতে পারা	শব্দের শ্রেণি ও অর্থবৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে ভাব ও যতি অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করতে পারা	শব্দের গঠন ও অর্থবৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে ভাব ও যতি অনুযায়ী বিভিন্ন সংগঠনের বাক্য (সরল, জটিল ও যৌগিক) তৈরি করতে পারা	ব্যাকরণিক সূত্র, বানান ও ভাষারীতি মেনে যথাযথভাবে লিখতে/ প্রকাশ করতে পারা	ব্যাকরণিক সূত্র, প্রমিত বানানরীতি ও ভাষারীতি মেনে যথাযথভাবে লিখতে/ প্রকাশ করতে পারা	ব্যাকরণিক সূত্র, প্রমিত বানানরীতি, ভাষারীতি মেনে বিশিষ্টার্থক শব্দ, বাগধারা প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে যথাযথভাবে লিখতে/ প্রকাশ করতে পারা
চারপাশের বস্তু, উপকরণ, চিত্র, দৃশ্য ঘটনা সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারা	চারপাশের বস্তু, উপকরণ, চিত্র, দৃশ্য ঘটনাকে অনুভব ও উপলব্ধি (পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে) করে সহজভাবে প্রকাশ (বলা, আঁকা, লেখা, অঙ্গভঙ্গি, ইশারা ইত্যাদি) করতে পারা	চারপাশের বস্তু, উপকরণ, চিত্র, দৃশ্য ঘটনাকে অনুভব ও উপলব্ধি (পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে) করে একাধিক ছোট বাক্যে ভাব প্রকাশ (লেখা, আঁকা, ব্রেইল...) করতে পারা	একাধিক অনুচ্ছেদে বর্ণনামূলক ও কল্পনানির্ভর বিষয়কে উপস্থাপন (লেখা, আঁকা, ব্রেইল...) করতে পারা	বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও কল্পনানির্ভর বিষয় উপস্থাপন (লেখা, আঁকা, ব্রেইল...) করতে পারা	বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, কল্পনানির্ভর ও বিশ্লেষণধর্মী রচনা উপস্থাপন করতে পারা	দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বর্ণনা লিখতে পারা, অনুভূতি উপস্থাপন করতে পারা এবং বিভিন্ন ছক, সারণি, ছবিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তকে বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পারা	দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বর্ণনামূলক ভাষায় লিখতে পারা, বিভিন্ন ছক, সারণি, ছবিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তকে বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পারা এবং লেখা বা উপস্থাপনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও অনুভূতির প্রতিফলন করতে পারা	নিজস্ব পর্যবেক্ষণ, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, অভিমত যুক্তিসহ উপস্থাপন করতে পারা এবং বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তকে বিশ্লেষণাত্মক ও প্রতিবেদনমূলক রচনায় রূপান্তরিত করতে পারা	ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে ঘটা বিভিন্ন ঘটনাকে নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও অভিমত দ্বারা যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করতে পারা এবং বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তকে বিশ্লেষণাত্মক ও প্রতিবেদনমূলক রচনায় রূপান্তরিত করতে পারা	বিভিন্ন পরিসর ও পরিপ্রেক্ষিতে ঘটা ঘটনাকে নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও অভিমত দ্বারা যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করতে পারা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত প্রয়োগের মাধ্যমে বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক রচনায় রূপান্তরিত করতে পারা
স্থানীয়/লোকজ/প্রচলিত শিশুতোষ ছড়া, গান ও গল্প স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করা	শিশুতোষ ছড়া, কবিতা, গান ও গল্পে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করা এবং নিজের কল্পনা ও অনুভূতিকে সৃষ্টিশীল উপায়ে (চিত্র, ছবি ও ভাষিক প্রকাশ) প্রকাশ করা	শিশুতোষ ছড়া, কবিতা, গান ও গল্পে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করা, শিশুতোষ সাহিত্যের রূপরীতি, চরিত্রায়ন ও বিষয় উপলব্ধি করা এবং নিজের কল্পনা ও অনুভূতিকে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা	শিশুতোষ সাহিত্যের প্লট, চরিত্রায়ন ও বিষয়বস্তু উপলব্ধি করা এবং নিজের কল্পনা ও অনুভূতিকে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা	শিশুতোষ সাহিত্যের প্লট, চরিত্রায়ন ও মূলভাব উপলব্ধি করে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে পারা এবং নিজের কল্পনা ও অনুভূতি প্রয়োগ করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা	শিশুতোষ সাহিত্যের প্লট, চরিত্রায়ন, মূলভাব ও সংগঠন বুঝতে পারা, নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে বোধ ও চেতনার সমৃদ্ধি ঘটানো এবং নিজের কল্পনা ও অনুভূতি প্রয়োগ করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা	সাহিত্যের প্লট, চরিত্রায়ন, মূলভাব ও রূপরীতি বুঝতে পারা, নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে বোধ ও চেতনার সমৃদ্ধি ঘটানো এবং নিজের কল্পনা ও অনুভূতি প্রয়োগ করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা	সাহিত্যের রূপরীতি বুঝে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা	সাহিত্যের রূপরীতি বুঝে জীবন, সমাজ ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা	সাহিত্যের রূপরীতি বুঝে জীবন, সমাজ ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো বিষয়-সংশ্লিষ্ট উপলব্ধিকে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা অন্য দেশের সাহিত্যের সঙ্গে সেই দেশের সমাজ ও সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করতে পারা। তুলনা করতে পারা	কোনো নির্দিষ্ট সাহিত্য-আঙ্গিকে জীবন, জগৎ ও পরিপার্শ্বকে সমন্বিত করে ব্যক্তিক উপলব্ধিকে সৃষ্টিশীলভাবে প্রকাশ করা।
প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বক্তব্য বা ঘটনাকে মনোযোগ সহকারে দেখে, শুনে বা স্পর্শ করে অভিব্যক্তিতে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারা।	পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপটে বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়কে মনোযোগ সহকারে দেখে, শুনে বা স্পর্শ করে অভিব্যক্তিতে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারা এবং নিজের অভিমত প্রকাশ করতে পারা।	পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপটে বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়কে মনোযোগ সহকারে দেখে, শুনে বা স্পর্শ করে অধিকতর বোধগম্য করার জন্য প্রশ্ন করতে পারা এবং ইতিবাচকভাবে নিজের অভিমত প্রকাশ করতে পারা।	পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপটে বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়কে মনোযোগ সহকারে দেখে, শুনে বা স্পর্শ করে যথাযথভাবে বোঝার জন্য প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে পারা এবং ইতিবাচকভাবে নিজের অভিমত প্রকাশ করতে পারা ও এর পক্ষে যুক্তি দিতে পারা।	পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপটে বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়কে মনোযোগ সহকারে দেখে, শুনে বা স্পর্শ করে যথাযথভাবে বোঝার জন্য কৌতূহলমূলক প্রশ্ন করতে পারা, শ্রুত বিষয়কে প্রকাশ করতে পারা এবং অন্যের অভিমতকে প্রশংসা করা ও নিজের ভুলকে স্বীকার করা।	পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপটে বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়কে মনোযোগ সহকারে দেখে, শুনে বা স্পর্শ করে যথাযথভাবে বোঝার জন্য কৌতূহলমূলক প্রশ্ন করতে পারা, একে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারা এবং অন্যের মতের সঙ্গে তুলনা করে নিজের অভিমতকে পরিশীলিত রূপে প্রকাশ করতে পারা।	কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়কে মনোযোগ সহকারে দেখে, শুনে বা স্পর্শ করে যথাযথভাবে বোঝার জন্য কৌতূহলমূলক প্রশ্ন করতে পারা, নিজের অভিমতের যথার্থতা ফলাবর্তনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে পারা এবং ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করা।	কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়ে নিজের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যের সমালোচনা গ্রহণ করতে পারা এবং ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করতে পারা।	কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়ে নিজের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যের সমালোচনা গ্রহণ করতে পারা, ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করতে পারা এবং ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারা।	কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়ে নিজের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যের সমালোচনা গ্রহণ করতে পারা, ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করতে পারা এবং ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের ভুলকে সংশোধন করে উপস্থাপন করতে পারা।	কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়ে নিজের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যের সমালোচনা গ্রহণ করতে পারা, ইতিবাচক ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে অন্যের মতের সমালোচনা করতে পারা এবং ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের ভুলকে সংশোধন করে উপস্থাপন করতে পারা।

Working Draft

Subject: English

Subject wise competence statement

To be able to communicate effectively using basic skills of English language for day to day purposes, academic purpose and other specific purposes; to be able to exert creative as well as critical insights to express aesthetically, and to appreciate English literary text; to be able to uphold democratic practice in communication at the individual, social, national and global contexts.

Subject conceptualization

Since English is viewed as a foreign language in Bangladesh, the K-12 curriculum of English needs to maintain a balance of focus between real life application and a good understanding of the contexts in which the language learners are going to use English.

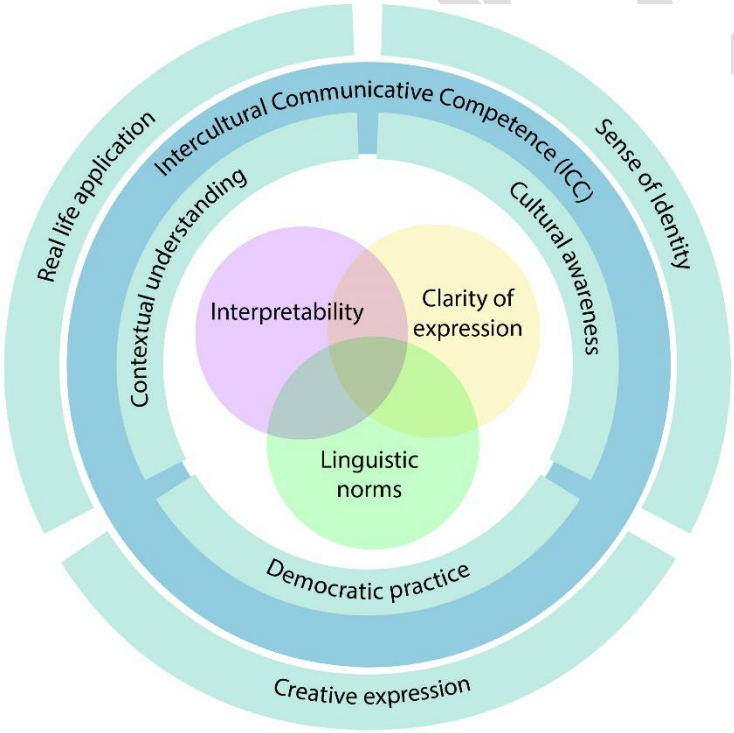

This diagram illustrates how English as a subject is conceptualized in this curriculum framework. The centre of the diagram contains the core knowledge and skills required for a learner. In terms of knowledge, it covers **linguistics rules** along with their **use** relevant for the local and global contexts. One key skill, **interpretability**, taps learners' ability to interpret and understand literal as well as intended meaning of a given verbal or non-verbal text. Another skill is **clarity of expression**, and it demands the learners' ability to express clearly, concisely, distinctively, and appropriately in effective communication. However, effective communication does not rely only on any particular knowledge and sets of skills, rather it requires **contextual understanding** and **cultural awareness** along with a **democratic attitude**. These three aforesaid components form a mediating lens which leads to the idea of **Intercultural Communicative Competence (ICC).**

A context sensitive cultural awareness in communication denotes an empathetic attitude, and ensures admiration and appreciation to diverse practice in communication. Consequently, a democratic attitude on part of the language users becomes mandatory as it facilitates a mindset to acknowledge different opinions in communication and the varied ways of expression, as well as the readiness to articulate personal viewpoints.

In terms of English teaching-learning, as a *second* or *foreign* language, the prevalent ideas of communicative competence has been questioned in relation to the notion of sociolinguistic

competence. The idea of sociolinguistic competence to an extent celebrates the cultural norms and practice embedded in English speaking society. As a matter of fact, language is not a value-free media, rather it carries a particular culture which can create a social hierarchy in relation to English and non-English speaking contexts. In accordance with the presentation of the language itself and the culture associated, it is essential for learners from a non-English speaking context to have a critical insight when learning to communicate in that particular language. That leads to the concept of ICC and it acts like a mediating lens to regulate learner's interpretation and expression following the linguistic norms, and equip them to practice English in preferred manner.

Through ICC, the core knowledge and skills are mediated for the applications in three major areas which are - **real life application, sense of identity,** and **creative expression**. **Real life application** covers the practice of English in everyday communication, for academic purpose, as well as for other specific purposes. As language is a media to exchange thoughts and emotion, learners need to internalize aesthetic value for **creative expression** as well as to appreciate the beauty of literature. Additionally, being recognized as an international language, English enables learners to access and appreciate arts and literature from different contexts and culture across the world. Apart from real life application and creative expression, another field of application is unveiled with the language users' capability to demonstrate a **sense of identity** in their practice. Learners' sense of identity equips them with the ability to recognize and evaluate the linguistic norms with regard to the power relation in a particular cultural context; and therefore, empowers them with the ability to prefer appropriate norms over others in accordance with the context. Consequently, it enables the learners to minimize the discriminatory aspects of linguistic practice and promote democratic practice in communication.

It is worthwhile to mention that, existing English curriculum in primary and secondary level promotes some of the aspects mentioned above. However, since that curriculum was not competency based, rather mostly focused on contents, this is presumably difficult for both the teachers and learners to relate the activities with the notion those were meant for. On that account, this framework attempts to connect the dots and incorporate an integrated approach in order to decipher the curricular competencies into meaningful classroom activities. This approach aligns it with the recent global trends in ELT with reference to EFL pedagogical context; and thereby, the tenets of critical and post-method pedagogy are contemplated and their implications are embedded in this curriculum framework.

Subject: English

Gradewise competency statements and learning continua

Pre-Primary	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	Grade 6	Grade 7	Grade 8	Grade 9	Grade 10
	Ability to experience different aspects (shape, visual, and sounds) of English language through different media	Ability to experience different media in English, to write alphabets, and to communicate at beginner level	Ability to associate verbal and non-verbal expressions and respond accordingly	Ability to interpret verbal and non-verbal communication recognizing simple sentence structure, and to express from own imagination	Ability to express appropriately using verbal and non-verbal cues, and to explore basic linguistic rule	Ability to communicate with relevance to the context, to use contextual clues to comprehend literary text, and to appreciate democratic practice in communication	Ability to transform sentence structure and repair communication breakdown, to embed democratic norms with relevant social practices, and to create emotional connection with literary text	Ability to explore different genre and appreciate the use of ornamentation in literary text, to paraphrase and use cohesive devices, and to recognize the power relation in communication	Ability to use tonality in text and distinguish between facts and opinion, to explain organization of different genre, to critically analyze the power relation in communication, and to internalize aesthetic values	Ability to interpret literal and intended meaning of a text, relate different genre with their social purpose, to critically analyze the power relation in communication, and to internalize aesthetic values
	Ability to pick words and respond to small conversation	Ability to participate in small conversation	Ability to communicate using simple sentence structures	Ability to communicate on familiar topic with limited vocabulary	Ability to address other persons appropriately in a conversation	Ability to communicate with relevance to a given context	Ability to repair communication breakdown relating to the contexts	Ability to paraphrase and summarize a conversation /text	Ability to distinguish between facts and opinion in a given text	
	Ability to identify alphabet associating with their shapes and phonemes	Ability to write alphabet	Ability to associate spelling of familiar words with the sound, and to write small sentences	Ability to recognize and explain simple sentence structures	Ability to explore basic grammar rules in a given text	Ability to use appropriate vocabulary/ expression (in form of synonyms, antonyms, phrases, etc.) in accordance with the context	Ability to recognize and transform different sentence structures	Ability to identify and use cohesive devices in oral/written text	Ability to devise tonality to maintain clarity of expression	Ability to interpret a text considering the source, context and manner
								Ability to explore basic features in different genre of text	Ability to identify structures and organizations of different genre	Ability to produce text in different genre in accordance with its social purposes
			Ability to pay attention to one's voice and gesture in communication	Ability to interpret one's voice and gesture and relate them to the conversation	Ability to use appropriate gesture in verbal and/or non-verbal communication	Ability to appreciate democratic atmosphere in communication, and participate accordingly	Ability to practice democratic norms in accordance with relevant social practices	Ability to recognize linguistic norms in relation to power relation and hierarchy in a particular cultural context	Ability to critically analyze and evaluate linguistic norms in accordance with power relation in a particular cultural context	
	Ability to appreciate rhymes, stories with visuals, music etc.		Ability to express one's feeling/ preferences in simple sentences	Ability to produce text on imaginary topic using limited vocabulary	Ability to express own imagination using verbal and non-verbal cues	Ability to comprehend and connect to a literary text using contextual clues	Ability to connect emotionally with a literary text and express personal feelings on it	Ability to appreciate the use of stylistics and ornamentation (imagery, simile, metaphor, etc.) in a literary text	Ability to appreciate aesthetics in English literary text, and to internalize aesthetic value in one's own articulation	

Working

বিষয় : গণিত

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

সংখ্যা, গণনা, জ্যামিতি, পরিমাপ ও তথ্য বিশ্লেষণের ধারণা আয়ত্তীকরণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও বৈশ্বিক সমস্যার দ্রুত মূল্যায়ন করে কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে বর্তমান সমস্যার সমাধান ও ভবিষ্যত সমস্যা সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণ করতে পারা। এছাড়া গাণিতিক দক্ষতা ব্যবহার করে যৌক্তিক ও কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা এবং উদ্ভাবনী সক্ষমতা প্রদর্শন ও প্রয়োগ করতে পারা।

বিষয়ের ধারণায়ন

গণিত এমন একটি চিন্তন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিমূর্ত ধারণাকে যৌক্তিকভাবে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। তাই গণিতের মূল ভিত্তি যুক্তি ও সৃজনশীলতা। জটিল বৈজ্ঞানিক সমস্যা থেকে শুরু করে প্রাত্যহিক হিসাব নিকাশ পর্যন্ত গণিতের বিস্তৃতি দৃশ্যমান।

শিক্ষাক্রম রূপরেখা প্রণয়নের ক্ষেত্রে শুধু কিছু সূত্র মুখস্থ করে তার সাহায্যে পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক সমস্যা সমাধান নয় বরং গণিতের প্রকৃতি, যৌক্তিক চিন্তন, বাস্তব জীবনে এগুলোর প্রয়োগ ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেজন্য এই বিষয়ের ধারণায়নের কেন্দ্রে রাখা হয়েছে গাণিতিক অনুসন্ধান, যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা গাণিতিক দক্ষতা ও দৃষ্টিভিঙ্গি ব্যবহার করে গণিতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন করবে। গণিতের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য চারটি ডাইমেনশন নির্ধারণ করা হয়েছে, যেগুলো হল: সংখ্যা ও পরিমাণ, গাণিতিক সম্পর্ক, আকৃতি এবং সম্ভাব্যতা। এই চারটি ডাইমেনশনে গাণিতিক অনুসন্ধান চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতাসমূহ অর্জন করবে তা সে তার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবে। এসকল প্রয়োগক্ষেত্রকে চারটি মূল ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যেমন : দৈনন্দিন জীবনে, সমাজ জীবনে, কর্মজগতে এবং গণিতের উচ্চতর শিখন ও গবেষণাসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে।

গণিত বিষয়ের ধারণায়নে উঠে আসা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিতভাবে নিচে আলোকপাত করা হল।

গাণিতিক অনুসন্ধান

গণিত বিষয়ের একটি মূল লক্ষ্য হলো গাণিতিক সাক্ষরতা – যা বাস্তব জীবনের কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কীভাবে সমস্যাকে পরিকল্পনা করতে হয় এবং এর একটি গাণিতিক রূপ দিয়ে তা ব্যাখ্যা ও সমাধান করা যায় সে ধরনের সক্ষমতা প্রদান করে। আর সমস্যা সমাধানের এই সুসংবদ্ধ প্রক্রিয়াকে বলা হয় গাণিতিক অনুসন্ধান। গণিত হচ্ছে যথার্থভাবে সংজ্ঞায়িত বস্তু এবং ধারণা সম্পর্কিত বিজ্ঞান যেখানে গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া ব্যবহার করে বিভিন্নভাবে বস্তু বা ধারণার ব্যাখ্যা ও রূপান্তরের মাধ্যমে একটি নিশ্চিত উপসংহারে পৌঁছা সম্ভব হয়।

বস্তুনিষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্যভাবে যুক্তি উপস্থাপন একটি দক্ষতা। প্রযুক্তিনির্ভর এ বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ এ দক্ষতাটির চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীরা তাদের বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানে এমন একটি

ফলাফলে উপনীত হয় যেটিকে তারা পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে সঠিক বলে মনে করে। গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া অনুসরণ করে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যে উপসংহারে পৌঁছানো যায় তা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ হয় এবং বাস্তব বা বিমূর্ত যেকোনো গাণিতিক সমস্যা সমাধানে এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। এজন্য এই রূপরেখায় গাণিতিক অনুসন্ধানকে ধারণায়নের মডেলের কেন্দ্রে অবস্থান দেওয়া হয়েছে।

গাণিতিক অনুসন্ধানের আলোকে যে বিষয়গুলো উপলব্ধি করা যায় সেগুলো হলো :

- পরিমাণ, সংখ্যা-কাঠামো ও তাদের বীজগণিতীয় সম্পর্ক উপলব্ধি করা
- বিমূর্ত ধারণা ও তাদের প্রতিকীয় সৌন্দর্য উপভোগ ও প্রশংসা করা
- গাণিতিক গঠন এবং তাদের ধারাবাহিকতা দেখা
- রাশিসমূহের কার্যকর সম্পর্ক মেনে নেওয়া
- ভৌত, জীব, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আচরণিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গাণিতিক মডেলকে লেন্স হিসেবে ব্যবহার করা
- পরিসংখ্যানের হৃদযন্ত্র হিসেবে চলকের ভূমিকা উপলব্ধি করা (পিসা ২০২১: গণিত ফ্রেমওয়ার্ক)

এবার আমরা গাণিতিক অনুসন্ধানের উপলব্ধিগুলোকে যদি বিশ্লেষণ করি তা হলে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে আসে:

১. তাত্ত্বিক দিক : যার মধ্যে রয়েছে, সংখ্যা ও পরিমাণ, গাণিতিক সম্পর্ক, আকৃতি ও সম্ভাব্যতা।
২. ব্যবহারিক দিক : যার মধ্যে রয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, দৈনন্দিন জীবন, কর্মজগৎ ও সমাজ।

একজন শিক্ষার্থী গাণিতিক অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে চারটি ডাইমেনশন বা ক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে বিকাশমান হবে তার একটি বর্ণনা নিচে তুলে ধরা হলো :

- **সংখ্যা ও পরিমাণ**

সংখ্যা একটি বিমূর্ত ধারণা। সংখ্যার সঙ্গে যখন পরিমাণ যুক্ত হয় তখন সংখ্যা বোধ তৈরি হয়। পরিমাণের ধারণা ছাড়া সংখ্যা ব্যাখ্যা সহজ নয়।

আমরা যদি মহাবিশ্বের দিকে তাকাই তা হলে দেখতে পাই, মহাবিশ্ব হচ্ছে গ্যালাক্সি থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অসংখ্য অণু পরমাণুর মহাসাগর যেখানে বস্তুসমূহের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন ঘটনা। মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা এবং প্রতিটি সত্তা কীভাবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করছে তার সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য সংখ্যা ও পরিমাণের ধারণা; অর্থাৎ সংখ্যা-বোধ হচ্ছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গাণিতিক দিক, যা শিক্ষার্থীকে এই বিশাল জগতে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। এর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে বস্তুকণার বৈশিষ্ট্য, সম্পর্ক ও অবস্থানকে সংখ্যার আলোকে প্রকাশ করা এবং পরিমাণের আলোকেই এ প্রকাশকে বিচার করা। পরিমাণের এ ধারণা থেকে আমরা পরিমাপ, গণনা, বিস্তার, একক, নির্দেশক, আকৃতি, ক্রমিক সংখ্যার প্রবণতা ও প্যাটার্ন উপলব্ধি করি। এভাবেই গণিতজ্ঞদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কল্যাণেই মানুষ অসংখ্য বস্তু জগতের ঐক্য ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে অবগত হয়েছে।

পৃথিবীর বিশালত্ব পরিমাপ এবং বর্ণনা করার জন্য তাকে সংখ্যায় প্রকাশ করা একটি প্রাথমিক প্রক্রিয়া। যা কোনো একটি অবস্থার মডেলিং, পরিবর্তন ও সম্পর্ক পরীক্ষণ, আকার আকৃতি এবং তথ্য সংগঠন ও অনিশ্চয়তা পরিমাপ করার অনুমতি প্রদান করে।

Working Draft

- **গাণিতিক সম্পর্ক**

প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম জগতের বস্তু এবং পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বহু ধরনের স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পর্ক দেখা যায়। যেখানে একটি সিস্টেমের ভেতর ঘটে চলা বস্তুসমূহের পরিবর্তন অথবা পারিপার্শ্বিকতায় একটি উপাদান আর একটি উপাদানকে কীভাবে প্রভাবিত করছে তা দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই এ পরিবর্তন দীর্ঘ কিংবা অল্প সময়ব্যাপী সংঘটিত হয়। আবার অন্য ক্ষেত্রে একটি বস্তু বা পরিমাণ অন্যটির পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। কোনো ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয় আলাদা আলাদা আবার কখনো নিরবিচ্ছিন্নভাবে হয়ে থাকে। এই সম্পর্কগুলো কখনো কখনো প্রকৃতিতে দীর্ঘস্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয়। গাণিতিক মডেলের আলোকে এ পরিবর্তন পূর্বানুমান ও ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থাৎ গাণিতিকভাবে পরিবর্তন এবং সম্পর্ককে যথাযথ ফাংশন এবং সমীকরণের সাহায্যে মডেলিং করা যায়। এই মডেলই বাস্তব জীবনের কোনো ঘটনাকে প্রতীক বা গ্রাফের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে।

বাস্তব জীবনে এ ধরনের গাণিতিক সম্পর্ক সরল রৈখিক হয় না যদিও সরল রৈখিক সম্পর্ক খুব সহজেই বোঝা যায়। সরল রৈখিক সম্পর্ক আমলে নেয়া অনেক সময় বিপদ ডেকে আনতে পারে। আমরা যদি কোভিড ১৯-এর কথা চিন্তা করি তবে এটা কোনো রৈখিক সম্পর্ক নয়, বরং একটি সূচকীয় সম্পর্ক। এ ধরনের সম্পর্ক উপস্থাপন এবং ব্যাখ্যা বহুমাত্রিক হয়ে থাকে।

- **আকৃতি**

আমরা আমাদের দৃশ্যমান জগতে প্রতিনিয়ত আকার আকৃতি সম্পর্কিত প্রপঞ্চের (phenomena) সম্মুখীন হই যেমন; জ্যামিতিক প্যাটার্ন, বস্তুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, অবস্থান এবং ওরিয়েন্টেশন, বস্তুর উপস্থাপন, দৃশ্যমান তথ্যের কোডিং এবং ডিকোডিং, বাস্তব আকৃতির সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া ইত্যাদি। জ্যামিতিক ধারণা আকার আকৃতির ব্যাখ্যায় ভিত তৈরি করলেও পরিমাপ এবং বীজগণিতের ধারণায়নেও জ্যামিতির ভূমিকা রয়েছে।

আমরা সচরাচর যে ধরনের আকৃতি দেখতে পাই তা প্রতিসাম্য (symmetry) প্যাটার্ন অনুযায়ী নয়। তাই জ্যামিতির সহজ সূত্রের সাহায্যে এ ধরনের অনিয়মিত আকৃতি পরিমাপ করা জটিল। কাজেই আকৃতির পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি কাছাকাছি ফলাফলের উপরই নির্ভর করতে হয়। এক্ষেত্রে যতটা ত্রুটিমুক্ত করা সম্ভব তা করা হয়ে থাকে।

- **সম্ভাব্যতা**

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রাত্যহিক জীবন বা সমাজে সম্ভাব্যতা বা অনিশ্চয়তাকে উপেক্ষা করা যায় না। তাই সম্ভাব্যতা বা অনিশ্চয়তা গাণিতিক ব্যাখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ। গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে, সম্ভাব্যতা যাচাই, তথ্য উপস্থাপন – এ সব ক্ষেত্রই অনিশ্চয়তার ঘটনা একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

স্বাস্থ্যঝুঁকি নির্ধারণ, নির্বাচনী মতামত, জনসংখ্যার প্রবণতা ইত্যাদি উপস্থাপনে গ্রাফ ও পরিসংখ্যান একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে আছে। প্রতিটি ক্ষেত্রই একটি সম্ভাব্য ফলাফলের উপর আলোকপাত করে। ডাটা সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্যতা উপস্থাপন করাই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লেখিত চারটি ডাইমেনশনের আলোকে অর্জিত গাণিতিক সাক্ষরতা একজন শিক্ষার্থী প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করতে পারছে কিনা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিচে এই প্রয়োগের চারটি প্রধান ক্ষেত্র তুলে ধরা হলো:

Working Draft

- **গণিত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি**

  গণিতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চতর শিখন ও গবেষণাসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্র; যেমন : আবহাওয়া ও জলবায়ু, বাস্তুসংস্থান, মহাকাশ বিজ্ঞান, ওষুধ প্রস্তুত, জেনেটিক্স ইত্যাদি ক্ষেত্রে গাণিতিক সাক্ষরতার প্রয়োগ।

- **দৈনন্দিন জীবন**

  দৈনন্দিন জীবনে নানা ক্ষেত্রে মানুষকে প্রতিনিয়ত গণিতের ব্যবহার করতে হয়। যেমন : খাবার প্রস্তুত, ক্রয় বিক্রয়, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, যাতায়াত, ভ্রমণ, প্রতিদিনের কাজের সূচি তৈরি ইত্যাদি।

- **কর্মজগত**

  কর্মজগতের অনেক সমস্যা সমাধানে গণিতের ধারণা ব্যবহার করতে হয়। যেমন : পরিমাপ, বাজেট প্রণয়ন, হিসাব নিকাশ, মান নিয়ন্ত্রণ, অফিস সময়সূচি, বর্ণনামূলক তালিকা, নকশা প্রণয়ন, চাকুরি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে গণিতের ব্যবহার প্রণিধানযোগ্য।

- **সমাজ**

  সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত; যেমন : স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে গণিতের জ্ঞান প্রয়োগ করা। যেমন : নির্বাচন-ব্যবস্থা, গণপরিবহণ, সরকার, জনমিতি, বিজ্ঞপ্তি প্রদান, জাতীয় পরিসংখ্যান, অর্থনীতি ইত্যাদি।

নিচের শিখনক্রমের শুরুতে শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী এবং তার নিচে শিখন যোগ্যতাসমূহ বিবৃত হয়েছে। শিখনক্রমের অনেক ক্ষেত্রে একই শিখন যোগ্যতা একাধিক শ্রেণিতে বিবৃত হয়েছে। এসকল ক্ষেত্রে শিখন অভিজ্ঞতার ধরন ও বিষয়বস্তুর গভীরতা ও কাঠিন্য ব্যবহার করে শ্রেণিভিত্তিক বিস্তৃতি নির্ধারণ করতে হবে।

Working Draft

বিষয় : গণিত

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখনক্রম

প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি	৯ম শ্রেণি	১০ম শ্রেণি
চার পাশের চেনা বস্তুসমূহ পর্যবেক্ষণ করে সংখ্যা, আকৃতির ধারণা ও পরিমাণের ভিন্নতা উপলব্ধি করা।	বস্তু ও ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে এদের মধ্যকার প্যাটার্ন খুঁজে বের করা ও একই ধরনের ঘটনা বা বস্তুকে শ্রেণিবদ্ধ করা।	গাণিতিক যুক্তি ব্যবহার করে চেনা বাস্তব পরিবেশের সমস্যার সমাধান নিরপেক্ষভাবে খুঁজে বের করা ও প্রাপ্ত সমাধানের সৃজনশীল উপস্থাপন করা।	গাণিতিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে জ্যামিতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি এবং তথ্য বিশ্লেষণে গাণিতিক সম্পর্ক ও নীতি ব্যবহার করে সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানে উপনীত হতে পারা।	পরিমাপের ক্ষেত্রে ফলাফলের চেয়ে গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার বস্তুনিষ্ঠতার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করে সমস্যা সমাধান করতে পারা। জ্যামিতিক আকার, আকৃতি গঠন ও চেনা পরিবেশের তথ্য গ্রহণযোগ্যভাবে উপস্থাপন করতে পারা	বিমূর্ত গাণিতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যায় সংখ্যা, রাশি ও চলকের ব্যবহার উপলব্ধি করে সমস্যা সমাধান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গণিতের প্রয়োগ উপলব্ধি করতে পারা। পরিবর্তিত উপাদান ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে জ্যামিতিক আকার আকৃতি গঠন করে উপাদান ও বৈশিষ্ট্য এবং আকৃতির আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় করতে পারা।	গাণিতিক সমাধানের জন্য বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিকল্পনা বাছাই করে সমাধানে উপনীত হয়ে ফলাফলের আসন্ন মান হৃদয়ঙ্গম করা। বাস্তব ক্ষেত্রে জ্যামিতিক আকার ও আকৃতি ব্যবহার করতে পারা এবং বিমূর্ত রাশি ও প্রতীকের মাধ্যমে গণিতের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারা	গাণিতিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে বাস্তব ও বিমূর্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা এবং গণিত যে প্যাটার্ন ও শৃঙ্খলার বিজ্ঞান তা উপলব্ধি করে চারপাশের জগতকে বোঝার জন্য গাণিতিক দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহারে আগ্রহী হওয়া	গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সমাধানকে একই সঙ্গে ক্রিটিক্যালি ও মুক্ত মন নিয়ে যাচাই এবং জগতের প্যাটার্ন ও শৃঙ্খলা উপলব্ধি করে বাস্তব ও বিমূর্ত জগতের ঘটনাবলিকে গণিতের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারা	গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া ও প্রাপ্ত বিভিন্ন সমাধানকে একই সঙ্গে ক্রিটিক্যালি ও মুক্ত মন নিয়ে যাচাই এবং বাস্তব ও বিমূর্ত জগতের ঘটনাবলির প্যাটার্ন ও শৃঙ্খলা উদঘাটন করে তার বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা গণিতের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারা	গাণিতিক যুক্তি ব্যবহার করে অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিচালনা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে গণিতের প্রকৃতি উপলব্ধি করা ও গাণিতিক সাক্ষরতা অর্জনে সচেষ্ট হওয়া।
		চেনা বাস্তব পরিবেশে সমস্যা খুঁজে বের করা ও তার নিরপেক্ষ সমাধানে গাণিতিক অনুসন্ধান পরিচালনা করতে পারা।		গাণিতিক অনুসন্ধানের একটি মাত্র পদ্ধতি আছে তা নয় বরং একই সমস্যা একাধিকভাবে সমাধান করা যায় তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা।		গাণিতিক সমস্যা সমাধানে একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করা ও বস্তুনিষ্ঠভাবে বিকল্পগুলোর উপযোগিতা যাচাই করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারা।		বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া এবং প্রাপ্ত বিভিন্ন সমাধানকে একইসঙ্গে ক্রিটিক্যালি এবং মুক্ত মন নিয়ে দেখা এবং যৌক্তিকভাবে যাচাই করতে পারা		অনুসৃত গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে ধারণা পুনর্গঠন করতে পারা গাণিতিক দক্ষতা ব্যবহার করে জীবনব্যাপী নতুন গাণিতিক অনুসন্ধানের পরিকল্পনা ও সমাধানের মাধ্যমে ধারণা পুনঃনির্মাণে পারঙ্গম হওয়া
বিভিন্ন পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি কীভাবে ঘটে তা পর্যবেক্ষণ করতে পারা	বিভিন্ন পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি অনুমান করতে পারা ও সংখ্যা ব্যবহার করে তা প্রকাশ করতে পারা	কোন গাণিতিক সমস্যার সমাধান করার আগে উত্তর কী হতে পারে তা অনুমান করতে পারা	গাণিতিক ক্রিয়ার (Mathematical operation) মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান করার আগে উত্তর কী হতে পারে তা অনুমান করতে পারা	মানসাঙ্ক ও লিখিত/পদ্ধতিগত দুই রকম কৌশল ব্যবহার করেই কোন গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা	মানসাঙ্ক ও লিখিত/পদ্ধতিগত দুই রকম কৌশল ব্যবহার করেই দক্ষতার সঙ্গে কোন গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা ও উত্তর যাচাই করতে পারা	মানসাঙ্ক ও লিখিত/পদ্ধতিগত কৌশলের সমন্বয়ে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পারা	মানসাঙ্ক, লিখিত/পদ্ধতিগত এবং ডিজিটাল কৌশলের সমন্বয়ে জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পারা	বিভিন্ন ধরনের মানসাঙ্ক, লিখিত/পদ্ধতিগত এবং ডিজিটাল কৌশলের সমন্বয়ে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করে জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা	বিভিন্ন ধরনের মানসাঙ্ক, লিখিত/পদ্ধতিগত এবং ডিজিটাল কৌশলের সমন্বয়ে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করে জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা ও তার গাণিতিক মডেল উপস্থাপন করতে পারা	বিভিন্ন ধরনের মানসাঙ্ক, লিখিত/পদ্ধতিগত এবং ডিজিটাল কৌশলের সমন্বয়ে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করে জটিল তথ্য সম্বলিত গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা ও তার গাণিতিক মডেল উপস্থাপন করতে পারা।
বিভিন্ন পরিমাণের মধ্যে ভিন্নতা উপলব্ধি করতে পারা	দৈনন্দিন ভাষায় বিভিন্ন ধরনের পরিমাপ বর্ণনা ও তুলনা করতে পারা	প্রচলিত একক ব্যবহার করে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিভিন্ন ধরনের পরিমাণের পরিমাপ করতে পারা	বিভিন্ন ধরনের পরিমাপের এককের তুলনা, রূপান্তর করতে পারা	যৌগিক পরিমাপের হিসাব করা এবং পরিমাপের ফলাফলের চেয়ে পরিমাপের পদ্ধতির বস্তুনিষ্ঠতার উপর গুরুত্ব প্রদান করতে পারা	যৌগিক পরিমাপের হিসাব করতে বিভিন্ন পদ্ধতির তুলনা করা ও যৌক্তিক অবস্থান নিতে পারা	বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিমাপ করে ফলাফলে উপনীত হওয়া এবং এই পরিমাপ যে সুনিশ্চিত নয় বরং কাছাকাছি একটা ফলাফল তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা।				
চেনা পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ করে আকৃতির ধারণা ইত্যাদি অন্বেষণ করতে পারা।	চেনা পরিবেশে বিভিন্ন আকৃতির প্যাটার্ন খুঁজে বের করতে পারা	চেনা পরিবেশে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি খুঁজে বের করতে পারা	জ্যামিতিক আকৃতিগুলোর গঠন ও বৈশিষ্ট্য তুলনা করা এবং প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশে এদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারা	অনুশীলনের মাধ্যমে একই দ্বিমাত্রিক জ্যামিতিক আকৃতির বিভিন্ন রকমের গঠন করতে পারা	অনুশীলনের মাধ্যমে দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিক আকৃতিসমূহের বিভিন্ন রকমের গঠন করতে পারা এবং এদের বৈশিষ্ট্য ও শর্তসমূহ নির্ণয় করতে পারা	দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিক আকৃতিসমূহের বৈশিষ্ট্য ও শর্তসমূহ নির্ণয় করতে পারা ও নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতিসমূহ পরিমাপ করতে পারা	জ্যামিতিক আকার আকৃতিগুলোর রৈখিক ও ক্ষেত্রভিত্তিক (সমান্তরাল, সর্বসমতা, সদৃশতা ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য গাণিতিক যুক্তিসহ উপস্থাপন করতে পারা ও এই সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা	জ্যামিতিক আকৃতিকে যে রাশির গাণিতিক সম্পর্কের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় তা উপলব্ধি করে অনিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতিগুলোকে পরিমাপ করতে পারা	জটিল বীজগাণিতিক, ত্রিকোণমিতিক ও স্থানাঙ্ক জ্যামিতির আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করে এই সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা	
পরিচিত পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু	চেনা জগত সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে	সংখ্যা ও প্রতীকের ব্যবহারের মাধ্যমে গাণিতিক সম্পর্ক	সংখ্যা, রাশি, প্রতীক ইত্যাদি ব্যবহার করে বাস্তব সমস্যাকে গাণিতিক সম্পর্ক আকারে প্রকাশ করতে পারা ও		বাস্তব ঘটনার বাইরেও বিমূর্ত গাণিতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যায়	গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রতীকের ব্যবহার অনুধাবন করা ও গাণিতিক যুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে গণিতের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারা		বাস্তব ও জটিল সংখ্যা, রাশি ও প্রতীক ব্যবহার করে গাণিতিক সম্পর্ক প্রকাশ করা ও বাস্তব ও বিমূর্ত ঘটনাবলির প্যাটার্ন উদঘাটনে আগ্রহী হওয়া		গাণিতিক যুক্তির অনুশীলনের মাধ্যমে যৌক্তিক চিন্তাধারা ধারণ করা এবং গাণিতিক

প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি	৯ম শ্রেণি	১০ম শ্রেণি
পর্যবেক্ষণ করে সংখ্যার ধারণা অন্বেষণ করতে পারা	পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংখ্যার ধারণা উপলব্ধি করতে পারা	প্রকাশ করা যায় তা উপলব্ধি করতে পারা	গাণিতিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হওয়া		সংখ্যা, রাশি, চলকের ব্যবহার উপলব্ধি করতে পারা					অনুসন্ধানে বাস্তব ও জটিল সংখ্যা, রাশি ও প্রতীক ব্যবহারে পারঙ্গম হওয়া
	বাস্তব পরিবেশের বস্তু ও ঘটনাবলিকে সংখ্যা ও রাশি দিয়ে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া		দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহার করতে উদ্যোগী হওয়া	বাস্তব জীবনের গাণিতিক সমস্যা বিষয়ক আলোচনায় যথোপযুক্ত গাণিতিক ভাষা ও শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে অংশগ্রহণ করতে পারা		বাস্তব সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ভাষা, চিত্র, ডায়াগ্রাম ও শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করতে পারা	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে গণিতের প্রয়োগকে উপলব্ধি করতে পারা	গাণিতিক যুক্তি ও দক্ষতা ব্যবহার করে কোন ঘটনা, প্রপঞ্চ বা আলোচনাকে বিচার বিশ্লেষণ করে মতামত দিতে পারা	গণিত যে প্যাটার্ন ও শৃঙ্খলার বিজ্ঞান তা উপলব্ধি করা ও চারপাশের জগতকে বোঝার জন্য গাণিতিক দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহারে আগ্রহী হওয়া	বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে গণিতের প্রয়োগ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারা ও সমাজে গাণিতিক সাক্ষরতার প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারা
	চেনা পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে একই ধরণের ঘটনা বা বস্তুকে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারা	গাণিতিক সমস্যা সমাধানে চেনা পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা ও তাদের অর্থোদ্ধার করে প্রাপ্ত সমাধানের বস্তুনিষ্ঠ ও সৃজনশীল উপস্থাপন করতে পারা		চেনা পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও উপস্থাপনের একাধিক সম্ভাব্য উপায় অন্বেষণ করতে পারা	গাণিতিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য যে বিভিন্ন সম্ভাবনা নির্দেশ করে তা উপলব্ধি করতে পারা	গাণিতিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফলের যে একাধিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে তা হৃদয়ঙ্গম করা ও সেগুলোর সম্ভাবনা যাচাই করতে পারা		গাণিতিক অনুসন্ধানে তথ্যের উৎসের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা এবং তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ ও উপস্থাপনের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে পারা		গাণিতিক অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের পর পুরো কার্যধারা ও ফলাফল নিরীক্ষণ করে সেই উপলব্ধি থেকে পরবর্তী অনুসন্ধানে আলোকপাত করতে পারা
			গাণিতিক সূত্র বা নীতি কীভাবে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে তা উপলব্ধি করতে পারা	গাণিতিক সূত্র বা নীতি কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তা উপলব্ধি করে তার সাহায্যে বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারা		গাণিতিক সূত্র বা নীতিকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা ও তা ব্যবহার করে বাস্তব ও বিমূর্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা		বাস্তব বা বিমূর্ত গাণিতিক সমস্যা সমাধানে গাণিতিক সূত্র বা নীতির উপযোগিতা যাচাই করতে পারা		গাণিতিক অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনে পদ্ধতি পরিমার্জন করে নতুন গাণিতিক সম্পর্ক প্রস্তাব করতে পারা

Working Draft

বিষয় : বিজ্ঞান

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

প্রকৃতি ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে এর রহস্য উদঘাটন করা ও এর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য উপলব্ধি করা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়ন করা এবং জাতীয় ও বৈশ্বিক কল্যাণে ইতিবাচক অবদান রাখা।

বিষয়ের ধারণায়ণ

বিজ্ঞান সমাজ বা প্রকৃতির বাইরে কোন পৃথক বিষয় নয়, বরং প্রকৃতির ঘটনাবলিকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে বুঝতে চেষ্টা করা বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। কাজেই এই রূপরেখায় বিজ্ঞান শিক্ষাকে শুধু তত্ত্ব ও তথ্য এবং পরীক্ষাগারে নির্ধারিত কিছু পরীক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি বরং বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা অর্জনের উপর জোর দেয়া হয়েছে – যা শিক্ষার্থীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনাচরণের অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

শিক্ষাক্রমের বিষয় হিসেবে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব এবং সংশ্লিষ্ট শিখন-ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনায় নিম্নলিখিতভাবে এর ধারণায়ন করা হয়েছে-

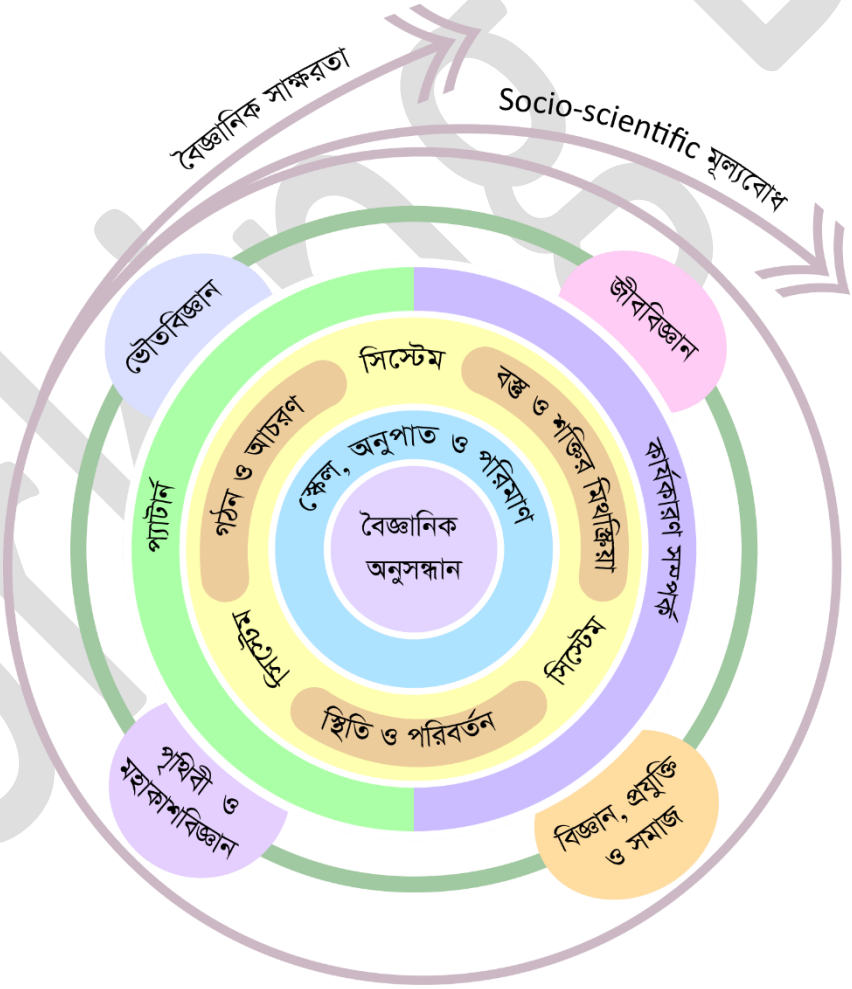

Working Draft

বিজ্ঞান অনুসন্ধানমূলক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা চালায়। এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য স্কেল, অনুপাত ও পরিমাণের ধারণার প্রয়োজন পড়ে। নির্দিষ্ট কোন সিস্টেমে ঘটে চলা ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করার জন্য ওই সিস্টেমকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়, বিবেচনায় নিতে হয় সিস্টেম ও এর উপাদানসমূহের গঠন ও আচরণ, তাদের স্থিতি ও পরিবর্তন, এবং সিস্টেমের ভেতরে চলতে থাকা বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত প্রমাণনির্ভর তথ্যের ভিত্তিতে এসব ঘটনার প্যাটার্ন ও কার্যকারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়। অনুসন্ধানে প্রাপ্ত জ্ঞান বারবার পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর একটা সময় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। সময়ের সঙ্গে উদঘাটিত বৈজ্ঞানিক তথ্য, তত্ত্বের সমন্বয়ে বয়ে চলা বিজ্ঞানের মূল স্রোত থেকে ক্রমান্বয়ে তিনটি বিশেষায়িত ক্ষেত্র উন্মোচিত হয় : *ভৌতবিজ্ঞান*, *জীববিজ্ঞান* এবং *পৃথিবী ও মহাকাশবিজ্ঞান*। এই তিনটি বিশেষায়িত ক্ষেত্রের বাইরেও আরেকটি আলোচনার ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তা হল *বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সমাজ*।

বিজ্ঞানের তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত করে নয়, বরং অনুসন্ধানমূলক শিখনের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের দর্শন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ইত্যাদির উপর সম্যক ধারণা নিয়ে শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনাচরণে অভ্যস্ত করে তোলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এর ফলে ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা গড়ে উঠবে। একই সঙ্গে তারা দৈনন্দিন জীবনে বৈজ্ঞানিক দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারবে ও Socio-scientific মূল্যবোধ ধারণ করে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক ক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল আচরণ করবে।

বিজ্ঞান বিষয়ের ধারণায়নে উঠে আসা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিতভাবে নিচে আলোকপাত করা হল।

- **বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান :** প্রতিটি ব্যক্তি জন্মগতভাবে অনসুন্ধানী মন নিয়ে জন্ম নেয়। সমাজ এবং প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু এবং ঘটনা তাঁর কৌতূহলী মনকে আরো বেশি নাড়া দেয়। সে জানতে চায় এর কারণ কী? এর পেছনের ঘটনা কী? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যে পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয় তা হল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হল কিছু কৌশলের সমন্বয়ে একটি সুসংহত পদ্ধতি, যার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণযোগ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়। এ পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হলে শিক্ষার্থীকে একটি যৌক্তিক, নিয়মতান্ত্রিক ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় যা তাঁকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলে। সঠিকভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পরিচালনার জন্য কিছু বৈজ্ঞানিক দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা প্রয়োজন :
    - **বৈজ্ঞানিক দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি :** বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয় একটি কৌতূহলী মনের যা প্রতিটি শিশুর মধ্যে বিদ্যমান। পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতি আয়ত্ত করার জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে কিছু প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা থাকা অত্যাবশ্যক, যা তাঁর অনুসন্ধান প্রক্রিয়াকে আরো বেশি শাণিত করে। আর এ দক্ষতাগুলোকেই বৈজ্ঞানিক দক্ষতা হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যেহেতু বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ শুধুমাত্র প্রমাণের ভিত্তিতেই গৃহীত হতে হয়, কাজেই নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার মত কিছু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করাও সঠিকভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পরিচালনার পূর্বশর্ত।

Working Draft

- **স্কেল, অনুপাত ও পরিমাণ :** যেকেনো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পরিকল্পনা নির্ধারণ করতে মাইক্রো বা ম্যাক্রো স্কেলের শর্তাবলি বিবেচনা করা জরুরি, কারণ অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় কী কী বিষয় প্রাসঙ্গিক তা অনেক সময় এই শর্তাবলির সাপেক্ষে ভিন্ন হতে পারে। অন্য দিকে, এই অনুসন্ধান পরিচালনা করতে বিভিন্ন পরিমাণ সম্পর্কে জ্ঞান, তাদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং বিভিন্ন ধরনের পরিমাণ পরিমাপ করার দক্ষতা প্রয়োজন পড়ে। আবার এই স্কেল, অনুপাত ও পরিমাণের ভিন্নতা প্রকৃতির বস্তু বা ঘটনার উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে তাও বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়। তাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য এবং বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও ধারণাসমূহ অনুধাবন করার জন্য স্কেল, অনুপাত ও পরিমাণের ধারণা থাকা প্রয়োজন।

- **সিস্টেম :** শিক্ষার্থী তাঁর অনুসন্ধানী চোখে দেখতে পায় তাঁর চারপাশ থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাকার অণু পরমাণু এবং বৃহদাকার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবকিছুই এক একটি সিস্টেম, প্রতিটি বৃহৎ সিস্টেম আবার অসংখ্য সাবসিস্টেমের সমষ্টি। যেকোনো সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ সজীব এবং অজীব বস্তুসমূহের গঠন ও আচরণ, এর মধ্যকার বস্তু ও শক্তির মিথষ্ক্রিয়া, সিস্টেম ও এর উপাদানসমূহের স্থিতি ও পরিবর্তন ইত্যাদির প্যাটার্ন ও কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করাই বিজ্ঞানের কাজ।
    - **গঠন ও আচরণ :** প্রকৃতির সজীব ও অজীব বস্তুসমূহের গঠন বিশ্লেষণ, এবং তার ভিত্তিতে তাদের আচরণ ও কার্যাবলি পর্যালোচনা।
    - **বস্তু ও শক্তির মিথষ্ক্রিয়া :** কোন সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ বস্তু ও শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং তা কীভাবে সিস্টেমকে প্রভাবিত করে তার অনুসন্ধান।
    - **স্থিতি ও পরিবর্তন :** প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সিস্টেমের স্থিতাবস্থায় থাকার শর্তাবলি এবং এর বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন বা বিবর্তনের অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ।

- **প্যাটার্ন :** প্যাটার্ন হচ্ছে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কোন প্রাকৃতিক ঘটনার বার বার পুনরাবৃত্তি। প্রকৃতির বস্তু ও ঘটনাবলির প্যাটার্ন তাদের ধরন অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ করতে সাহায্য করে। নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুসন্ধানের মাধ্যমে এসব ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্ক উদঘাটন করা যায়।

- **কার্যকারণ সম্পর্ক :** যেকোনো প্রাকৃতিক ঘটনার পেছনের কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রকৃতিতে কোন ঘটনা কেন ঘটে, কী ধরনের মিথষ্ক্রিয়া এর পেছনে কাজ করে তার পরীক্ষালব্ধ ব্যাখ্যা বিশ্বপ্রকৃতি কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে সাহায্য করে।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ঘটনাবলি ব্যখ্যা করতে গিয়ে ক্রমান্বয়ে তিনটি বিশেষায়িত ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়। এর মধ্যে –

- **ভৌত বিজ্ঞান** হলো বস্তু ও বস্তু কণার গঠন আচরণ, মিথষ্ক্রিয়া, স্থিতি ও পরিবর্তন সম্পর্কিত;
- **জীববিজ্ঞান** হলো সজীব উপাদানের গঠন আচরণ, মিথষ্ক্রিয়া, স্থিতি ও পরিবর্তন সম্পর্কিত; এবং
- **পৃথিবী ও মহাকাশবিজ্ঞান** হলো পৃথিবী থেকে শুরু করে সমগ্র মহাবিশ্বের গঠন এবং প্রকৃতি সম্পর্কিত।

Working Draft

- এই তিনটি বিশেষায়িত ক্ষেত্র ছাড়াও আরেকটি আলোচনার ক্ষেত্র হল **বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, এবং সমাজ (Science, Technology & Society,** সংক্ষেপে **STS)**। প্রাত্যহিক জীবনে এবং মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় বিজ্ঞানের নানাবিধ প্রয়োগ, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রভাব – এসবই এখানে মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার ক্ষেত্রগুলো ঘিরে বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষাক্রম আবর্তিত হবে। অনুসন্ধানমূলক শিখনের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা গড়ে তোলা এই শিক্ষাক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের Socio-scientific মূল্যবোধ গড়ে তোলা।

- **বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা :** একটি বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতাসম্পন্ন সমাজ গড়ে তোলা বিজ্ঞান শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই শিক্ষাক্রমে তাই অনুসন্ধানমূলক শিখনের উপর জোর দেয়া হয়েছে, যাতে বিজ্ঞান শিক্ষা শুধু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা, প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে। ফলাফলস্বরূপ, শিক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরি হবে এবং প্রাত্যহিক জীবনে, কিংবা যেকেনো সমস্যা সমাধানে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার প্রভাব পড়বে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে এই চর্চা শিক্ষার্থীর মাঝে ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়। বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতার একটি অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হিসেবে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে শিক্ষার্থীর মেটাকগনিটিভ দক্ষতাসমূহকে।
    - **মেটাকগনিশন :** মেটাকগনিশনকে সহজ ভাষায় বলা চলে Learning to learn; কী শিখবে, কীভাবে শিখবে, কীভাবে মূল্যায়িত হবে, অর্থাৎ সমগ্র শিখন প্রক্রিয়া শিক্ষার্থী পূর্ণ সচেতনভাবে নিজেই ব্যবস্থাপনা করবে এবং প্রতিফলনমূলক শিখনের দক্ষতা অর্জন করবে। অনুসন্ধানমূলক বিজ্ঞান শিখন শিক্ষার্থীর মধ্যে মেটাকগনিটিভ দক্ষতাসমূহ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। মেটাকগনিটিভ শিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী জীবনব্যাপী শিখনের জন্য যোগ্য হয়ে ওঠে এবং বৈজ্ঞানিক দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে নিজের পরবর্তী শিখনের দায়িত্ব নেবার উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠে।

- **Socio-scientific মূল্যবোধ :** এই শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার কথা বার বার ব্যক্ত হয়েছে। বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় শুধু বিজ্ঞান বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনায় নয়, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। সেজন্য এই ফ্রেমওয়ার্কে Socio-scientific মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষায় বিজ্ঞানমনস্কতার চর্চার পাশাপাশি শিক্ষার্থীর মধ্যে ক্রস-ডিসিপ্লিনারি মূল্যবোধগুলো গড়ে তোলাও জরুরি। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিক্ষার্থী যাতে করে তার আশেপাশের পরিবেশ এবং তার উপর মানুষের কর্মকাণ্ডের প্রভাবকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করে এবং স্থানীয় ও বৈশ্বিক বিভিন্ন সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানের চেষ্টা করে। বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ ধারণ করার মাধ্যমে তারা বিজ্ঞানের দর্শনকে নিজের সংস্কৃতিতে আত্তীকৃত করতে পারবে, পাশাপাশি প্রকৃতি, পরিবেশ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য সম্পর্কে কৌতূহলী হবে, বৈচিত্র্যকে সম্মান করবে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক সকল ইস্যুর বিশ্লেষণে বিজ্ঞানমনস্কতার

Working Draft

পরিচয় দেবে; বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করবে এবং নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উপলব্ধি করতে পারবে।

নিচের শিখনক্রমের শুরুতে শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী এবং তার নিচে শিখন যোগ্যতাসমূহ বিবৃত হয়েছে। শিখনক্রমের অনেক ক্ষেত্রে একই শিখন যোগ্যতা একাধিক শ্রেণিতে বিবৃত হয়েছে। এসকল ক্ষেত্রে শিখন অভিজ্ঞতার ধরন এবং বিষয়বস্তুর গভীরতা ও কাঠিন্য ব্যবহার করে শ্রেণিভিত্তিক বিস্তৃতি নির্ধারণ করতে হবে।

Working Draft

বিষয় : বিজ্ঞান

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখনক্রম

<table>
<tr><th>প্রাক-প্রাথমিক</th><th>১ম শ্রেণি</th><th>২য় শ্রেণি</th><th>৩য় শ্রেণি</th><th>৪র্থ শ্রেণি</th><th>৫ম শ্রেণি</th><th>৬ষ্ঠ শ্রেণি</th><th>৭ম শ্রেণি</th><th>৮ম শ্রেণি</th><th>৯ম শ্রেণি</th><th>১০ম শ্রেণি</th></tr>
<tr><td>চার পাশের পরিবেশ সম্পর্কে কৌতূহলী হওয়া।</td><td>চার পাশের পরিবেশ সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে পরিবেশের স্থির এবং পরিবর্তনশীল বস্তু/কাঠামোর বৈচিত্র্য উপলব্ধি করে প্রকৃতিকে ভালবাসা ও সব কিছুর প্রতি যত্নশীল হওয়া, পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের পরিমাণের মধ্যে তুলনা করতে পারা।</td><td>চেনা পরিবেশ সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে আশেপাশের বস্তু বা কাঠামোর বাহ্যিক গঠন, আচরণ ও পরিবর্তনের গতি; এবং বস্তু ও শক্তির বিভিন্ন রূপ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে পক্ষপাতহীন উত্তর খোঁজা এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে নিজের অবস্থান উপলব্ধি করা।</td><td>পৃথিবী ও তার পরিপার্শ্ব সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠা, প্রকৃতির বিচিত্র সজীব ও অজীব বস্তুসমূহের আন্তঃসম্পর্ক, তাদের বাহ্যিক গঠন ও আচরণের সম্পর্ক, বস্তুর অবস্থার পরিবর্তনে শক্তির প্রভাব, এবং সিস্টেমের কোন উপাদানের পরিবর্তনের ফলে অন্য উপাদানসমূহ কীভাবে প্রভাবিত হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা; এবং পূর্বধারণার সঙ্গে নতুন পাওয়া জ্ঞানের যৌক্তিক সমন্বয় করে নিজের জীবনের মান উন্নয়ন করতে পারা।</td><td>পৃথিবী ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠা; প্রকৃতির বিচিত্র সজীব ও অজীব বস্তুসমূহের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, তাদের বাহ্যিক গঠন ও আচরণের সম্পর্ক, শক্তির প্রভাবে তাদের অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন ও পরিবর্তনের চক্র, এবং এসব পরিবর্তনের ফলে গোটা সিস্টেম কীভাবে প্রভাবিত হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা; এবং পূর্বধারণার সঙ্গে নতুন পাওয়া জ্ঞানের যৌক্তিক সমন্বয় করে বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা।</td><td>পৃথিবী ও মহাবিশ্বের রহস্য উদঘাটনে আগ্রহী হয়ে ওঠা; বস্তুর গঠন ও আচরণের মধ্যকার সাদৃশ্য ও সম্পর্ক, শক্তির প্রভাবে তাদের অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন এবং পরিবর্তনের চক্র, ও এসব পরিবর্তনের ফলে গোটা সিস্টেম কীভাবে প্রভাবিত হয় তা অনুসন্ধান করে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো; জীবজগতের বৈচিত্র্য, শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য অন্বেষণ করতে পারা; এবং বাস্তব জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হওয়া</td><td>পৃথিবী ও মহাবিশ্বের রহস্য উদঘাটনে আগ্রহী হয়ে ওঠা; বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে বস্তুর গঠনের শৃঙ্খলা ও এর কাঠামো-উপকাঠামোর সঙ্গে আচরণের সম্পর্ক, শক্তির স্থানান্তর, ও সিস্টেমের আপাত স্থিতাবস্থা অনুসন্ধান করে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো; এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সচেষ্ট হয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হওয়া</td><td>বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে একাধিক পরিকল্পনা যাচাই বাছাই করতে পারা এবং পরীক্ষণের ফলাফলে প্রাপ্ত আসন্ন মান সম্পর্কে সচেতন হওয়া; বস্তুসমূহে দৃশ্যমান আপাত স্থিতাবস্থা, শক্তির রূপান্তর, ও প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সিস্টেমের আপাত স্থিতাবস্থা অনুসন্ধান করতে পারা; পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি, জীববৈচিত্র্যের কারণ অন্বেষণ করতে পারা; এবং পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা</td><td>বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে একাধিক পরিকল্পনা বিবেচনা ও প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক সম্ভাব্য ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করতে পারা; সিস্টেমের ভেতরে বা বাইরে থেকে শক্তির স্থানান্তর ও রূপান্তর পর্যবেক্ষণ করে এর উপাদানসমূহের গঠন, আচরণ, পরিবর্তন ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট আপাত স্থিতাবস্থা বা পরিবর্তন অনুসন্ধান ও পূর্বানুমান করতে পারা; মহাবিশ্ব, পৃথিবী এবং তার জীবজগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন অন্বেষণ করতে পারা; এবং প্রকৃতির অংশ হিসেবে মানুষের ভূমিকা মূল্যায়ন করে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা</td><td>বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর স্কেলে মহাবিশ্বের বস্তুসমূহের গঠনের প্যাটার্ন ও শৃঙ্খলা উদঘাটন করতে পারা; শক্তির নিত্যতা অনুধাবন করে অতি ক্ষুদ্র বা অতি বৃহৎ, অতি দ্রুত বা অতি মন্থর স্কেলে সিস্টেমের আপাত স্থিতাবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে তা উপলব্ধি করতে পারা; সভ্যতার ক্রমবিকাশে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের অবদান অনুধাবন করতে পারা এবং নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির অংশ হিসেবে উপলব্ধি করে জাতীয় ও বৈশ্বিক কল্যাণে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারা।</td><td>বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট সিস্টেমের উপাদানসমূহের গঠন, আচরণ এবং মিথস্ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত স্থিতাবস্থা অথবা পরিবর্তনের প্যাটার্ন উদঘাটন করতে পারা, বস্তু ও শক্তির পারস্পরিক রূপান্তর অন্বেষণ করে অতি ক্ষুদ্র বা অতি বৃহৎ, অতি দ্রুত বা অতি মন্থর স্কেলে সিস্টেমের আপাত স্থিতাবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে তা উপলব্ধি করতে পারা; সভ্যতার ক্রমবিকাশে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের অবদান অনুধাবন করতে পারা এবং নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির অংশ হিসেবে উপলব্ধি করে জাতীয় ও বৈশ্বিক কল্যাণে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারা।</td></tr>
<tr><td>চার পাশের পরিবেশ সম্পর্কে কৌতূহলী হওয়া।</td><td>চার পাশের পরিবেশ সম্পর্কে কৌতূহলী হওয়া ও চারপাশের বৈচিত্র্য উপলব্ধি করতে পারা</td><td>চেনা প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ঘটনাবলি সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে তার পক্ষপাতহীন উত্তর খোঁজা</td><td colspan="2">প্রাকৃতিক ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করে পূর্বজ্ঞান/ধারণার সঙ্গে প্রাপ্ত নতুন জ্ঞানের যৌক্তিক সমন্বয় করতে পারা</td><td colspan="2">বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণ-ভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যে প্রমাণের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে তা গ্রহণ করতে পারা</td><td>বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য একাধিক সম্ভাব্য পরিকল্পনা থেকে নিরপেক্ষভাবে পরিকল্পনা বাছাই করে সে অনুযায়ী অনুসন্ধান পরিচালনা করতে পারা</td><td>বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য একাধিক সম্ভাব্য পরিকল্পনা থেকে নিরপেক্ষভাবে পরিকল্পনা বাছাই করে সে অনুযায়ী অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক সম্ভাব্য ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করতে পারা</td><td colspan="2">বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কীভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় তার ধারণা আয়ত্ত করে সভ্যতার ক্রমবিকাশে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের অবদান অনুধাবন করতে পারা</td></tr>
<tr><td></td><td>বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পরিমাণের মধ্যে তুলনা করতে পারা</td><td>বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে প্রচলিত একক ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের সরল পরিমাপ করতে আগ্রহী হওয়া</td><td>বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে প্রচলিত ও প্রমিত এককসমূহ ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের পরিমাণের পরিমাপ করে এদের ফলাফলের তুলনা করতে পারা</td><td>বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিমাপ করতে পারা</td><td>বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের প্রয়োজনে বস্তুনিষ্ঠভাবে যৌগিক পরিমাপের হিসাব করতে পারা</td><td>বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে ফলাফলের চেয়ে পরিমাপের পদ্ধতির বস্তুনিষ্ঠতার উপর গুরুত্ব প্রদান করা</td><td>বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিমাপ করে ফলাফল নিরূপণ করতে পারে এবং এই পরীক্ষণের ফলাফল যে সবসময় শতভাগ নির্ভুল নয় বরং কাছাকাছি একটা ফলাফল হতে পারে তা উপলব্ধি করতে পারা</td><td>গাণিতিক সম্পর্কের মাধ্যমে উপস্থাপিত বৈজ্ঞানিক ধারণাকে অনুধাবন করতে পারা এবং গাণিতিক দক্ষতা ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান করতে পারা।
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের জন্য যে আপাত বিচ্ছিন্ন সিস্টেম বিবেচনা করা হয় তা অন্য কোন বৃহৎ সিস্টেমের অংশ এবং তাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে পরীক্ষণের ফলাফল প্রভাবিত হয় তা উপলব্ধি করা।</td><td>জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব/সমস্যাকে গাণিতিক সম্পর্ক আকারে প্রকাশ করতে পারা এবং সমস্যা সমাধান করতে পারা।</td><td>জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব/সমস্যাকে গাণিতিক সম্পর্ক আকারে প্রকাশ করতে পারা এবং সমস্যা সমাধান করতে পারা।
বিজ্ঞানচর্চা ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের ক্রমবিকাশে গাণিতিক দক্ষতার গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং গণিতকে বিজ্ঞানের ভাষা হিসেবে উপলব্ধি করতে পারা।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে চারপাশের বিভিন্ন সজীব ও অজীব বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে পারা।</td><td colspan="2">চারপাশের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পরিবেশের বিভিন্ন সজীব ও অজীব বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও তাদের আচরণ/বৈশিষ্ট্যর মধ্যকার সম্পর্ক অনুসন্ধান করতে পারা।</td><td>পরিবেশের বিভিন্ন সজীব ও অজীব বস্তু পর্যবেক্ষণ করে তাদের মধ্যকার দৃশ্যমান গঠন ও আচরণের সাদৃশ্য অন্বেষণ করতে পারা</td><td>বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে পরিবেশের বিভিন্ন সজীব ও অজীব বস্তুর দৃশ্যমান গঠন ও তাদের মধ্যকার শৃঙ্খলা (order) উপলব্ধি করতে পারা</td><td colspan="2">ক্ষুদ্রতর স্কেলে দৃশ্যমান জগতের বিভিন্ন বস্তুর গঠন পর্যবেক্ষণ করে এদের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা (order) অনুসন্ধান করতে পারা</td><td colspan="2">মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর সজীব ও অজীব বস্তুর গঠনের প্যাটার্ন অন্বেষণ করতে পারা</td></tr>
</table>

Working

প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি	৯ম শ্রেণি	১০ম শ্রেণি
					দৃশ্যমান পরিবেশের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বস্তুসমূহের গঠনের কাঠামো-উপকাঠামো ও তাদের আচরণ/বৈশিষ্ট্যর মধ্যকার সম্পর্ক অনুসন্ধান করতে পারা।		সজীব ও অজীব বস্তুসমূহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন-কাঠামোর সঙ্গে এদের আচরণ/বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক এবং এর ফলে দৃশ্যমান আপাত স্থিতাবস্থা অনুসন্ধান করতে পারা।	ক্ষুদ্রতর স্কেলে সজীব ও অজীব বস্তুসমূহের গঠন-কাঠামো উদঘাটন করা এবং তা কীভাবে সেসব বস্তুর দৃশ্যমান আচরণ/বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করতে পারা।		বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোন নির্দিষ্ট সিস্টেমের সজীব ও অজীব উপাদানসমূহের গঠন-কাঠামো, আচরণ/বৈশিষ্ট্য এবং তাদের মধ্যকার চলমান মিথস্ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত স্থিতাবস্থা অথবা পরিবর্তনের প্যাটার্ন অনুসন্ধান করতে পারা।
		ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বস্তু ও শক্তির বিভিন্নরূপ পর্যবেক্ষণ করতে পারা	বস্তুর অবস্থার পরিবর্তনে শক্তির প্রভাব অনুসন্ধান করতে পারা	শক্তির প্রভাবে নির্দিষ্ট সিস্টেমের ভেতরে বস্তুর অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন এবং ক্ষেত্রবিশেষে এই পরিবর্তনের চক্র অনুসন্ধান করতে পারা		প্রকৃতিতে বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে বস্তুর মত শক্তিও যে পরিমাপযোগ্য তা উপলব্ধি করা এবং শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করতে পারা	প্রকৃতিতে বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে শক্তির বিভিন্ন রূপ ও এদের রূপান্তর অন্বেষণ করতে পারা	নির্দিষ্ট সিস্টেমের ভেতরে বা বাইরে থেকে শক্তির স্থানান্তর ও রূপান্তর পর্যবেক্ষণ করে সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের সম্ভাবনা পূর্বানুমান করতে পারা	নির্দিষ্ট সিস্টেমের ভেতরে শক্তির স্থানান্তর ও রূপান্তর পর্যবেক্ষণ করে শক্তির নিত্যতা অন্বেষণ করা	বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বস্তু ও শক্তির পারস্পরিক রূপান্তর উপলব্ধি করতে পারা
	চার পাশের পরিবেশে স্থির এবং পরিবর্তনশীল বস্তু/কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য করতে পারা	চার পাশের পরিবেশে পরিবর্তনশীল বস্তু বা কাঠামোর মধ্যে মন্থর ও দ্রুত পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে পারা	নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সিস্টেমের কোন উপাদানের মন্থর বা দ্রুত পরিবর্তন কীভাবে সিস্টেমের অন্যান্য উপাদানকে প্রভাবিত করে তা পর্যবেক্ষণ করা	পর্যবেক্ষণযোগ্য প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সিস্টেমের উপাদানসমূহের মন্থর অথবা দ্রুত পরিবর্তনের ফলে সময়ের সঙ্গে সিস্টেমের স্থিতি বা পরিবর্তন কীভাবে প্রভাবিত হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা		প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সিস্টেমের উপাদানসমূহের নিয়ত পরিবর্তন ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে যে আপাত স্থিতাবস্থা সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা		ম্যাক্রো ও মাইক্রো স্কেলে সিস্টেমের উপাদানসমূহের নিয়ত পরিবর্তন ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে যে দৃশ্যমান স্থিতাবস্থা সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা	অতি ক্ষুদ্র বা অতি বৃহৎ, অতি দ্রুত বা অতি মন্থর স্কেলে সিস্টেমের আপাত স্থিতাবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে তা উপলব্ধি করতে পারা	
পৃথিবী ও তার পরিপার্শ্ব সম্পর্কে কৌতূহলী হওয়া		পৃথিবী ও তার পরিপার্শ্ব পর্যবেক্ষণ করে মহাকাশের দৃশ্যমান বস্তুসমূহের বৈশিষ্ট্য উদঘাটন করতে পারা		পৃথিবী ও এর পরিপার্শ্বের উপর মহাবিশ্বের বিভিন্ন উপাদানসমূহের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করতে পারা	পৃথিবী ও মহাবিশ্বের অন্যান্য বস্তুসমূহের মধ্যকার শৃঙ্খলা উপলব্ধি করতে পারা	পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি অনুধাবন করতে পারা		পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন উপলব্ধি করতে পারা	মহাবিশ্বের বস্তুসমূহের মধ্যকার অন্তর্নিহিত প্যাটার্ন ও সুশৃঙ্খলতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা	
		প্রকৃতির সজীব ও অজীব বস্তুসমূহ পর্যবেক্ষণ করে নিজের অবস্থান অন্বেষণ করতে পারা	পরিবেশের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে কৌতূহলী হওয়া	চেনা প্রকৃতিতে বিভিন্ন জীবের মধ্যকার ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করতে পারা	চারপাশের প্রকৃতিতে জীববৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করতে পারা	চারপাশের প্রকৃতিতে জীববৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করে একই ধরনের জীবের মধ্যে ভিন্নতা অন্বেষণ করতে পারা	প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের জীবের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য এবং একই ধরনের জীবের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার জৈবিক ও পরিবেশগত কারণ অনুসন্ধান করতে পারা	জীবজগতের উৎপত্তি ও সময়ের সঙ্গে ক্রমবিবর্তন অনুসন্ধান করতে পারা	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্যের প্যাটার্ন উদঘাটন করতে পারা	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে জীবনের রহস্য উদঘাটন করতে পারা
	প্রকৃতিকে ভালবেসে সবকিছুর প্রতি যত্নশীল হওয়া		বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রকৃতির সজীব ও অজীব বস্তুসমূহের আন্তঃসম্পর্ক অন্বেষণ করতে পারা	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রকৃতির বিভিন্ন সজীব ও অজীব বস্তুসমূহের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা	ছোট থেকে বড় পর্যায়ে জীবজগতের শৃঙ্খলা এবং এর ফলে বিদ্যমান প্রাকৃতিক ভারসাম্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উদঘাটন করতে পারা	প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ঝুঁকিসমূহ অনুসন্ধান করে সেই ঝুঁকি মোকাবেলায় সচেষ্ট হওয়া।	বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় করণীয় নির্ধারণ করতে পারা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হওয়া।	প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় প্রকৃতির অংশ হিসেবে মানুষের ভূমিকা মূল্যায়ন করে পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা	নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উপলব্ধি করে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা	
			অর্জিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি কাজে লাগিয়ে নিজের জীবনের মান উন্নয়ন করতে পারা	বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা	বাস্তব জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হওয়া		বাস্তব জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা		বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে জাতীয় ও বৈশ্বিক কল্যাণে ইতিবাচক অবদান রাখা।	

Working Draft

বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

জীবনের সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ, নিরাপদ, নৈতিক, সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল ব্যবহার করতে পারা এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি সক্ষমতা অর্জন করে প্রত্যাশিত ভবিষ্যত গড়ে তোলার লক্ষ্যে তৈরি হওয়া।

বিষয়ের ধারণায়ন

ডিজিটাল প্রযুক্তি শিক্ষা বিষয়ের ধারণায়নের সময় এই বিষয়ের ব্যাপ্তি তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। বরং বিষয়ের ধারণায়ন এমনভাবে করা হয়েছে যে, শিক্ষার্থী শুধু তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারকারীই হবে না বরং সে ডিজিটাল সাক্ষরতা অর্জন করবে, ও তার সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে নিজের এবং পারিপার্শ্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য নিজস্ব ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন করতে পারবে। এর ফলে আইসিটি সক্ষমতার পাশাপাশি তার মাঝে ডিজিটাল প্রযুক্তির সক্ষমতাও তৈরি হবে যা তাকে দক্ষ ডিজিটাল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে।

প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাক্রম রূপরেখায় ডিজিটাল প্রযুক্তি *শিক্ষা* বিষয়টির ধারণায়নের কেন্দ্রে রাখা হয়েছে ডিজিটাল সাক্ষরতা, তথ্য সাক্ষরতা যার মূল অনুষঙ্গ। ডিজিটাল সাক্ষরতা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা সুসংবদ্ধ চিন্তন দক্ষতা অর্জন করবে যার সাহায্যে তারা নিজস্ব ডিজিটাল সলিউশন সৃষ্টি করতে পারবে। এক্ষেত্রে যে চিন্তনদক্ষতাসমূহকে এই ধারণায়নে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সেগুলো হল : কম্পিউটেশনাল চিন্তন, ডিজাইন চিন্তন ও সিস্টেম চিন্তন। একইসঙ্গে শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধান, যোগাযোগ ও সহযোগিতা, সৃজনশীল উদ্ভাবনের যোগ্যতা অর্জন করবে যা তার আইসিটি সক্ষমতা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

দক্ষ ডিজিটাল নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে আরো যে দুটি বিষয়ে ধারণা অর্জন করতে হবে তা হল : আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার, এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রেক্ষাপট। আইসিটি সক্ষমতা ও ডিজিটাল প্রযুক্তি সক্ষমতা দুইক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীকে এই বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে।

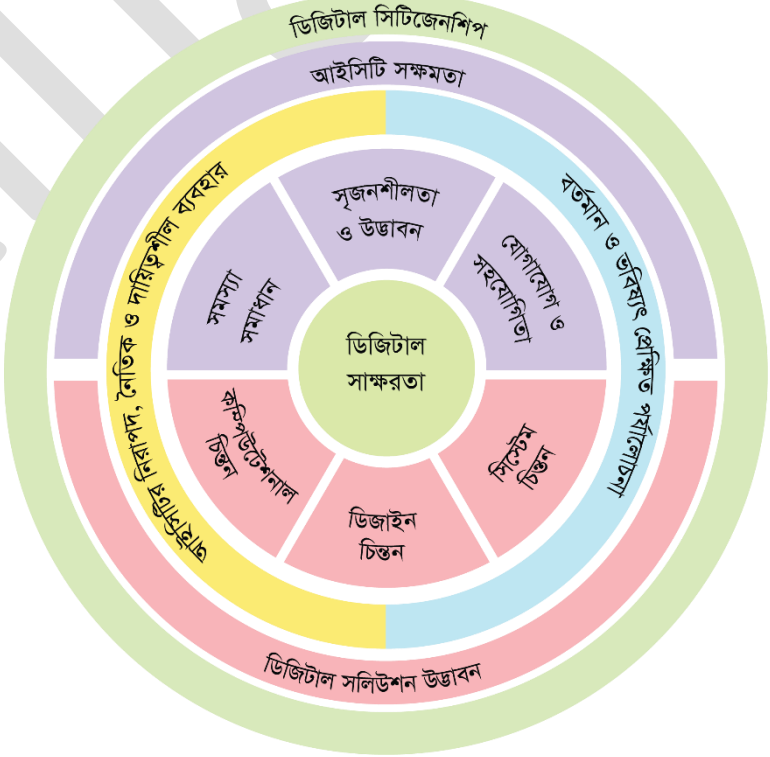

ডিজিটাল প্রযুক্তি শিক্ষা বিষয়ের ধারণায়নে উঠে আসা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিতভাবে নিচে আলোকপাত করা হল।

ডিজিটাল সাক্ষরতা : বর্তমান সময়ের প্রযুক্তি নির্ভর সমাজের উপযুক্ত সদস্য হিসেবে জীবনধারণ করতে ডিজিটাল সাক্ষরতা অত্যাবশ্যক। ডিজিটাল সাক্ষরতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ তথ্য সাক্ষরতা, তবে এর পরিধি আরো ব্যাপক। সুক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা

ব্যবহার করে বিভিন্ন ডিজিটাল প্রযুক্তির কার্যকারিতা যাচাই করতে পারা, বিভিন্ন প্রয়োজনে দক্ষতার সঙ্গে উপযুক্ত প্রযুক্তির যথাযথ, সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল ব্যবহার করতে পারা, এবং নিজস্ব কনটেন্ট তৈরি ও উপস্থাপনও ডিজিটাল সাক্ষরতার অংশ। তথ্য সাক্ষরতা সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিতভাবে নিচে আলোকপাত করা হল :

তথ্য সাক্ষরতা বলতে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য খুঁজে বের করা, তথ্যের নিরাপদ ও দায়িত্বশীল ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা, তথ্য ও তথ্যের উৎসের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করাসহ তথ্য ব্যবস্থাপনার সকল দিককে বোঝায়। তথ্য সাক্ষরতা সকল মাধ্যম থেকে পাওয়া তথ্য নিয়ে আলোচনা করে, এখনকার সময়ে মিডিয়া লিটারেসি বা মিডিয়া সাক্ষরতা এর অন্যতম অনুষঙ্গ। ডিজিটাল মিডিয়ার বিশাল তথ্যভাণ্ডার এখন মানুষের কাছে উন্মুক্ত, মানুষের পছন্দ, অপছন্দ, মতামতের ওপর স্পষ্ট প্রভাব পড়ছে এসব ডিজিটাল মিডিয়ার। কাজেই যেকোনো মিডিয়া থেকে তথ্য নেবার আগে উৎস ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, বিশ্বাসযোগ্যতা ইত্যাদির নির্মোহ বিশ্লেষণ করা জরুরি। একই সঙ্গে দরকার তথ্য ব্যবহার বা শেয়ার করার আগে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও ইস্যুসমূহ বিবেচনা করে দায়িত্বশীল আচরণ চর্চা করা। তাছাড়া ডিজিটাল মিডিয়াকে শুধু তথ্য গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে না নিয়ে নিজস্ব কনটেন্ট তৈরি ও শেয়ারের প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি যেহেতু দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এসব প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও ব্যবহারিক দক্ষতা ছাড়া তাই তথ্য সাক্ষরতা অর্জন করা কঠিন। অন্য দিকে একবিংশ শতকে প্রযুক্তি ব্যবহারকারী হিসেবে শুধু নয়, বরং ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীরা যাতে উদ্ভাবকের ভূমিকা নিতে পারে সেটাও বিবেচ্য। আর বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সৃজনশীল চিন্তা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা যাতে কার্যকর ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন করতে পারে সেজন্যেও ডিজিটাল সাক্ষরতা প্রয়োজন। এসব বিবেচনায় শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে যাতে ডিজিটাল সাক্ষরতা অর্জন করতে পারে এবং জীবনব্যাপী এই দক্ষতা যাতে কাজে লাগাতে পারে সেই অনুযায়ী অর্জনউপযোগী যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে।

ডিজিটাল সাক্ষরতা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা যেসব যোগ্যতা অর্জন করবে তাদের নিচের ডাইমেনশনগুলোতে ব্যাখ্যা করা যায় :

- **যোগাযোগ ও সহযোগিতা :** তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে পৃথিবীকে এখন বলা হচ্ছে গ্লোবাল ভিলেজ, যেখানে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে বসে যে-কেউ অন্য প্রান্তের কারো সঙ্গে মুহূর্তেই যোগাযোগ করতে পারে। ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়াও সমস্যা সমাধানের জন্য হোক বা অন্য যেকোনো সৃজনশীল কাজের জন্য হোক প্রযুক্তিনির্ভর এই পৃথিবীতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে যোগাযোগের সক্ষমতা যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি হচ্ছে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এক সঙ্গে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন। এই ক্ষেত্রে শুধু আইসিটি ব্যবহারের দক্ষতাই যথেষ্ট নয়, বরং নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে নির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপের জন্য উপযুক্ত যোগাযোগের মাধ্যম নির্ধারণ করে যোগাযোগের দক্ষতা এখানে গুরুত্বপূর্ণ।
- **সমস্যা সমাধান :** ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক প্রয়োজনে বা কোনো সমস্যা সমাধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ ও সৃজনশীল ব্যবহার করতে পারার সক্ষমতা অর্জন করার উপরে এই রূপরেখায় বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। শুধু তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার নয়, বরং যেকোনো সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সবগুলো ধাপে যথাযথভাবে উপযুক্ত ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

Working Draft

- **সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন :** সমস্যা সমাধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহারই শুধু নয়, বরং নিজস্ব কনটেন্ট তৈরি থেকে শুরু করে সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রয়োগ করে ডিজিটাল সমাধান সৃষ্টি এই ধরনের যোগ্যতার অন্তর্গত।
- **কম্পিউটেশনাল চিন্তন :** ডিজিটাল প্রযুক্তির সক্ষমতা অর্জনের জন্য মূল যেই দক্ষতাগুলো প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হল কম্পিউটেশনাল চিন্তন। এটি মূলত সমস্যা সমাধানের একটি সুসংবদ্ধ গাণিতিক চিন্তন প্রক্রিয়া, যার মধ্যে রয়েছে জটিল সমস্যাকে ছোট ছোট অংশে ভেঙে আলাদা করা, তথ্য উপাত্ত যৌক্তিকভাবে সাজানো, সমস্যা সমাধানের ধাপগুলোকে ধারাবাহিকভাবে ক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত করা, প্যাটার্ন খুঁজে বের করা ইত্যাদি।
- **ডিজাইন চিন্তন :** ডিজাইন চিন্তন ডিজিটাল প্রযুক্তি সক্ষমতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ডিজাইন চিন্তন বলতে মূলত বোঝায় কোন সমস্যার সৃজনশীল, অভিনব ও কার্যকরী সমাধান উদ্ভাবন এবং তা যৌক্তিক মানদণ্ডের বিচারে যাচাই-বাছাই করার সুবিন্যস্ত প্রক্রিয়া।
- **সিস্টেম চিন্তন :** সিস্টেম চিন্তন বলতে মূলত বোঝায় কোনো সুনির্দিষ্ট সমস্যা ও তার প্রস্তাবিত সমাধান, সংশ্লিষ্ট সিস্টেমের প্রকৃতি এবং পারিপার্শ্বিক সামাজিক প্রেক্ষাপটের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটনের জন্য একটা সমন্বিত প্রয়াস। ডিজিটাল সিস্টেম কীভাবে কাজ করে, এর বিভিন্ন উপাদান ও তাদের মিথস্ক্রিয়া কীভাবে গোটা সিস্টেমকে প্রভাবিত করে, এবং ডিজিটাল সিস্টেমসমূহের পরিবর্তন সমাজ, অর্থনীতির উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে সেসবও এখানে বিবেচ্য বিষয়।

উপরে উল্লেখিত ডাইমেনশনগুলোতে যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে যে দুটি বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতে হবে তা হল: আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট।

- **আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার :** তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে যোগাযোগ অভাবনীয় সহজ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু উল্টো দিকে সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন ঝুঁকি। এসব ঝুঁকি সম্পর্কে জানাই শুধু শিক্ষার্থীদের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এই ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় তথ্যপ্রযুক্তির নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহারের দক্ষতা থাকাও জরুরি। মেধাস্বত্ব রক্ষার নৈতিক ও আইনি কাঠামো, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধ ও সামাজিক কাঠামোতে এর নানা প্রভাব সম্পর্কিত আইন ও নৈতিক কাঠামো সম্পর্কে জ্ঞান থাকা তাই দরকার। একই সঙ্গে প্রয়োজন ব্যক্তিগত পরিচয়, গোপনীয়তা এবং অনুভূতি, রীতি-নীতি ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করা।
- **বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা :** ডিজিটাল সক্ষমতা অর্জন করতে নির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষাপটে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির চাহিদা, প্রাপ্যতা, ব্যবহার ইত্যাদি বিবেচনা যেমন জরুরি, তেমনি তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সামাজিক প্রেক্ষাপটকে কীভাবে প্রভাবিত করে সেটিও পর্যালোচনা করা জরুরি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল; আর এ পরিবর্তনশীলতা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকেও বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। এর ফলে সমাজে একদিকে যেমন কিছু ঝুঁকি তৈরি হয় তেমনি নতুন প্রযুক্তির কারণে উন্মোচিত হয় নতুন সম্ভাবনার দ্বার। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এসব ঝুঁকিসমূহ মোকাবিলা করে প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগানোর দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা প্রয়োজন। গত শতকের শেষভাগে ডিজিটাল প্রযুক্তির উদ্ভাবনের পর থেকে তথ্যপ্রযুক্তি যে গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে, তাতে এই সক্ষমতা অর্জনের জন্য

শুধু বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা যথেষ্ট নয়। বরং অর্জিত যোগ্যতার প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখতে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এই প্রেক্ষাপট কীভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন থেকে শুরু করে কর্মজগতে তার কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ খুবই প্রয়োজন।

উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা দুরকম সক্ষমতা অর্জন করবে, সেগুলো হল : আইসিটি সক্ষমতা এবং ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন।

- **আইসিটি সক্ষমতা :** বর্তমান সময়ে পৃথিবীর বড় অংশের মানুষের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সময়ের সঙ্গে এই অভ্যস্ততা বেড়ে চলেছে। তাই শিক্ষাক্রম রূপরেখায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহে দৈনন্দিন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে শেখার দক্ষতার চেয়ে এখন বেশি প্রাধান্য পেয়েছে দৈনন্দিন জীবনে তথ্য-প্রযুক্তির নিরাপদ, নৈতিক, যথাযথ, কার্যকর ও পরিমিতভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জন করা।
- **ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন :** একবিংশ শতকের বাস্তবতা সামনে রেখে ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী সুদক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে ডিজিটাল প্রযুক্তি শিক্ষার একটি লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তি সক্ষমতা গড়ে তোলা, সেই সূত্র ধরে এই শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও অভিনব ডিজিটাল সলিউশন সৃষ্টির সক্ষমতা অর্জনের দিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর ফলে সে শুধু বর্তমান সময়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে পারবে তা-ই নয়, বরং পরবর্তী জীবনেও তার বিভিন্ন সম্ভাবনার দরজা খোলা থাকবে।

ডিজিটাল সিটিজেনশিপ : উপর্যুক্ত সকল বিষয়ের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী যাতে ডিজিটাল নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে তার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এই রূপরেখায়। একটি ডিজিটাল সমাজে শিক্ষার্থী যাতে দক্ষতার সঙ্গে নিজের অবস্থান করে নিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে ডিজিটাল সিটিজেনশিপকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। একজন ডিজিটাল নাগরিক যেসব দিক দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয় তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

- ডিজিটাল সাক্ষরতা
- ডিজিটাল সলিউশন সৃষ্টি
- ভার্চুয়াল পরিচিতি (digital footprint)
- ডিজিটাল সিস্টেমে প্রাইভেসি ও নিরাপত্তা
- ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা ও শিষ্টাচার
- ডিজিটাল মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ
- সাইবার অপরাধ
- বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ও মেধাস্বত্ব

নিচের শিখনক্রমের শুরুতে শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী এবং তার নিচে শিখন যোগ্যতাসমূহ বিবৃত হয়েছে। শিখনক্রমের অনেক ক্ষেত্রে একই শিখন যোগ্যতা একাধিক শ্রেণিতে বিবৃত হয়েছে। এসকল ক্ষেত্রে শিখন অভিজ্ঞতার ধরন এবং বিষয়বস্তুর গভীরতা ও কাঠিন্য ব্যবহার করে শ্রেণিভিত্তিক বিস্তৃতি নির্ধারণ করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি আলাদা বিষয় আকারে থাকছে না, তাই এই স্তরের সকল শিখন যোগ্যতা ক্রস কাটিং হিসেবে গণিতসহ অন্যান্য সকল বিষয়ের শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হবে।

Working Draft

বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখনক্রম

প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি	৯ম শ্রেণি	১০ম শ্রেণি
পরিবারের সদস্যদের যোগাযোগের মাধ্যম পর্যবেক্ষণ করতে পারা ও ধারাবাহিক নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা	ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে বয়োসপোযোগী শিষ্টাচার বজায় রাখতে পারা ও চারপাশের মানুষের যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করতে পারা, ধারাবাহিক নির্দেশনা অনুসরণ করে সরল সমস্যা সমাধান করতে পারা	আশেপাশের মানুষ যোগাযোগের জন্য কখন কোন তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে তা পর্যবেক্ষণ করে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিজের বয়োসপোযোগী শিষ্টাচার বজায় রাখতে পারা, ধারাবাহিক নির্দেশনা অনুসরণ করে সরল সমস্যা সমাধান করতে পারা	সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের ধারাবাহিক ধাপসমূহ চিহ্নিত ও অনুসরণ করতে পারা; নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ডিজিটাল প্রযুক্তির ধরন অন্বেষণ করতে পারা; স্বাস্থ্যবিধি মেনে, সামাজিক শিষ্টাচার অনুসরণ করে নিজস্ব পরিসরে যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহার করতে পারা এবং নিজের ও অন্যের চিন্তাপ্রসূত কাজের উপর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া	সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের ধারাবাহিক ধাপসমূহ চিহ্নিত ও অনুসরণ করতে পারা; ডিজিটাল প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করে তথ্যের আদান প্রদান ও সৃজনশীল ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করতে পারা এবং নিজের ও অন্যের সৃষ্ট কনটেন্টের উপর অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া	সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের ধারাবাহিক ধাপসমূহ নির্ধারণ, উপস্থাপন ও অনুসরণ করতে পারা; ডিজিটাল সিস্টেমের গঠন পর্যবেক্ষণ করতে পারা; উপযুক্ত তথ্য প্রযুক্তি বাছাই করে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার ও কনটেন্ট তৈরিতে সৃজনশীলতার প্রয়োগ করতে পারা; প্রাইভেসি, মেধাস্বত্ব এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সৃষ্ট অন্যান্য ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং বিশ্বের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের স্বরূপ উপলব্ধি করে উপযুক্ত সামাজিক রীতিনীতি মেনে আচরণ করতে পারা	সরল অ্যালগরিদমের ধারাবাহিক ধাপসমূহ নির্ধারণ করে প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে পারা; ডিজিটাল নেটওয়ার্কে তথ্যের আদান-প্রদান পর্যবেক্ষণ করতে পারা; উপযুক্ত তথ্য প্রযুক্তি বাছাই করে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার ও নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে কনটেন্ট তৈরিতে সৃজনশীলতার প্রয়োগ করতে পারা; প্রাইভেসি, মেধাস্বত্ব এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সৃষ্ট অন্যান্য ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং বিশ্বের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের স্বরূপ উপলব্ধি করে উপযুক্ত সামাজিক রীতিনীতি মেনে আচরণ করতে পারা	বাস্তব সমস্যাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণপূর্বক তার সমাধানের জন্য ডিজিটাল সলিউশন তৈরি করতে পারা; বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্যের প্রবাহ পর্যালোচনা করে তথ্য নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার, সংরক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে পারা; ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিজের ভার্চুয়াল পরিচিতি, সাইবার ক্রাইম, কপিরাইট ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন হওয়া; এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রভাবে চলমান সামাজিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারা	বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য ডিজিটাল সলিউশন তৈরি করে তার ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করতে পারা; ডিজিটাল নেটওয়ার্কের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার সক্ষমতার সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারা; তথ্য ও তথ্যের উৎসের বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই; সাইবার ক্রাইম, কপিরাইট ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন হওয়া এবং নিজের প্রাইভেসি রক্ষা ও সাইবার ক্রাইমসহ নিরাপত্তা ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় যথার্থ নিরাপত্তা কৌশল ব্যবহার করতে পারা; এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রভাবে চলমান সামাজিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারা	বিভিন্ন উৎসের তথ্য তুলনা করে যাচাই করতে পারা; নেটওয়ার্কে যুক্ত ডিজিটাল সিস্টেমসমূহে তথ্যের প্রবাহ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জেনে বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য ডিজিটাল সলিউশন তৈরি করা ও তার উপযোগিতা যাচাই করতে পারা; ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের নানামুখী প্রভাব অনুসন্ধান করে করণীয় নির্ধারণ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজের ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে পারা; এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রভাবে স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে চলমান সামাজিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারা	বিভিন্ন উৎসের তথ্য তুলনা করে যাচাই করতে পারা; নেটওয়ার্কে যুক্ত ডিজিটাল সিস্টেমসমূহে তথ্যের প্রবাহ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জেনে বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য ডিজিটাল সলিউশন তৈরি করা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও স্থায়িত্ব বিবেচনায় নিয়ে এর সম্ভাবনা বিচার করতে পারা; ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের নানামুখী প্রভাব অনুসন্ধান করে করণীয় নির্ধারণ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজের ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে পারা; এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট ও প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ বিবেচনায় নিয়ে নতুন তথ্যপ্রযুক্তির সম্ভাব্য প্রভাব পূর্বানুমান করতে পারা
নিজ পরিবারের সদস্যরা কতভাবে নিজেদের মাঝে যোগাযোগ করে কৌতূহলী হয়ে তা পর্যবেক্ষণ করতে পারা	চার পাশের মানুষ কতভাবে নিজেদের মাঝে যোগাযোগ করে কৌতূহলী হয়ে তা পর্যবেক্ষণ করতে পারা	চার পাশের মানুষ কোন ধরনের তথ্য আদান প্রদানের জন্য কী ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে তা অন্বেষণ করতে পারা	নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে শিখনের উদ্দেশ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্ধরিত আচরণবিধি মেনে চলা		কোন ধরনের তথ্য কেন প্রয়োজন তা বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা ও তথ্যের ব্যবহারে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা		প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপযুক্ত তথ্য নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার, সংরক্ষণ করা ও তথ্যের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পারা	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য ও তথ্যের উৎসের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার, সংরক্ষণ করতে পারা	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে একাধিক উৎসের তথ্যের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত তথ্য বাছাই করতে পারা	
ধাপে ধাপে ধারাবাহিকভাবে নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা	ধাপে ধাপে নিদের্শনা অনুসরণ করে সরল সমস্যা সমাধান করতে পারা।		সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের ধারাবাহিক ধাপসমূহ নির্ধারণ করতে পারা এবং তা অনুসরণ করতে পারা।		সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের ধারাবাহিক ধাপসমূহ নির্ধারণ করে তা অনুসরণ করতে পারা এবং উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার করে তা উপস্থাপন করতে পারা।	সরল অ্যালগরিদমের ধারাবাহিক ধাপসমূহ নির্ধারণ, শাখাবিন্যাস এবং পুনরাবৃত্তি ডিজাইন ও পরিমার্জন করতে পারা এবং তা অনুসরণ করে প্রোগ্রাম প্রস্তুত করতে পারা	অর্থনৈতিক , সামাজিক, পরিবেশগত, কারিগরি ও ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করে কোন বাস্তব সমস্যাকে বিশ্লেষণপূর্বক তার সমাধানের জন্য অ্যালগরিদম ডিজাইন ও ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারা এবং তা প্রোগ্রামে রূপ দিতে পারা	কোন বাস্তব সমস্যাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণপূর্বক তার সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম ডিজাইন ও উপস্থাপন করতে পারা এবং এতে বিভিন্ন ইনপুটের জন্য সম্ভাব্য আউটপুট অনুমান করে ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করতে পারা	নির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বাস্তব সমস্যাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে তার সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম ডিজাইন, উপস্থাপন ও পরীক্ষামূলক ব্যবহারের মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে এর উপযোগিতা যাচাই করতে পারা।	কোন বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম ডিজাইন, উপস্থাপন ও এর ব্যবহারপযোগিতা যাচাই করতে পারা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিতে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও স্থায়িত্ব বিবেচনায় নিয়ে এর সম্ভাবনা বিচার করতে পারা
			নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ডিজিটাল প্রযুক্তির ধরন অন্বেষণ করতে পারা।	বিভিন্ন উদ্দেশ্যের ধরন অনুযায়ী কী ধরনের ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা এবং তথ্য আদান প্রদানে	ডিজিটাল সিস্টেমের আবশ্যিক উপাদানসমূহ পর্যবেক্ষণ করতে পারা	ডিজিটাল সিস্টেমের উপাদানসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কীভাবে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে এবং তথ্য আদান প্রদান করা হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা	বিভিন্ন ধরনের (তারযুক্ত, ওয়্যারলেস ইত্যাদি) নেটওয়ার্কে তথ্যের আদান-প্রদান ও সম্প্রচার কীভাবে করা হয় এবং তথ্যের সুরক্ষা কীভাবে বজায় রাখা	নেটওয়ার্কের উপাদান এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ কীভাবে এর কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে তা অনুধাবন করতে পারা	নেটওয়ার্কে যুক্ত ডিজিটাল সিস্টেমসমূহে তথ্যের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা, এবং তথ্যের সুরক্ষা বজায় রাখতে সিস্টেমের বিভিন্ন অংশের (হার্ডওয়্যার ও সফটওয়ার উভয়) ভূমিকা ও কাজ পর্যালোচনা করতে পারা	

Working Copy

প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি	৯ম শ্রেণি	১০ম শ্রেণি
				ডিজিটাল প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করতে পারা			হয় তা পর্যালোচনা করতে পারা			
			তথ্যের উপস্থাপনে ডিজিটাল প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহার করতে আগ্রহী হওয়া		ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজস্ব কনটেন্ট তৈরিতে সৃজনশীল চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো	নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে কনটেন্ট তুলে ধরতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহার করতে পারা	নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট এবং মাধ্যম বিবেচনায় নিয়ে সৃজনশীল কাজের উন্নয়ন ও উপস্থাপনে ডিজিটাল প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারে আগ্রহী হওয়া		ডিজিটাল প্রযুক্তির অভিনব ও উপযুক্ত ব্যবহার করে সৃজনশীল কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও উপস্থাপনে আগ্রহী হওয়া	
					ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারা		ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা গ্রহণ করতে পারা		ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা গ্রহণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া	ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা গ্রহণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কমিউনিটির সচেতনতা তৈরি করতে পারা
			নিজের বা অন্যের চিন্তাপ্রসূত লেখা বা কাজের উপর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া		বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ধারণা অনুধাবন করে তার উপর স্বত্বাধিকারীর অধিকার বিষয়ে সচেতন হওয়া		বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এবং এ বিষয়ক নীতি মেনে চলা		মেধাস্বত্ব রক্ষার নৈতিক ও আইনি কাঠামো সম্পর্কে সচেতন হওয়া	
			তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অভ্যেস গড়ে তোলা		ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও ঝুঁকি মোকাবেলার দক্ষতা অর্জন করতে পারা		তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নিজের ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করা ও তার নৈতিক, নিরাপদ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সেবা গ্রহণে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারা	ডিজিটাল প্লাটফর্মে ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তাজনিত বিভিন্ন ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করে বিভিন্ন ধরনের তথ্যের জন্য যথার্থ নিরাপত্তা কৌশল ব্যবহার করতে পারা	তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একাধিক কৌশল অবলম্বন করতে পারা এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের ঝুঁকিসমূহ বিবেচনা করে নিরাপত্তা কৌশল চর্চা করতে পারা	
					তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত অবস্থান ও করণীয় নির্ধারণ করতে পারা		সাইবার ক্রাইমের সামাজিক ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করে নীতিগত অবস্থান নির্ধারণ করতে পারা		ডিজিটাল প্লাটফর্মে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধ এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এর বিভিন্ন ধরনের প্রভাব অনুসন্ধান করে আইসিটি ব্যবহারের কর্মপন্থা উদঘাটন করতে পারা	
	নীতি ও মূল্যবোধ অনুসারে ব্যক্তিগত তথ্য আদান প্রদান করা এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে বয়োসপোযোগী সামাজিক রীতি-নীতি অনুযায়ী আচরণ করতে পারা।		ব্যক্তিগত তথ্য আদান প্রদান এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে ও ব্যবহার শিখতে আগ্রহী হওয়া		ব্যক্তিগত যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত সামাজিক রীতি-নীতি ও আচরণ করতে পারা।		প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত শিষ্টাচার বজায় রাখতে পারা।		জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাজ করার ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধ ও রীতিনীতি অনুযায়ী আচরণ করতে পারা	
					তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুসন্ধান করতে পারা		তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর চলমান পরিবর্তন খোলা মন নিয়ে ও নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করতে পারা		তথ্যপ্রযুক্তির পরিবর্তন কীভাবে স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর উপর প্রভাব ফেলে তা অন্বেষণ করতে পারা	সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে নতুন তথ্যপ্রযুক্তির সম্ভাব্য প্রভাব পূর্বানুমান করতে পারা

Working Draft

বিষয় : সামাজিক বিজ্ঞান

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্বে নিজের অবস্থান, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ও কাঠামো পর্যালোচনা করে পরিবর্তনশীলতায় ইতিবাচক ভূমিকা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা অনুশীলন করে একটি উন্নত, নিরাপদ ও টেকসই বাংলাদেশ ও বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বনাগরিক হিসাবে ভূমিকা রাখতে পারা।

বিষয়ের ধারণায়ন

সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একবিংশ শতাব্দীর একজন বিশ্বনাগরিক হিসেবে ভূমিকা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবার যোগ্যতা অর্জন করবে। প্রকৃতিতে ও সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা পরিবর্তনের কার্যকারণ ও প্রভাব অনুসন্ধান করতে পারবে। যৌক্তিক অনুসন্ধান পদ্ধতির প্রাথমিক ধারণা কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে অনুসন্ধানের যোগ্যতা অর্জন করবে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জেনে সচেতন নাগরিক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের মূলনীতির আলোকে সামাজিক ন্যায়বিচার নীতি ধারণ করে সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারবে।

সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টি ক্রস-কাটিং ইস্যু হিসেবে রূপরেখায় নির্ধারিত দশটি মূল শিখনক্ষেত্রের সবগুলোরই নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনে ভূমিকা রাখলেও, এতে মূলত সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব, পরিবেশ ও জলবায়ু এবং জীবন ও জীবিকা শিখন-ক্ষেত্রগুলো অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রেও এসকল শিখন-ক্ষেত্রের যোগ্যতাসমূহ ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

সামাজিক বিজ্ঞানের বৃহত্তর পরিসরে যে সকল বিষয় (যেমন : ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, আইন ইত্যাদি) অধ্যয়ন করা হয় সেগুলোর মূল বিষয়বস্তুসমূহ বিশ্লেষণ করে আত্মপরিচয়, প্রাকৃতিক

Working Draft

ও সামাজিক কাঠামো, পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা – এই চারটি মূল ডাইমেশন নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এই চারটি ডাইমেনশনকে ভিত্তি করেই বিষয়ের ধারণায়ন করা হয়েছে।

ধারণায়ন অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থী সামাজিক বিজ্ঞান অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রকৃতি ও সমাজের বিভিন্ন দৃশ্যমান ও বিমূর্ত কাঠামো এবং এসব কাঠামোর কাজ ও মিথস্ক্রিয়া বিষয়ে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করবে। একই সঙ্গে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে নিজস্ব ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগলিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সে তার আত্মপরিচয় অনুসন্ধান করতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি সে অনুধাবন করবে যে চারপাশের সকল প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো এবং তাদের ভূমিকা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তনশীলতার ফলে নিয়তই কিছু সম্ভাবনা এবং ঝুঁকি তৈরি হয়, যা প্রকৃতি ও সমাজকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। একজন শিক্ষার্থী এসব ঝুঁকি মোকাবিলা করে সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতি ও সমাজের পরিবর্তনশীলতায় ইতিবাচক ভূমিকা পালনের যোগ্যতা অর্জন করবে। মানবসভ্যতার বিকাশে সম্পদ একটি অপরিহার্য উপাদান। কাজেই টেকসই উন্নয়নের জন্য পৃথিবীর সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা জরুরি। তাই সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে সম্পদ ব্যবস্থাপনা একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। আলোচ্য চারটি ডাইমেনশনের আলোকে একজন শিক্ষার্থী যে যোগ্যতাসমূহ অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে তা সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সামাজিক সম্পর্ক, পরিবেশ ও প্রতিবেশ, টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য এসকল ক্ষেত্রে চর্চা করার মাধ্যমে সহযোগিতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, দায়িত্বশীলতা, সংবেদনশীলতা প্রভৃতি মূল্যবোধ ও নৈতিকতা অর্জন করতে পারবে। আর এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে যে যোগ্যতা অর্জিত হবে তার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী হয়ে উঠবে জাতীয়তাবোধসম্পন্ন বিশ্বনাগরিক।

সামাজিক বিজ্ঞানের যোগ্যতাসমূহ নির্ধারণ করার জন্য যে চারটি ডাইমেনশন বিবেচনায় নেয়া হয়েছে তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হয়েছে :

- **আত্মপরিচয়**

ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজের পরিচয় নির্মাণ করা সামাজিক বিজ্ঞানের একটি মূল প্রতিপাদ্য হওয়ায় সকল বিষয়কে সমন্বিতভাবে আয়ত্ত করার জন্য একে একটি ডাইমেনশন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

- **প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো**

প্রাকৃতিক সামাজিক বিজ্ঞানের সকল বিষয়েরই কেন্দ্রীয় একটি বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কাঠামোর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করা। প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের যোগ্যতা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তাই কাঠামোকে একটি ডাইমেনশন হিসেবে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রাকৃতিক কাঠামো বলতে সাধারণত প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান ও ব্যবস্থা যেমন : নদী, সাগর, মহাসাগর, পর্বতমালা, মহাদেশ প্রভৃতিকে বোঝানো হয়ে থাকে। অন্য দিকে, সামাজিক কাঠামো বলতে সাধারণত পরিবার, ধর্ম, রীতিনীতি, সংস্কৃতি,গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে বোঝানো হয়।

- **পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা**

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ভিত্তিতে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতার বস্তুনিষ্ঠ প্যাটার্ন অনুসন্ধান করা সামাজিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য বিষয়। যে কোন পরিবর্তনের ফলেই কিছু সম্ভাবনা ও ঝুঁকি তৈরি হয়। এই ঝুঁকি ও সম্ভাবনা বিবেচনা করে যথাযথ ইতিবাচক ভূমিকা নির্ধারণের যোগ্যতা

অর্জন সামাজিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এ বিবেচনায় পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা নির্ধারণকে সামাজিক বিজ্ঞানের যোগ্যতা নির্ধারণের একটি ডাইমেনশন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

- **সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ**

উন্নয়নের জন্য সম্পদ একটি অপরিহার্য বিষয়। প্রকৃতির সম্পদ সীমিত। প্রকৃতিকে ব্যবহার করে সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণ অর্থাৎ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণকে তাই সামাজিক বিজ্ঞানের একটি ডাইমেনশন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

নিচের শিখনক্রমের শুরুতে শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী এবং তার নিচে শিখন যোগ্যতাসমূহ বিবৃত হয়েছে। শিখনক্রমের অনেক ক্ষেত্রে একই শিখন যোগ্যতা একাধিক শ্রেণিতে বিবৃত হয়েছে। এসকল ক্ষেত্রে শিখন অভিজ্ঞতার ধরন এবং বিষয়বস্তুর গভীরতা ও কাঠিন্য ব্যবহার করে শ্রেণিভিত্তিক বিস্তৃতি নির্ধারণ করতে হবে।

Working Draft

বিষয় : সামাজিক বিজ্ঞান

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখনক্রম

প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি	৯ম শ্রেণি	১০ম শ্রেণি
সমাজে সবার সঙ্গে সামাজিক রীতি অনুযায়ী মিলেমিশে থাকতে পারা ও যথাযথ আচরণ করতে পারা এবং প্রকৃতি ও দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা অনুভব করতে পারা।	চার পাশের পরিবেশের বৈচিত্র্য উপলব্ধি করে তার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া; প্রকৃতি ও দেশের প্রতি মমতা অনুভব করে নিজের ও নিজের সামগ্রীর প্রতি যত্নবান হয়ে সবার সঙ্গে মিলেমিশে ভাল থাকা।	চেনা জানা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আত্মপরিচয় উপলব্ধি করা। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ধারণা লাভ করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা। সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যকে সহযোগিতা করা ও ব্যক্তিগত সামগ্রীর প্রতি যত্নবান হওয়া এবং নিকট পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারা।	বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ইতিহাস যে পূর্বনির্ধারিত নয়, বরং মানুষের নেয়া সিদ্ধান্তের ফল তা উপলব্ধি করে মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্যতা উপলব্ধি করতে পারা এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে এর বিকাশ ও ভূমিকা অনুসন্ধান করে, সম্পদের সঙ্গে এর সম্পর্ক উপলব্ধি করে নিজের অধিকার ও কর্তব্য অনুযায়ী দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।	বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ইতিহাস যে পূর্বনির্ধারিত নয়, বরং মানুষের নেয়া সিদ্ধান্তের ফল তা অনুধাবন করে মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্যতার কারণ অনুসন্ধান করতে পারা এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো এর উপাদানসমূহের মিথস্ক্রিয়া অন্বেষণ করে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর গঠন, পরিবর্তনশীলতা, সম্পদের ধারণার বিকাশ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যক্তির ভূমিকা কীভাবে নির্ধারিত হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা।	বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ও আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করে কীভাবে এসব কাঠামো সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্নভাবে গড়ে উঠে, কীভাবে সমাজে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে এবং সম্পদের ধারণাকে বিকশিত করে তা উপলব্ধি করতে পারা; লিখিত উৎসের বাইরেও বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধান করে ইতিহাসের পটপরিবর্তনের স্বরূপ অনুসন্ধান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান উপলব্ধি করে শ্রদ্ধা ও মমতার সঙ্গে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।	প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন পরিবর্তন পর্যালোচনা ও এদের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করে কীভাবে বিভিন্ন সামাজিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা কাঠামোগুলো গড়ে উঠে তা অনুসন্ধান করতে পারা এবং এর প্রেক্ষিতে কীভাবে সমাজে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারিত হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা; প্রচলিত লিখিত উৎসের বাইরেও বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান করে ইতিহাসের পটপরিবর্তন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান উপলব্ধি করে শ্রদ্ধা ও মমতার সঙ্গে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।	সামাজিক কাঠামো, রীতিনীতি, মূল্যবোধ এবং সমাজে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা যে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে তা অনুসন্ধান করে এর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সাদৃশ্য ও ভিন্নতার কারণ উপলব্ধি করে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সহাবস্থান এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা নির্ধারণ করা।	প্রকৃতি ও সমাজের বিভিন্ন উপাদানের মিথস্ক্রিয়ার ফলস্বরূপ প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট তৈরির প্রক্রিয়া এবং এই প্রেক্ষাপট কীভাবে ব্যক্তির আত্মপরিচয় ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে তা পর্যালোচনা করে সমাজে বৈচিত্র্যের কারণ উপলব্ধি করা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা নির্ধারণ করা	প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সমাজের মানুষের আচরণিক প্যাটার্নের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় সংঘটিত পরিবর্তনের ফলে নিকট ভবিষ্যতে উদ্ভূত সম্ভাবনা ও ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় জাতীয় পরিসরে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ভূমিকা নির্ধারণ করে তা পালনে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা।	প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সমাজের মানুষের আচরণিক প্যাটার্নের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় সংঘটিত পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত সম্ভাবনা ও ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় বৈশ্বিক পরিসরে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ভূমিকা নির্ধারণ করে তা পালনে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা।
	চার পাশের পরিবেশ সম্পর্কে কৌতূহলী হওয়া ও চারপাশের বৈচিত্র্য উপলব্ধি করতে পারা	চেনা সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে তার পক্ষপাতহীন উত্তর খুঁজতে পারা	বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো ও প্রকৃতির সঙ্গে এর উপাদানসমূহের মিথস্ক্রিয়া অন্বেষণ করতে পারা		বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে সময়ের সঙ্গে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো ও এর উপাদানসমূহের পরিবর্তন অন্বেষণ করতে পারা	বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সামাজিক কাঠামো ও এর উপাদানসমূহের পরিবর্তন অন্বেষণ করতে পারা	বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং সামাজিক কাঠামো, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ যে ধ্রুব নয় বরং প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা	প্রকৃতি ও সমাজের বিভিন্ন উপাদান কীভাবে ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে অনুসন্ধান করতে পারা	প্রকৃতি ও সমাজের বিভিন্ন উপাদান কীভাবে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে এবং সেই অনুযায়ী কীভাবে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয় তা উপলব্ধি করা এবং তাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যাচাই করা ও সে অনুযায়ী সংবেদনশীল আচরণ করতে পারা
পরিবারে ও বিদ্যালয়ে তার অবস্থান ও পরিচয় সম্পর্কে সচেতন হওয়া	চেনা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আত্মপরিচয় উপলব্ধি করতে পারা		স্থানীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে আত্মপরিচয় উপলব্ধি করতে পারা	বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আত্মপরিচয় উপলব্ধি করতে পারা	ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে নিজের আত্মপরিচয় ধারণ করা ও সেই অনুযায়ী দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা		নিজের ও অন্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ও ভিন্নতা উপলব্ধি করে সহযোগিতার ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারা	পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আত্মপরিচয় গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি মানুষের অনন্যতা এবং	বিভিন্ন ভৌগলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে মানুষের আত্মপরিচয় ও আচরণিক প্যাটার্ন কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করতে পারা

প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি	৯ম শ্রেণি	১০ম শ্রেণি
								তার ফলে তৈরি হওয়া বৈচিত্র্য অন্বেষণ করতে পারা		
		ইতিহাস যে সময়ের সঙ্গে মানুষের ধারাবাহিক কার্যকলাপের ফলাফল তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা	ইতিহাস যে পূর্বনির্ধারিত নয়, বরং প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিভিন্ন ফ্যাক্টরের পরিবর্তনের কারণে মানুষের নেয়া সিদ্ধান্তের ফলে নির্ধারিত হয় তা উপলব্ধি করতে পারা		প্রচলিত লিখিত উৎসের বাইরেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে তথ্য নিয়ে ইতিহাসের পটপরিবর্তনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারা		ঐতিহাসিক তথ্য যে উৎস এবং শ্রোতার উপর নির্ভর করে এবং তা যে ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয় তা উপলব্ধি করতে পারা	একই ঐতিহাসিক তথ্য যে ভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অর্জিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন বয়ান তৈরি করে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা	একাধিক প্রেক্ষাপট থেকে আসা ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক বয়ান দলিল ও প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করে নিজস্ব যৌক্তিক ভাষ্যে উপনীত হওয়া	বর্তমানের কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের ইতিহাস সৃষ্টি হয় তা উপলব্ধি করে দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করতে পারা
বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনে দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা অনুভব করতে পারা	চার পাশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদান (গান, গল্প, কবিতা, নাটক ইত্যাদি) থেকে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অনুভব করতে পারা	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জেনে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারা	মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্যতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা		লিখিত উৎসের সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান করে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান উপলব্ধি করতে পারা		মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারা	মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতে পারা	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে পারা	
	নিজস্ব পরিসরে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন কাঠামো অন্বেষণ করতে পারা		নিজস্ব পরিসরে সামাজিক কাঠামো কীভাবে গড়ে ওঠে এবং কাজ করে তা অনুসন্ধান করতে পারা কীভাবে	যেসব সামাজিক কাঠামো সরাসরি ব্যক্তির অবস্থান নির্ধারণ করে সেগুলো কীভাবে গড়ে ওঠে এবং কাজ করে তা অনুসন্ধান করতে পারা	সামাজিক কাঠামো কীভাবে বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটে বিভিন্নভাবে গড়ে ওঠে এবং কাজ করে তা অন্বেষণ করতে পারা	সামাজিক কাঠামো কীভাবে বিভিন্ন সময় ও ভৌগলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বিভিন্নভাবে গড়ে ওঠে এবং কাজ করে তা অন্বেষণ করতে পারা	প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি কীভাবে সামাজিক কাঠামোর উপর প্রভাব ফেলে এবং একই সঙ্গে এই কাঠামো দ্বারা কীভাবে সেগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় তা অন্বেষণ করতে পারা		নিজস্ব গণ্ডি থেকে শুরু করে বৃহৎ বৈশ্বিক পরিসরে সামাজিক কাঠামোকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করতে পারা	
বন্ধু ও সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারা এবং বড়দের সঙ্গে সামাজিক রীতি অনুযায়ী আচরণ করতে পারা	প্রকৃতি ও সমাজের সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারা এবং নিজের কাজ নিজে করতে পারা		সমাজে অন্যদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজস্ব পরিসরে দায়িত্ব পালন করতে পারা	সামাজিক প্রতিষ্ঠান কীভাবে ব্যক্তির ভূমিকা নির্ধারণ করে তা উদঘাটন করতে পারা	সমাজে ব্যক্তির অবস্থান ও তার ভূমিকা বিদ্যমান সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো দ্বারা কীভাবে নির্ধারিত হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা		সময়ের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার উপর কী রকম প্রভাব ফেলে তা অনুসন্ধান করতে পারা		স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর যৌক্তিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করতে পারা	
			নিজস্ব পরিসরে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে পর্যবেক্ষণ করতে পারা	নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের কার্যকারণ অনুসন্ধান করা ও সংবেদনশীল আচরণ করতে পারা	প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে এদের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করা এবং দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা		স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নিজস্ব গণ্ডিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারা	স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারা	বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্যাটার্ন উদঘাটন করে এর ফলে সৃষ্ট সম্ভাবনা ও ঝুঁকিসমূহ বিবেচনা করে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ভূমিকা পালনে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে পারা	
নিজের, অন্যের ও সবার ব্যবহার্য সামগ্রীকে চিহ্নিত করতে পারা	ব্যক্তিগত সামগ্রীর প্রতি যত্নবান হওয়া	নিজস্ব পরিসরে বিভিন্ন ব্যবহার্য্য সামগ্রী ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নবান হওয়া	প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সম্পদের সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারা	নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সম্পদের ধারণার বিকাশ পর্যালোচনা করতে পারা		সময় ও অঞ্চলভেদে সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাঠামো কীভাবে গড়ে ওঠে তা অন্বেষণ করতে পারা	বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণের চর্চা সামাজিক সমতার নীতির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে পারা		সমাজ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ এবং সংরক্ষণের নীতি বিশ্লেষণ করে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ভূমিকা নির্ধারণ করতে পারা

Working Draft

বিষয় : জীবন ও জীবিকা

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

পরিবর্তনশীল কর্মজগত, কর্মের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে সকল কাজের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়ন করা, কর্মজগতে প্রবেশের প্রস্তুতি হিসেবে দৈনন্দিন কাজ অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাক-যোগ্যতা, কর্মজগতের উপযোগী প্রায়োগিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা, কর্মজগতে ঝুঁকিমুক্ত ও সুরক্ষিত থেকে ভবিষ্যৎ দক্ষতায় অভিযোজন করতে পারা এবং সকলের জন্য নিরাপদ ও আনন্দময় কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে অবদান রাখতে পারা।

বিষয়ের ধারণায়ন

বর্তমানে আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দোর গোড়ায় এসে পৌঁছেছি। পূর্বে মেশিন লার্নিং, রোবোটিক্স, বিগডাটা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ন্যানো টেকনোলোজি, থ্রি-ডাইমেনশন প্রিন্টার, জেনেটিক্সসহ একুশ শতকের আরো অনেক প্রযুক্তি আলাদা আলাদাভাবে বিকশিত হতে থাকলেও বর্তমানে এই প্রযুক্তিসমূহ পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে এমনভাবে দ্রুত গতিতে বিকশিত হচ্ছে যা পুরো বিশ্বব্যবস্থাকেই নতুন করে বিন্যস্ত করছে। একটি গবেষণায় হিসেব করে দেখানো হয়েছে, *যে শিশুরা আজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়, তাদের ৬৫% কর্ম জগতে প্রবেশ করবে এমন একটি কাজ বা চাকুরি নিয়ে, যে কাজের বা চাকুরির কোনো অস্তিত্বই বর্তমানে নেই*[২]। এরকম দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং অজানা বিশ্বকে বিবেচনা করে, আজকের শিক্ষার্থীদের, তাদের কর্মজগতে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের নিমিত্তে 'জীবন ও জীবিকা' বিষয় প্রবর্তন করা হয়েছে।

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যত কর্মজগতে প্রবেশের জন্য নিজেকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করবে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে পরিবর্তনশীল শ্রমবাজার বিবেচনায় নিয়ে সঠিকভাবে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং করতে পারবে। সে লক্ষ্য বা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদ্ধতিগতভাবে বিভিন্ন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। পেশাগত দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি একুশ শতকের উপযোগী প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করবে। কর্মজগতে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি নিজ, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের কাছে তার দায়বদ্ধতা উপলব্ধি করে তার উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য সচেষ্ট হবে।

[২] McLeod, Scott and Karl Fisch, "Shift Happens", https://shifthappens.wikispaces.com.

শিক্ষার্থীদের কর্মের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব তৈরি, ব্যক্তির নিজের, তার পরিবার ও সমাজের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের জন্য আন্তঃনির্ভরতা সৃষ্টি, যথোপযুক্ত কর্মদক্ষতা ও মূল্যবোধ উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজে কল্যাণকর অবদান রাখার জন্য সচেষ্ট করা হবে। আশা করা যায়, জীবন ও জীবিকা বিষয় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রবণতা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে এবং তা কাজে লাগিয়ে আগামীতে শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উদ্ভূত যে কোনো ধরনের ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে নিজেকে সকল পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারবে।

উক্ত যোগ্যতা অর্জনের জন্য চারটি ডাইমেনশন নির্ধারণ করা হয় :

ডাইমেনশন	বর্ণনা
আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মউন্নয়ন	আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিজের আগ্রহ, পছন্দ-অপছন্দ, ভালোলাগা-মন্দলাগা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারা। নিজের দক্ষতা ও সক্ষমতা সম্পর্কে জানা এবং তার উত্তরোত্তর উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া। ইতিবাচক আত্মসম্মানবোধের উন্মেষ ঘটানো যার মাধ্যমে নিজ, পরিবার, সমাজ ও জাতীয় দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া; নিজের কাজ, পরিবারের কাজ, বিদ্যালয়ের দায়িত্ব, সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হতে পারা।
ক্যারিয়ার প্ল্যানিং (কর্মজীবন পরিকল্পনা)	নিজের আগ্রহ, ঝোঁক, দক্ষতা বিবেচনা করে পরিবর্তশীল বিশ্বে শ্রমবাজারের ওপর ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাব বিশ্লেষণ করে পারিবারিক সক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে একটি কার্যকর কর্মজীবন পরিকল্পনা করতে পারা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনশীল বিশ্ব ও অজানা ভবিষ্যত বিবেচনা করে পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যাতে যে কোনো পরিস্থিতিতে তা পরিমার্জন বা পরিবর্তন বা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমন্বয় করা যায়।
পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা	প্রি-ভোকেশনাল ২ এবং এসএসসি ভোকেশনালের এর আংশিক দক্ষতা
ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা	বিশ্বায়ন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, ডেমোগ্রাফিক রূপান্তরের ধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি মুহূর্তে বৈশ্বিক পরিবর্তনের চলমান প্রক্রিয়ায় অজানা পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানো এবং নতুন যুগের সম্পূর্ণ নতুন পেশা/কাজ করার জন্য একুশ শতকের দক্ষতাসমূহ বিশেষত সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, কোলাবোরেশন বা দলে কাজ করার দক্ষতা, সৃজনশীল দক্ষতা ও যোগাযোগ দক্ষতা।

প্রতিটি ডাইমেনশনে দক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন এবং নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এই বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও অনুধাবনের পাশাপাশি দৈনন্দিন কর্ম অনুশীলন করে ব্যবহারিক কাজের দক্ষতা অর্জন করতে পারবে এবং জীবনঘনিষ্ঠ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ অর্জন করবে। বিষয়টির পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থীই কোনো একটি পেশাগত দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাও অর্জন করতে পারে। স্থানীয় চাহিদা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী বিদ্যালয় বা শিক্ষার্থীর নিজ এলাকায় উপার্জন-সংশ্লিষ্ট কাজে অংশগ্রহণ করার অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা উদ্যোক্তা হিসেবে ছোটোখাটো বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপান্তে শিক্ষার্থীরা পরবর্তী উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে পারবে, অন্তবর্তীকালীন অকুপেশনাল প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারবে অথবা উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবে।

Working Draft

বিষয় : জীবন ও জীবিকা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখনক্রম

প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি	৯ম শ্রেণি	১০ম শ্রেণি
নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ভালো লাগা-মন্দলাগা প্রকাশ করতে পারা এবং নিজের কাজ নিজে করার আগ্রহ প্রকাশ করতে পারা।	নিজের পছন্দের কাজ শনাক্ত করতে পারা এবং নিজের কাজ শনাক্ত করে নিজে করতে পারা।	নিজের আগ্রহ, দক্ষতা ও কাজ চিহ্নিত করতে পারা; সীমিত সম্পদ ও পরিমিতিবোধ বিবেচনা করে নিজের কাজ নিজে উৎসাহের সঙ্গে করতে সমর্থ হওয়া; দলীয়ভাবে সকলের জন্য হিতকর কোনো কাজ করতে পারা।	পারস্পরিক সম্মান ও আস্থার সঙ্গে দলীয়ভাবে একটি কাজ করতে পারা; স্থানীয় পেশাজীবীদের কাজের গুরুত্ব অনুভব করে কাজের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করতে পারা; নিজের ও পরিবারের কাজে সহায়তা করতে পারা।	স্বল্পমেয়াদি ব্যক্তিগত লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিরাপদে বাস্তবায়ন করতে পারা; বিদ্যালয়কেন্দ্রিক কোনো একটি সমস্যার কার্যকর সাশ্রয়ী সমাধান দলীয়ভাবে খুঁজে বের করতে পারা; স্থানীয় পেশাসমূহের মৌলিক দক্ষতাগুলো চিহ্নিত করতে পারা; পরিবার ও বিদ্যালয়ের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য চিহ্নিত করে পারিবারিক ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে সাশ্রয়ী অংশগ্রহণ করতে পারা।	ইস্যুভিত্তিক বাস্তবসম্মত স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্য নির্ধারণ ও নিরাপদে বাস্তবায়ন করতে পারা; দলীয়ভাবে একটি সমস্যার একাধিক সমাধান থেকে সর্বোত্তম সমাধান যৌক্তিকভাবে বের করতে পারা; পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে স্থানীয় পেশাসমূহের পরিবর্তনের ধারা শনাক্ত করতে পারা; সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের ভূমিকা ও দায়িত্ব বিশ্লেষণ করে নিজ সামাজিক দায়িত্ব পালনের উদ্যোগী হতে পারা।	পছন্দ ও যোগ্যতা বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে তা অর্জনের বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা; দলীয়ভাবে সামাজিক/ স্থানীয় একটি সমস্যার সমাধান করতে পারা; পরিবর্তিত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্থানীয় ও দেশীয় পেশাসমূহ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দক্ষতাসমূহের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারা ও পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার মানসিকতা উন্নয়ন করতে পারা।	জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারা; লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র খুঁজে বের করতে পারা; ভবিষ্যত দেশীয় পেশার মৌলিক দক্ষতাসমূহ শনাক্ত করতে পারা; পারিবারিক বাজেট করতে পারা; ভবিষ্যত প্রযুক্তি সম্পর্কে হালনাগাদ জ্ঞান প্রদর্শন করতে পারা।	দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের ক্রম পরিবর্তনশীল চাহিদা বিশ্লেষণ করে নিজের পেশাগত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা; বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা; ভবিষ্যত পেশায় প্রাধান্য বিস্তকারকারী নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে হালনাগাদ ধারণা প্রদর্শন করতে পারা। কার্যকর পারিবারিক আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিজের দায়িত্ব সুচারুভাবে বাস্তবায়ন করতে পারা। ট্রেড সম্পর্কিত মৌলিক দক্ষতা (প্রি-ভোক-২) প্রদর্শন করতে পারা।	পেশাগত লক্ষ্য নির্ধারণ করে তা অর্জনের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা; ক্রমাগত পরিবর্তনশীল শ্রম বাজারের সঙ্গে খাপখাওয়ানোর জন্য নিয়ত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা; ছোট-খাটো বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করে পারিবারিক আয়ে স্বল্প পরিমানে অবদান রাখতে পারা; নির্দিষ্ট একটি ট্রেডের মৌলিক দক্ষতাসমূহ প্রদর্শন করতে পারা ও বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারা।	
নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ভালো লাগা-মন্দ লাগা প্রকাশ করতে পারা।	নিজের পছন্দের কাজ চিহ্নিত করে তা উৎসাহের সঙ্গে করতে সমর্থ হওয়া।	ব্যক্তিগত দক্ষতা ও আগ্রহ চিহ্নিত করতে পারা এবং তার উন্নয়নে কাজ করতে সচেষ্ট হওয়া।	ব্যক্তিগত দক্ষতা ও আগ্রহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধারণা, তথ্য, অনুভূতি অন্যদের সঙ্গে বিভিন্ন মাধ্যমে বিনিময় করতে পারা এবং অন্যদের মতামত ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারা।	ব্যক্তিগত পছন্দ ও দক্ষতা বিবেচনায় স্বল্প মেয়াদি ব্যক্তিগত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং নিরাপদ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিরাপদে বাস্তবায়ন করতে পারা।	কৌশলগতভাবে বাস্তবসম্মত কার্যকর স্বল্পমেয়াদি ব্যক্তিগত ইস্যুভিত্তিক লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা, নিরাপত্তা বিবেচনা করে ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে পারা।	নিজের পছন্দ যোগ্যতা বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং তা বাস্তবায়নে স্বল্প মেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল জেনে তা প্রণয়ন করতে পারা।	ব্যক্তিগত পছন্দ যোগ্যতা ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং তা বাস্তবায়নে স্বল্প মেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা।	ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও পরিবর্তনশীল পেশাগত চাহিদা বিবেচনা করে পেশাগত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং তা অর্জনে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা।	নিজ পছন্দ, যোগ্যতা, পারিবারিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে জাতীয় ও বৈশ্বিক পেশাগত ধারার পরিবর্তন বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য ও পেশাগত লক্ষ্যের সমন্বয় করে বাস্তবসম্মত পেশাগত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা।	নিজ পছন্দ, যোগ্যতা, পারিবারিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে জাতীয় ও বৈশ্বিক পেশাগত ধারার পরিবর্তন বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য ও পেশাগত লক্ষ্যের সমন্বয় করে বাস্তবসম্মত পেশাগত লক্ষ্য নির্ধারণ, তা অর্জনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা।
			স্থানীয় পেশাসমূহ শনাক্ত করতে পারা এবং পেশাজীবীর কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করে কাজের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করতে পারা।	স্থানীয় পেশাসমূহ শনাক্ত করতে পারা এবং পেশাগুলোর মৌলিক দক্ষতাসমূহ অনুসন্ধান করতে পারা।	প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং পরিবর্তনশীল পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী স্থানীয় পেশাসমূহের পরিবর্তনের প্রবনতা পর্যালোচনা করতে পারা।	প্রযুক্তির উন্নয়ন, শিল্পবিপ্লব এবং স্থানীয় ও জাতীয় পরিস্থিতি ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় ও দেশীয় পেশাসমূহের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারা, পেশাগুলোর মৌলিক দক্ষতাসমূহ বিশ্লেষণ করে এইসব দক্ষতা অর্জনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করতে পারা।	বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতসমূহের (সেবা, শিল্প ও কৃষি) আলোকে দেশীয় শ্রম বাজারের চাহিদার পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করতে পারা এবং ভবিষ্যত শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সম্ভাব্য পেশাগুলোর মৌলিক দক্ষতাসমূহ তত্ত্বানুসন্ধান করতে পারা।	দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের ক্রম পরিবর্তনশীল চাহিদা বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যত কাঙ্ক্ষিত পেশাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ অন্বেষণ করে, এসব দক্ষতা অর্জনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক, উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারা।	দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের ক্রম পরিবর্তনশীল চাহিদা বিশ্লেষণ করে নিজ কাঙ্ক্ষিত পেশার মৌলিক দক্ষতা অর্জনের উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং করতে পারা।	দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের ক্রম পরিবর্তনশীল চাহিদা বিশ্লেষণ করে সামাজিক ও পরিবেশগত দায়বদ্ধতার আলোকে নিজ কাঙ্ক্ষিত পেশার মৌলিক দক্ষতা অর্জনের উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং করতে পারা।

প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি	৯ম শ্রেণি	১০ম শ্রেণি
		দলীয়ভাবে সকলের জন্য হিতকর একটি কাজ শনাক্ত করে তা বাস্তবায়ন করতে পারা।	দলীয়ভাবে সকলের জন্য হিতকর একটি কাজ শনাক্ত করে পারস্পরিক সম্মান ও আস্থার সঙ্গে বাস্তবায়ন করতে পারা।	দলীয়ভাবে বিদ্যালয়কেন্দ্রিক কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের উপায় প্রয়োগ করে সাশ্রয়ী সমাধানের উপায় বের করা।	দলীয়ভাবে বিদ্যালয় বা সামাজিক/ স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসূ সমাধানের উপায় বের করা এবং দলীয়ভাবে সমাধানের প্রয়াস নিতে পারা।	দলীয়ভাবে বিদ্যালয় বা সামাজিক/ স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসূ সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলীয়ভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধানের প্রয়াস নিতে পারা।	স্থানীয় সম্পদ, সুযোগ ও চাহিদার ভিত্তিতে লাভজনক বিনিয়োগের খাত খুঁজে পাবার কৌশল প্রয়োগ করতে পারা এবং দলীয়ভাবে ছোট একটি বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা।	উদ্যোক্তা হিসেবে দলীয়ভাবে একটি উদ্ভাবনী বিনিয়োগ ধারণা উন্নয়ন; সম্ভাব্য আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ করে বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন করতে পারা।	পরিবেশগত প্রভাব, আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ করে উদ্ভাবনীমূলক বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা এবং দলীয়ভাবে ছোটমাপের বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারা।	পরিবেশগত প্রভাব, আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ করে টেকসই, উদ্ভাবনীমূলক বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা এবং দলীয়ভাবে ছোটমাপের বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারা।
নিজের কাজ নিজে করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করা।	নিজের কাজ (খাওয়া, ঘুম, হাত ধোওয়া, নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, ইত্যাদি) শনাক্ত করতে পারা ও নিজের কাজ নিজে করার চেষ্টা করা।	সীমিত সম্পদ ও পরিমিতিবোধ বিবেচনা করে নিজের কাজ নিজে উৎসাহের সঙ্গে করতে সমর্থ হওয়া।	পরিবারের বিভিন্ন কাজ শনাক্ত করতে পারা এবং নিজের কাজসহ পরিবারের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করতে উদ্বুদ্ধ হওয়া।	পরিবার ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সদস্যের ভূমিকা ও দায়িত্ব শনাক্ত করতে পারা এবং দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সাশ্রয়ীভাবে পারিবারিক ও বিদ্যালয়ের কাজে অংশগ্রহণ করা।	সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের ভূমিকা ও দায়িত্ব বিশ্লেষণ করতে পারা এবং দায়িত্বশীলতার সঙ্গে নিজের ও পরিবারের কাজসহ বিদ্যালয় ও সামাজিক বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী হওয়া।	নিজ ও পরিবারিক কাজের দায়িত্ব আস্থার সঙ্গে পালন করা এবং বিদ্যালয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য শনাক্ত করে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া।	পারিবারিক আয় ও ব্যয় বিবেচনা করে পারিবারিক বাজেট প্রণয়ন করতে পারা এবং পরিবারের আর্থিক কাজে সহযোগিতা করতে পারা।	পারিবারিক আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অর্থ-সংশ্লিষ্ট কাজের (বাজেট প্রণয়ন, বাজার করা, সারা মাসের প্রয়োজনীয় জিনিসের যথাযথ তালিকা প্রণয়ন, বিল প্রদান, ব্যাংকিং ইত্যাদি) দায়িত্ব পরিকল্পনা মাফিক সম্পাদন করতে পারা।	পারিবারিক আয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারিবারিক আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আর্থিক সংশ্লিষ্ট কাজের (বাজেট প্রণয়ন, বাজার করা, সারা মাসের প্রয়োজনীয় জিনিসের যথাযথ তালিকা প্রণয়ন, বিল প্রদান, ব্যাংকিং ইত্যাদি) দায়িত্ব পরিকল্পনা মাফিক সম্পাদন করতে পারা।	পারিবারিক আয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পারিবারিক আয়ে অবদান রাখতে পারা।
						অভিভাবকের সহযোগিতায় স্কুল ব্যাঙ্কিংএর আওতায় সঞ্চয়ের নিমিত্তে স্কুল ব্যাঙ্কিং একাউন্ট খুলতে ও তা নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারা।	স্কুল ব্যাঙ্কিং একাউন্টের হিসাব যথাযথভাবে অনুধাবন করে তা সঠিকভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারা।	বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে বিদ্যালয় বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ এবং দক্ষতার সঙ্গে তা পালন করতে পারা।	বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইভেন্ট বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ ও সকলের সহযোগিতায় সুচারুভাবে সম্পাদন করতে পারা এবং আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব দাখিল করতে পারা।	বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইভেন্ট বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ ও সকলের সহযোগিতায় সততা, দক্ষতার ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে সম্পাদন করতে পারা এবং যথাযথ ফরম্যাট অনুযায়ী আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করতে পারা।
					ট্রেড সম্পর্কিত মৌলিক দক্ষতা (প্রি-ভোক ২) প্রদর্শন করতে পারা।			নির্দিষ্ট একটি ট্রেড সম্পর্কিত প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন করে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারা।		
				বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করতে পারা।	প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রভাব ও ধরন বিবেচনা করে ভবিষ্যত নতুন প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে সহজে স্বাগত জানাতে পারা এবং পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারা।	ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির (ভয়েস টেকনোলজি, বায়োমেট্রিক, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবটিক্স) প্রভাব বিশ্লেষণ করে নিজেকে তার সঙ্গে অভিযোজনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারা।	ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি (বিগ ডাটা, সাইবার সিকিউরিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ডিজিটাল মার্কেটিং, ব্লক চেইন, থ্রি-ডি প্রিন্টিং ইত্যাদি) সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে বাংলাদেশ ও বিশ্ব ব্যবস্থায় এর প্রভাব তত্ত্বানুসন্ধান করতে পারা।	শিল্পবিপ্লবের ফলে পরিবর্তিত ও নতুন পেশার উপযোগী দক্ষতাসমূহ বিশ্লেষণ করে তা অর্জনের উপায়সমূহ অনুসন্ধান করতে পারা।	নতুন প্রযুক্তির (ইন্টারনেট অব থিংস, বায়োমেট্রিক, ভয়েস টেকনোলজি, বিগ ডাটা, সাইবার সিকিউরিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ডিজিটাল মার্কেটিং, ব্লক চেইন, থ্রি-ডি প্রিন্টিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স রোবটিক্স ইত্যাদি) গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভবিষ্যৎ পেশায় এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্র অনুসন্ধান করতে পারা	নতুন প্রযুক্তি (ইন্টারনেট অব থিংস, বায়োমেট্রিক, ভয়েস টেকনোলজি, বিগ ডাটা, সাইবার সিকিউরিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ডিজিটাল মার্কেটিং, ব্লক চেইন, থ্রি-ডি প্রিন্টিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স রোবটিক্স ইত্যাদি) সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে করে নিজের ক্যারিয়ার প্ল্যানিং-এ তার প্রভাব বিশ্লেষণ

Working Draft

প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি	৯ম শ্রেণি	১০ম শ্রেণি
										করতে পারা এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারা।
								যুগোপযোগী চাহিদা ও আবিষ্কারের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে স্বপ্রণোদিত হয়ে ভবিষ্যৎ দক্ষতার উন্নয়নে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।	নির্বাচিত কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিস্থিতির ঝুঁকি বিশ্লেষণ করতে পারা এবং ঝুঁকি মোকাবেলা করার উপায় হিসেবে নিয়ত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারা।	নির্বাচিত কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিস্থিতির ঝুঁকি বিশ্লেষণ করতে পারা এবং ঝুঁকি মোকাবেলা করার উপায় হিসেবে নিয়ত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারা।
									স্ব-উদ্যোগী হয়ে আত্মপ্রতিফলনের (Self reflection) মাধ্যমে নতুন দক্ষতায় নিজেকে সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট হওয়া।	স্ব-উদ্যোগী হয়ে আত্মপ্রতিফলনের (Self reflection) মাধ্যমে নতুন দক্ষতায় নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারা

Working Draft

বিষয় : ধর্ম শিক্ষা

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

ধর্মের মৌলিক জ্ঞান, বিশ্বাস ও জ্ঞানের উৎসসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন ও ধারণ করতে পারা। সৃষ্টিজগতের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্বপালন এবং সম্প্রীতি বজায় রেখে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারা।

বিষয়ের ধারণায়ন

নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানা এবং ধর্মীয় জ্ঞান, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, বিধিবিধান ও অনুশাসন উপলব্ধি করে তা নিজ জীবনে অনুশীলন করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ধর্ম এক দিকে যেমন জীবনের অর্থ, মূল্য ও উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে সহায়তা করে তেমনি নিজেকে ও অন্যকে বুঝতেও সহায়তা করে । নিজেকে সৎ, নীতিবান, দায়িত্বশীল, দয়ালু ও মানবিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, নিন্দনীয় ও বর্জনীয় কাজ থেকে বিরত রেখে সহনশীল, অসাম্প্রদায়িক, শুদ্ধ মানুষ রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধর্মশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পাশাপাশি অন্যের ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করে শান্তিপূর্ণ সহবস্থান নিশ্চিত করতে ধর্মের নিগূঢ় মর্মবাণী উপলব্ধি করা জরুরি যা সঠিকভাবে ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতি এবং ধর্মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে অপব্যাখ্যা করে কেউ যেন মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করতে না পারে কিংবা কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হিংসা-বিদ্বেষ তৈরি করতে না পারে তার জন্যও সঠিকভাবে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করা জরুরি। উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সঠিকভাবে ধর্মশিক্ষার জন্য শিক্ষাক্রম রূপরেখায় ধর্মশিক্ষা বিষয়টিকে তিনটি পরস্পর-সংযুক্ত ক্ষেত্রের মাধ্যমে ধারণায়ন করা হয়েছে। ধর্মীয় জ্ঞান, ধর্মীয় বিধিবিধান এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ ক্ষেত্রের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয় এবং এ সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাসমূহ অর্জনকে প্রাধান্য দেয়া হবে – যা সার্বিকভাবে ধর্মীয় শিক্ষার যোগ্যতাসমূহ অর্জনে সহায়তা করবে।

ধর্মীয় জ্ঞান	ধর্মীয় মৌলিক জ্ঞান ও বিশ্বাস, জ্ঞান আহরণে আগ্রহ ও জ্ঞানের উৎস, জ্ঞান অন্বেষণ পদ্ধতি, জ্ঞানের ব্যবহার ও প্রয়োগ
ধর্মীয় বিধিবিধান	ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার জেনে ও উপলব্ধি করে চর্চা করা, ধর্মীয় অনুশাসনের গুরুত্ব ও অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য অনুধাবন
ধর্মীয় মূল্যবোধ	প্রশংসনীয় ও অনুসরণীয় আচরণ গ্রহণ ও চর্চা এবং নিন্দনীয় আচরণ বর্জন

ধর্মশিক্ষা বিষয়ের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় অনুশাসন ও বিধিবিধানের সৌন্দর্য উপলব্ধি ও চর্চায় অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে স্থিতিশীল, সৌহার্দ্যপূর্ণ সুখী সমাজ তথা বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব যা শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রাধান্য পেয়েছে।

বিষয় : ইসলাম ধর্ম শিক্ষা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখনক্রম

প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি	৯ম শ্রেণি	১০ম শ্রেণি
ধর্মীয় গল্প ও সহজ ছড়া জেনে ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধর্মীয় উৎসাহে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে পারা।	ইসলাম ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ (বয়স উপযোগী) জেনে ধর্মের প্রতি আগ্রহী হওয়া। ধর্মীয় উৎসাহে সকলের সঙ্গে সদাচরণ এবং মহান আল্লাহতায়ালার সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা।	ইসলাম ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ (বয়স উপযোগী) জেনে ও উপলব্ধি করে ধর্ম ও বিধিবিধান চর্চায় আগ্রহী হওয়া। ধর্মীয় উৎসাহে সকলের সঙ্গে সদাচরণ (মানবিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ ভাল আচরণ) এবং মহান আল্লাহতায়ালার সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা ও যথাযথ আচরণ করা।	মহান আল্লাহতায়ালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং ধর্মের গৌরবময় ঘটনাপ্রবাহ ও জীবনচরিত (বয়স উপযোগী) অনুধাবন করে ধর্ম ও বিধিবিধান চর্চায় আগ্রহী হওয়া এবং নিজেকে সৎ, বিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তুলতে পারা।	মহান আল্লাহতায়ালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ধর্ম ও বিধিবিধান অনুসরণ ও চর্চায় আগ্রহী ও উৎসাহী হওয়া। ধর্মীয় আচার ও মূল্যবোধ (সত্যবাদিতা, সততা, শ্রদ্ধা) চর্চার মাধ্যমে নিজেকে সৎ, বিনয়ী ও সহনশীল করে গড়ে তোলা এবং সৃষ্টিজগতের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে তাদের সেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত করা।	মহান আল্লাহতায়ালার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস এবং ইসলাম ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহের আলোকে (বয়স উপযোগী) ধর্মীয় সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করে ধর্ম ও বিধিবিধান চর্চায় উৎসাহী হওয়া। ধর্মীয় মূল্যবোধ (সত্যবাদিতা, সততা, শ্রদ্ধা, ত্যাগ ও ভ্রাতৃত্ববোধ) উপলব্ধি ও চর্চার মাধ্যমে নিজেকে বিনয়ী ও সহনশীল হিসেবে গড়ে তোলে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহাবস্থানে সক্ষম হওয়া। সৃষ্টিজগতের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান প্রদর্শন ও দায়িত্ব পালন করে তার সেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারা।	ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হওয়া, বয়সোপযোগী বিধি বিধান অনুসরণ ও চর্চা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ নিজ জীবনে প্রয়োগ ও চর্চা করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা এবং স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।	ইসলাম ধর্মের মৌলিক জ্ঞান, শরিয়তের উৎসসমূহ এবং জ্ঞান আহরণের পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের বয়স উপযোগী প্রাসঙ্গিক নির্দেশনা অনুসরণ, বিধি বিধান চর্চা এবং নিজ জীবনে মানবিক গুণাবলির প্রতিফলন ঘটিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে সৃষ্টির কল্যানে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখা।	ইসলাম ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ এবং এর মৌলিক নির্দেশনা জেনে ও উপলব্ধি করে নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকা এবং যেকোনো দ্বন্দ্ব-বিভ্রান্তি দূর করতে সঠিক তথ্যের জন্য পবিত্র কোরআন ও হাদিসের শরণাপন্ন হওয়া, ধর্মীয় বিধি-বিধান ও মূল্যবোধ অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে পরমতসহিষ্ণু হয়ে সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখা এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে পারস্পরিক কল্যাণকামিতা ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে পারা।	ইসলাম ধর্মের মূল উৎসসমূহ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান, ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে জেনে বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ করতে পারা, নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারা এবং ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে বিধিবিধান চর্চার মাধ্যমে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে মানুষ ও সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারা।	ইসলাম ধর্মের উৎস ও স্তম্ভসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য জেনে সুস্থ ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসরণ করা, ধর্মীয় চর্চা অব্যাহত রাখা এবং যেকোনো বিভ্রান্তি, অসহিষ্ণুতা ও দ্বন্দ্ব সংঘাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারা এবং প্রয়োজনে সঠিক ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করতে পারা। মানবিক ও নৈতিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে কল্যাণকর ভূমিকা রাখতে পারা।
ধর্মীয় গল্প, ঘটনা ও সহজ ছড়ার মাধ্যমে ধর্মের সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহী হতে পারা।	ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ (বয়স উপযোগী) জেনে নিজ ধর্মের প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারা	ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ (বয়স উপযোগী) জেনে ও উপলব্ধি করে নিজ ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হতে পারা এবং চর্চায় আগ্রহী হতে পারা।	ইসলাম ধর্মের ঘটনাপ্রবাহ, আদর্শ ও উপমাবলি অনুধাবন এবং সৃষ্টিজগতকে পর্যবেক্ষণ করে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অনুভব করা এবং তাঁকে ভালোবেসে সহজ-সরল বিধান অনুশীলন করতে পারা।	মহান আল্লাহতায়ালার গুণাবলি সম্পর্কে জেনে তাঁর প্রতি আস্থাশীল হয়ে নিজ ধর্ম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারা এবং অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে উদার মনোভাব প্রকাশ করতে পারা।	মহান আল্লাহতায়ালার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন এবং ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে ধর্মের রীতিনীতি মেনে চলতে পারা	ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা	শরিয়তের উৎসসমূহ হতে ইসলাম ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে কোরআন ও হাদিসের (বয়স উপযোগী) নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা	ইসলাম ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ জেনে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে ধর্মের (কোরআন ও হাদিসের) নির্দেশনার আলোকে যে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করে নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকতে পারা।	ইসলাম ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান, ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে জেনে নির্দেশনার আলোকে নৈতিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন হতে পারা।	ইসলাম ধর্মের উৎস ও স্তম্ভসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য জেনে প্রাত্যাহিক জীবনে ধর্মীয় রীতিনীতির অনুশীলন করতে পারা এবং যেকোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে উৎসসমূহ থেকে সঠিক নির্দেশনা অনুসন্ধান করতে পারা।
ধর্মীয় গল্প ও ঘটনাবলির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করতে পারা।	ইসলামের ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ মানবিক সম্পর্ক তৈরি ও বজায় রাখতে পারা।	ইসলামের ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সঙ্গে ভালো আচরণ করা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি ও বজায় রাখতে পারা	ইসলামের ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সৎ ও বিশ্বাসী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারা।	ধর্মীয় আচার ও বিধি-বিধান অনুশীলনে আগ্রহী হওয়া এবং নিজেকে বিনয়ী ও সহনশীল করে গড়ে তুলতে পারা	ইসলাম ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ও ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং ধর্মের সৌন্দর্য অনুধাবন করে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ এবং নিজ জীবনে তা চর্চা করতে পারা।	ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগী) অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা।	ইসলাম ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা।	ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা।	ইবাদতের শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারা	ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ, সৌন্দর্য্য অনুধাবন ও বিধিবিধান চর্চা করে সুষ্ঠু ও সুশৃংখল জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারা।
	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারা।	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মহান আল্লাহতায়ালার সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে তার প্রতি যথাযথ আচরণ ও যত্ন করতে পারা	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে দায়িত্বশীল হতে পারা	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ ও প্রকৃতিকে ভালোবাসতে পারা এবং তাদের সেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারা।	ইসলামের মূল্যবোধ (সত্যবাদিতা, সততা, শ্রদ্ধা, ত্যাগ ও ভ্রাতৃত্ববোধ) উপলব্ধি, ধারণ ও চর্চার মাধ্যমে নিজেকে বিনয়ী ও সহনশীল হিসেবে গড়ে তুলতে পারা এবং সৃষ্টিজগতের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান প্রদর্শন ও সেবার মাধ্যমে নিজ পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটে তার প্রয়োগ করতে পারা	ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা।	ইসলাম ধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা।	ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে সম্প্রীতি বজায় রেখে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে জীবনযাপন করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা	ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা।	ইসলাম ধর্মের উৎস ও স্তম্ভসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ধর্মের প্রাসঙ্গিক নির্দেশনার মাধ্যমে কোরআন ও হাদিস থেকে সঠিক তথ্য জেনে যে কোনো বিভ্রান্তি, অসহিষ্ণুতা ও দ্বন্দ্ব সংঘাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে সঠিক ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করতে পারা এবং মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজের কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারা।

বিষয়: হিন্দু ধর্ম শিক্ষা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখনক্রম

প্রাক প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি	৯ম শ্রেণি	১০ম শ্রেণি
ধর্মীয় গল্প,ঘটনা ও সহজ ছড়া কবিতা জেনে ধর্মের সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধর্মীয় উৎসাহে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে পারা।	ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ (বয়স উপযোগী) জেনে ধর্মের প্রতি আগ্রহী হওয়া। ধর্মীয় উৎসাহে সকলের সঙ্গে সদাচরণ (বন্ধুত্ব) এবং সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টজগতের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা।	ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ (বয়স উপযোগী) জেনে ও উপলব্ধি করে ধর্ম ও বিধি-বিধান চর্চায় আগ্রহী হওয়া। ধর্মীয় উৎসাহে সকলের সঙ্গে সদাচরণ (মানবিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ ভাল আচরণ) এবং সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টজগতের প্রতি ভালোবাসা ও যথাযথ আচরণ করা।	মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ ও জীবনচরিত (বয়স উপযোগী) অনুধাবন করে ধর্ম ও বিধি-বিধান চর্চায় আগ্রহি হওয়া এবং নিজেকে সৎ, বিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তুলতে পারা।	মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ধর্ম ও বিধি-বিধান অনুসরণ ও চর্চায় আগ্রহী ও উৎসাহী হওয়া। ধর্মীয় আচার ও মূল্যবোধ (সত্যবাদিতা, সততা, শ্রদ্ধা) চর্চার মাধ্যমে নিজেকে সৎ, বিনয়ী ও সহনশীল করে গড়ে তোলা এবং সৃষ্টিজগতের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করে তাদের সেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত করা।	মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস এবং ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহের আলোকে (বয়স উপযোগী) ধর্মীয় সৌন্দর্য উপলব্ধি করে ধর্ম ও বিধি-বিধান চর্চায় উৎসাহী হওয়া। ধর্মীয় মূল্যবোধ (সত্যবাদিতা, সততা, শ্রদ্ধা, ত্যাগ ও ভ্রাতৃত্ববোধ) উপলব্ধি ও চর্চার মাধ্যমে নিজেকে বিনয়ী ও সহনশীল হিসেবে গড়ে তোলে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহাবস্থানে সক্ষম হওয়া। সৃষ্টিজগতের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান প্রদর্শণ ও দায়িত্ব পালন করে তার সেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারা।	হিন্দু ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হওয়া, বয়সোপযোগী বিধি-বিধান অনুসরণ ও চর্চা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ নিজ জীবনে প্রয়োগ ও চর্চা করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা এবং স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।	হিন্দু ধর্মের মৌলিক জ্ঞান, জ্ঞানের উৎসসমূহ এবং জ্ঞান আহরণের পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে ধর্মগ্রন্থের বয়স উপযোগী প্রাসঙ্গিক নির্দেশনা অনুসরণ, বিধি বিধান চর্চা এবং নিজ জীবনে মানবিক গুণাবলির প্রতিফলন ঘটিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে সৃষ্টির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখা।	হিন্দু ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ এবং এর মৌলিক নির্দেশনা জেনে ও উপলব্ধি করে নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকা ও যে কোন দ্বন্দ্ব বিভ্রান্তি দূর করতে সঠিক তথ্যের জন্য ধর্মগ্রন্থের শরণাপন্ন হওয়া, ধর্মীয় বিধি-বিধান ও মূল্যবোধ অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে পরমতসহিষ্ণু হয়ে সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখা এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে পারস্পরিক কল্যাণকামিতা সম্প্রীতি বজায় রাখতে পারা।	হিন্দু ধর্মের মূল উৎসসমূহ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান , ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা সর্ম্পকে জেনে বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ করতে পারা, নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারা এবং ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে বিধি-বিধান চর্চার মাধ্যমে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে মানুষ ও সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারা।	হিন্দু ধর্মের উৎস, গুরুত্ব ও তাৎপর্য জেনে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসরণ করা, ধর্মীয় চর্চা অব্যাহত রাখা এবং যেকোন বিভ্রান্তি, অসহিষ্ণুতা ও দ্বন্দ্ব সংঘাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারা এবং প্রয়োজনে সঠিক ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করতে পারা। মানবিক ও নৈতিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে কল্যাণকর ভূমিকা রাখতে পারা।
ধর্মীয় গল্প, ঘটনা ও সহজ ছড়ার মাধ্যমে ধর্মের সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহী হতে পারা।	ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ (বয়স উপযোগী) জেনে নিজ ধর্মের প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারা	ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ (বয়স উপযোগী) জেনে ও উপলব্ধি করে নিজ ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হতে পারা এবং চর্চায় আগ্রহী হতে পারা।	ধর্মীয় ঘটনাপ্রবাহ, আদর্শ ও উপমাবলি অনুধাবন এবং সৃষ্টিজগতকে পর্যবেক্ষণ করে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অনুভব করা এবং তাঁকে ভালোবেসে সহজ-সরল বিধান অনুশীলন করতে পারা।	সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও গুণাবলি অনুভব ও উপলব্ধি করে তাঁর প্রতি আস্থাশীল হয়ে নিজ ধর্ম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারা এবং অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ এবং উদার মনোভাব প্রকাশ করতে পারা।	মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন এবং ধর্মের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে ধর্মের রীতিনীতি মেনে চলতে পারা	হিন্দু ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা	ধর্মীয় উৎসসমূহ হতে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে ধর্মগ্রন্থের (বয়স উপযোগী) নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা	হিন্দু ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ জেনে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে ধর্মের (ধর্মগ্রন্থের) নির্দেশনার আলোকে যে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করে নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকতে পারা।	হিন্দু ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান, ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা সর্ম্পকে জেনে নির্দেশনার আলোকে নৈতিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন হতে পারা।	হিন্দু ধর্মের উৎস ও স্তম্ভসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য জেনে প্রাত্যাহিক জীবনে ধর্মীয় রীতিনীতির অনুশীলন করতে পারা এবং যেকোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে উৎসসমূহ হতে সঠিক নির্দেশনা অনুসন্ধান করতে পারা।
ধর্মীয় গল্প ও ঘটনাবলির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করতে পারা।	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ মানবিক সম্পর্ক তৈরি ও বজায় রাখতে পারা।	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সঙ্গে ভালো আচরণ করা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি ও বজায় রাখতে পারা	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সৎ ও বিশ্বাসী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারা।	ধর্মীয় আচার ও বিধি-বিধান অনুশীলনে আগ্রহী হওয়া এবং নিজেকে বিনয়ী ও সহনশীল করে গড়ে তুলতে পারা	ধর্মের গৌরবময় অধ্যায় ও ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং ধর্মের সৌন্দর্য অনুধাবন করে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ এবং নিজ জীবনে তা চর্চা করতে পারা।	হিন্দু ধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগী) অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা।	হিন্দু ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা।	ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা।	ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা এবং রীতিনীতি অনুসরণের শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারা	হিন্দু ধর্মের মৌলিক বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ, সৌন্দর্য অনুধাবন ও বিধি-বিধান চর্চা করে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারা।
	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারা।	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে তার প্রতি যথাযথ আচরণ ও যত্ন করতে পারা	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে দায়িত্বশীল হতে পারা	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ ও প্রকৃতিকে ভালোবাসতে পারা এবং তাদের সেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারা।	ধর্মীয় মূল্যবোধ (সত্যবাদিতা, সততা, শ্রদ্ধা, ত্যাগ ও ভ্রাতৃত্ববোধ) উপলব্ধি, ধারণ ও চর্চার মাধ্যমে নিজেকে বিনয়ী ও সহনশীল হিসেবে গড়ে তুলতে পারা এবং সৃষ্টিজগতের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান প্রদর্শন ও সেবার মাধ্যমে নিজ পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটে তার প্রয়োগ করতে পারা	ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সংগে সহাবস্থান করতে পারা।	হিন্দু ধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা।	ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে সম্প্রীতি বজায় রেখে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে জীবনযাপন করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা	ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা।	হিন্দু ধর্মের উৎস, গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ধর্মের প্রাসঙ্গিক নির্দেশনার মাধ্যমে (ধর্মগ্রন্থের) সঠিক তথ্য জেনে যেকোনো বিভ্রান্তি, অসহিষ্ণুতা ও দ্বন্দ্ব সংঘাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে সঠিক ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করতে পারা এবং মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজের কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারা।

বিষয় : খ্রিস্ট ধর্ম শিক্ষা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখনক্রম

প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি	৯ম শ্রেণি	১০ম শ্রেণি
ধর্মীয় গল্প ও সহজ ছড়ার মাধ্যমে ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধর্মীয় উৎসাহে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করতে পারা।	ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ (বয়স উপযোগী) জেনে ধর্মের প্রতি আগ্রহী হওয়া। ধর্মীয় উৎসাহে সকলের সঙ্গে সদাচরণ এবং সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা।	ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ (বয়স উপযোগী) জেনে ও উপলব্ধি করে ধর্ম ও বিধি-বিধান চর্চায় আগ্রহী হওয়া। ধর্মীয় উৎসাহে সকলের সঙ্গে সদাচরণ (মানবিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ ভাল আচরণ) এবং সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা ও যথাযথ আচরণ করা।	মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং ধর্মের গৌরবময় ঘটনাপ্রবাহ ও জীবনচরিত (বয়স উপযোগী) অনুধাবন করে ধর্ম ও বিধি-বিধান চর্চায় আগ্রহি হওয়া এবং নিজেকে সৎ, বিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তুলতে পারা।	মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ধর্ম ও বিধিবিধান অনুসরণ ও চর্চায় আগ্রহী ও উৎসাহী হওয়া। ধর্মীয় আচার ও মূল্যবোধ (সত্যবাদিতা, সততা, শ্রদ্ধা) চর্চার মাধ্যমে নিজেকে সৎ, বিনয়ী ও সহনশীল করে গড়ে তোলা এবং সৃষ্টিজগতের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করে তাদের সেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত করা।	মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস এবং ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহের আলোকে (বয়স উপযোগী) ধর্মীয় সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করে ধর্ম ও বিধি-বিধান চর্চায় উৎসাহি হওয়া। ধর্মীয় মূল্যবোধ (সত্যবাদিতা, সততা, শ্রদ্ধা, ত্যাগ ও ভ্রাতৃত্ববোধ) উপলব্ধি ও চর্চার মাধ্যমে নিজেকে বিনয়ী ও সহনশীল হিসেবে গড়ে তোলে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহাবস্থানে সক্ষম হওয়া। সৃষ্টিজগতের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান প্রদর্শন ও দায়িত্ব পালন করে তার সেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারা।	খ্রিস্ট ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হওয়া, বয়সোপযোগী বিধি-বিধান অনুসরণ ও চর্চা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ নিজ জীবনে প্রয়োগ ও চর্চা করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা এবং স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।	খ্রিস্ট ধর্মের মৌলিক জ্ঞান, জ্ঞানের উৎসসমূহ এবং জ্ঞান আহরণের পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে ধর্মগ্রন্থের বয়স উপযোগী প্রাসঙ্গিক নির্দেশনা অনুসরণ, বিধি-বিধান চর্চা এবং নিজ জীবনে মানবিক গুণাবলির প্রতিফলন ঘটিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে সৃষ্টির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখা।	খ্রিস্ট ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ এবং এর মৌলিক নির্দেশনা জেনে ও উপলব্ধি করে নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকা ও যে কোন দ্বন্দ্ব বিভ্রান্তি দূর করতে সঠিক তথ্যের জন্য ধর্মগ্রন্থের শরণাপন্ন হওয়া, ধর্মীয় বিধি-বিধান ও মূল্যবোধ অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে পরমতসহিষ্ণু হয়ে সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখা এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে পারস্পরিক কল্যাণকামিতা সম্প্রীতি বজায় রাখতে পারা।	খ্রিস্ট ধর্মের মূল উৎসসমূহ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান , ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা সর্ম্পকে জেনে বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ করতে পারা, নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারা এবং ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে বিধি-বিধান চর্চার মাধ্যমে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে মানুষ ও সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারা।	খ্রিস্ট ধর্মের উৎস ও স্তম্ভসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য জেনে সুস্থ ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসরণ করা, ধর্মীয় চর্চা অব্যাহত রাখা এবং যেকোনো বিভ্রান্তি, অসহিষ্ণুতা ও দ্বন্দ্ব সংঘাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারা এবং প্রয়োজনে সঠিক ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করতে পারা। মানবিক ও নৈতিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে কল্যাণকর ভূমিকা রাখতে পারা।
ধর্মীয় গল্প, ও সহজ ছড়ার মাধ্যমে ধর্মের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি আগ্রহী হতে পারা।	ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ (বয়স উপযোগী) জেনে নিজ ধর্মের প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারা	ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ (বয়স উপযোগী) জেনে ও উপলব্ধি করে নিজ ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হতে পারা এবং চর্চায় আগ্রহী হতে পারা	ধর্মীয় ঘটনাপ্রবাহ, আদর্শ ও উপমাবলি অনুধাবন এবং সৃষ্টিজগতকে পর্যবেক্ষণ করে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অনুভব করা এবং তাঁকে ভালোবেসে সহজ-সরল বিধান অনুশীলন করতে পারা	সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি ও গুণাবলী অনুভব ও উপলব্ধি করে তাঁর প্রতি আস্থাশীল হয়ে নিজ ধর্ম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারা এবং অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ এবং উদার মনোভাব প্রকাশ করতে পারা।	মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন এবং ধর্মের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে ধর্মের রীতিনীতি মেনে চলতে পারা	ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরনে আগ্রহী হতে পারা	খ্রিস্ট ধর্মীয় উৎসসমূহ হতে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে ধর্মগ্রন্থের (বয়স উপযোগী) নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা	খ্রিস্ট ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ জেনে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে ধর্মের (ধর্মগ্রন্থের) নির্দেশনার আলোকে যে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করে নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকতে পারা।	খ্রিস্ট ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান, ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা সর্ম্পকে জেনে নির্দেশনার আলোকে নৈতিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন হতে পারা।	খ্রিস্ট ধর্মের উৎস ও স্তম্ভসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য জেনে প্রাত্যাহিক জীবনে ধর্মীয় রীতিনীতির অনুশীলন করতে পারা এবং যেকোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বে উৎসসমূহ হতে সঠিক নির্দেশনা অনুসন্ধান করতে পারা।
ধর্মীয় গল্প ও ঘটনাবলির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করতে পারা।	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ মানবিক সম্পর্ক তৈরি ও বজায় রাখতে পারা।	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সঙ্গে ভালো আচরণ করা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি ও বজায় রাখতে পারা	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সৎ ও বিশ্বাসী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারা।	ধর্মীয় আচার ও বিধি-বিধান অনুশীলনে আগ্রহী হওয়া এবং নিজেকে বিনয়ী ও সহনশীল করে গড়ে তুলতে পারা	ধর্মের গৌরবময় অধ্যায় ও ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং ধর্মের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ এবং নিজ জীবনে তা চর্চা করতে পারা।	খ্রিস্ট ধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগী) অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা।	খ্রিস্ট ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা।	খ্রিস্ট ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা।	ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা এবং রীতিনীতি অনুসরণের শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারা	খ্রিস্ট ধর্মের মৌলিক বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ, সৌন্দর্য অনুধাবন ও বিধি-বিধান চর্চা করে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারা।
	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারা।	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে তার প্রতি যথাযথ আচরণ ও যত্ন করতে পারা	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে দায়িত্বশীল হতে পারা	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ ও প্রকৃতিকে ভালোবাসতে পারা এবং তাদের সেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারা।	ধর্মীয় মূল্যবোধ (সত্যবাদিতা, সততা, শ্রদ্ধা, ত্যাগ ও ভ্রাতৃত্ববোধ) উপলব্ধি, ধারণ ও চর্চার মাধ্যমে নিজেকে বিনয়ী ও সহনশীল হিসেবে গড়ে তুলতে পারা এবং সৃষ্টিজগতের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান প্রদর্শন ও সেবার মাধ্যমে নিজ পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটে তার প্রয়োগ করতে পারা	ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সংগে সহাবস্থান করতে পারা।	খ্রিস্ট ধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা।	ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে সম্প্রীতি বজায় রেখে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে জীবনযাপন করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা	ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা।	খ্রিস্ট ধর্মের উৎস ও স্তম্ভসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ধর্মের প্রাসঙ্গিক নির্দেশনার মাধ্যমে (ধর্মগ্রন্থের) সঠিক তথ্য জেনে যেকোনো বিভ্রান্তি, অসহিষ্ণুতা ও দ্বন্দ্ব সংঘাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে সঠিক ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করতে পারা এবং মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজের কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারা।

Workings

বিষয় : বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখনক্রম

প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি	৯ম শ্রেণি	১০ম শ্রেণি
ধর্মীয় গল্প, ঘটনা ও সহজ ছড়া কবিতা জেনে ধর্মের সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধর্মীয় উৎসাহে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে পারা।	ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ (বয়স উপযোগী) জেনে ধর্মের প্রতি আগ্রহী হওয়া। ধর্মীয় উৎসাহে সকলের সঙ্গে সদাচরণ (বন্ধুত্ব) এবং জগৎ ও জীবের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা।	ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ (বয়স উপযোগী) জেনে ও উপলব্ধি করে ধর্ম ও বিধি-বিধান চর্চায় আগ্রহী হওয়া। ধর্মীয় উৎসাহে সকলের সঙ্গে সদাচরণ (মানবিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ ভাল আচরণ) এবং জগৎ ও জীবের প্রতি ভালোবাসা ও যথাযথ আচরণ করা।	মহান বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের আদর্শের প্রতি ব্রতী হয়ে এবং ধর্মের গৌরবময় ঘটনাপ্রবাহ ও জীবনচরিত (বয়স উপযোগী) অনুধাবন করে ধর্ম ও বিধি-বিধান চর্চায় আগ্রহি হওয়া এবং নিজেকে সৎ, বিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তুলতে পারা।	মহান বুদ্ধের গুণাবলির প্রতি শ্রদ্ধা স্থাপন করে ধর্ম ও বিধিবিধান অনুসরণ ও চর্চায় আগ্রহী ও উৎসাহী হওয়া। ধর্মীয় আচার ও মূল্যবোধ (সত্যবাদিতা, সততা, শ্রদ্ধা) চর্চার মাধ্যমে নিজেকে সৎ, বিনয়ী ও সহনশীল করে গড়ে তোলা এবং জগৎ ও সর্বজীবের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করে তাদের সেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত করা।	বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এবং ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহের আলোকে (বয়স উপযোগী) ধর্মীয় সৌন্দর্য উপলব্ধি করে ধর্ম ও বিধি-বিধান চর্চায় উৎসাহী হওয়া। ধর্মীয় মূল্যবোধ (সত্যবাদিতা, সততা, শ্রদ্ধা, ত্যাগ ও ভ্রাতৃত্ববোধ) উপলব্ধি ও চর্চার মাধ্যমে নিজেকে বিনয়ী ও সহনশীল হিসেবে গড়ে তোলে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহাবস্থানে সক্ষম হওয়া। জগৎ ও সর্বজীবের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান প্রদর্শণ ও দায়িত্ব পালন করে তার সেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারা।	বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হওয়া, বয়সোপযোগী বিধি বিধান অনুসরণ ও চর্চা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ নিজ জীবনে প্রয়োগ ও চর্চা করে শান্তিপূর্ণ সহবস্থান করতে পারা এবং স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।	বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান, জ্ঞানের উৎসসমূহ এবং জ্ঞান আহরণের পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে ধর্মগ্রন্থের বয়স উপযোগী প্রাসঙ্গিক নির্দেশনা অনুসরণ, বিধি বিধান চর্চা এবং নিজ জীবনে মানবিক গুণাবলির প্রতিফলন ঘটিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে জগৎ ও জীবের কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখা।	বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ এবং এর মৌলিক নির্দেশনা জেনে ও উপলব্ধি করে নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকা ও যে কোন দ্বন্দ্ব বিভ্রান্তি দূর করতে সঠিক তথ্যের জন্য ধর্মগ্রন্থের শরণাপন্ন হওয়া, ধর্মীয় বিধি-বিধান ও মূল্যবোধ অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে পরমতসহিষ্ণু হয়ে জীব জগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখা এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে পারস্পরিক কল্যাণকামিতা সম্প্রীতি বজায় রাখতে পারা।	বৌদ্ধ ধর্মের মূল উৎসসমূহ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান, ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা সর্ম্পকে জেনে বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ করতে পারা, নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারা এবং ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে বিধিবিধান চর্চার মাধ্যমে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে মানুষ ও সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারা।	বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ, সৌন্দর্য অনুধাবন ও বিধি-বিধান চর্চা করে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারা।
ধর্মীয় গল্প, ঘটনা ও সহজ ছড়ার মাধ্যমে ধর্মের সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহী হতে পারা।	ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ (বয়স উপযোগী) জেনে নিজ ধর্মের প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারা	ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ (বয়স উপযোগী) জেনে ও উপলব্ধি করে নিজ ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হতে পারা এবং চর্চায় আগ্রহী হতে পারা	ধর্মীয় ঘটনাপ্রবাহ, আদর্শ ও উপমাবলী অনুধাবন এবং ব্রহ্মাণ্ডকে পর্যবেক্ষণ করে জগৎ ও জীবনের গুরুত্ব/মূল্যবোধ অনুভব করা এবং সে আদর্শে সহজ-সরল বিধান অনুশীলন করতে পারা	বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের গুণাবলি অনুভব ও উপলব্ধি করে সে আদর্শে অনুপ্রাণিত ও আস্থাশীল হয়ে নিজ ধর্ম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারা এবং অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ এবং উদার মনোভাব প্রকাশ করতে পারা	বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন এবং ধর্মের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে ধর্মের রীতিনীতি মেনে চলতে পারা	বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা	ধর্মীয় উৎসসমূহ হতে ধর্মের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে ধর্মগ্রন্থের (বয়স উপযোগী) নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা	বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ জেনে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে ধর্মের (ধর্মগ্রন্থের) নির্দেশনার আলোকে যে কোন দ্বিধা- দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করে নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকতে পারা।	বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান, ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা সর্ম্পকে জেনে নির্দেশনার আলোকে নৈতিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন হতে পারা।	বৌদ্ধ ধর্মের উৎস ও আচার অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য জেনে প্রাত্যাহিক জীবনে ধর্মীয় রীতিনীতির অনুশীলন করতে পারা এবং যেকোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে উৎসসমূহ হতে সঠিক নির্দেশনা অনুসন্ধান করতে পারা।
ধর্মীয় গল্প ও ঘটনাবলির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করতে পারা	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ মানবিক সম্পর্ক তৈরি ও বজায় রাখতে পারা	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে ভালো আচরণ করা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি ও বজায় রাখতে পারা	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সৎ ও বিশ্বাসী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারা।	ধর্মীয় আচার ও বিধি-বিধান অনুশীলনে আগ্রহী হওয়া এবং নিজেকে বিনয়ী ও সহনশীল করে গড়ে তুলতে পারা	বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ও ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং ধর্মের সৌন্দর্য অনুধাবন করে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ এবং নিজ জীবনে তা চর্চা করতে পারা।	বৌদ্ধ ধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগী) অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা।	বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধি বিধান চর্চা করতে পারা।	ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে জীব জগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা।	ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চা এবং রীতিনীতি অনুসরণের শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারা	
	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে জগৎ ও জীবের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারা।	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে জগৎ ও জীবের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে তার প্রতি যথাযথ আচরণ ও যত্ন করতে পারা	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে দায়িত্বশীল হতে পারা	ধর্মীয় ঘটনা ও জীবনচরিত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ ও প্রকৃতিকে ভালোবাসতে পারা এবং তাদের সেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারা।	ধর্মীয় মূল্যবোধ (সত্যবাদিতা, সততা, শ্রদ্ধা, ত্যাগ ও ভ্রাতৃত্ববোধ) উপলব্ধি, ধারণ ও চর্চার মাধ্যমে নিজেকে বিনয়ী ও সহনশীল হিসেবে গড়ে তুলতে পারা এবং জগৎ ও জীবের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান প্রদর্শন ও সেবার মাধ্যমে নিজ পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটে তার প্রয়োগ করতে পারা	ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে জগৎ ও জীবের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা	বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পারা		ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে বিভ্রান্তি, অসহিষ্ণুতা ও দ্বন্দ্ব সংঘাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে, সম্প্রীতি বজায় রেখে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে জীবনযাপন করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা	

Working

বিষয় : ভালো থাকা (Wellbeing)

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

বয়সভিত্তিক অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা এবং এর চ্যালেঞ্জ সঠিকভাবে মোকাবেলা করে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও সুরক্ষিত থেকে নিজে সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপন করতে পারা ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারা। নিজের ও অন্যের মতামত ও অবস্থানকে সম্মান করে ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পারবারিক, সামাজিক ও বৈশ্বিক পরিসরে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সক্রিয় ও মানবিক নাগরিক হিসেবে অবদান রাখা ।

বিষয়ের ধারণায়ন

অন্তঃ ও আন্তঃব্যক্তিক পরিবর্তন এবং প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে নিজ স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সকলকে নিয়ে ভালো থাকা প্রতিটি মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নিজে ভালো থাকার এবং অন্যকে ভালো রাখার উপর মানুষের স্বপ্ন ও ভবিষ্যত জীবন অনেকাংশে নির্ভর করে যা সুস্থ সমাজ এবং নিরাপদ ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়তেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতোপূর্বে ভালো থাকা এবং এ সংক্রান্ত যোগ্যতাসমূহকে একাডেমিক শিক্ষার অংশ কিংবা সহ বা অতিরিক্ত শিক্ষাক্রমিক কাজ হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। কিন্তু অন্তঃ ও আন্তঃব্যক্তিক পরিবর্তনের প্রভাব পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে ইতিবাচকভাবে মোকাবেলা করে সকলকে নিয়ে ভালো থেকে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকের কিছু বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। এই যোগ্যতাসমূহ আপনা-আপনি তৈরি হয় না, বরং শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য-বিষয়ক শিক্ষা ও পরিচর্যার পাশাপাশি চ্যালেঞ্জিং, উপভোগ্য, সমসাময়িক, সক্রিয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হয়। এই অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীরা নিজের এবং অন্যের বৈশিষ্ট্য, সামর্থ্য, সীমাবদ্ধতা, আবেগ, অনুভূতি পছন্দ ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণার ভিত্তিতে নিজেকে বুঝে এবং অন্যের অবস্থান অনুধাবন করে ইতিবাচক, কার্যকরী যোগাযোগ ও সম্পর্ক ব্যবস্থাপনাসহ তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে নিয়ে সফল ও আনন্দময় জীবনযাপন করতে পারে।

ভালো থাকা বিষয়টি ধারণায়নে প্রতিক্রিয়াভিত্তিক (Reactive) উদ্যোগের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ ক্ষমতায়ন (Empowerment) কৌশল বিবেচনা করা হয়েছে যা সময়সাপেক্ষ হলেও শিক্ষার্থীদের কঠিন বাধা দূর করে ভিতর থেকে আত্মবিশ্বাসী ও মানবিক মানুষ হিসেবে টিকে থাকতে (resilient) সহায়তা করে। এ সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাসমূহ অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজ ও অন্যের আবেগ ও অনুভূতি অনুধাবন করে ভাব বিনিময় ও মত প্রকাশ, কার্যকর অংশগ্রহণ, আত্মবিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন, সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা (বজায় রাখা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ছিন্ন করা), সফলতা ও ব্যর্থতা অনুধাবন ও ইতিবাচকভাবে মোকাবেলা, আবেগ ও মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা সর্বোপরি আত্ম-পরিচর্যার মাধ্যমে নিজেকে সুস্থ, সংবেদনশীল ও পরিশীলিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানুষ, সমাজ ও পৃথিবীর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা অন্যের আবেগ, অনুভূতি, আনন্দ, বেদনা অনুধাবন করে সমব্যথা বা সম-আনন্দ অনুভব করে এবং সকল প্রকার ঝুঁকি, দ্বন্দ্ব, হতাশা, ক্ষোভ, বিদ্বেষ নিরসনের মাধ্যমে মানব ও প্রকৃতি সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে অর্থবহ জীবনযাপনের মাধ্যমে ভালো থাকতে পারে।

Working Draft

বিষয়ের যৌক্তিকতা, গুরুত্ব এবং ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনায় নিম্নলিখিতভাবে এর ধারণায়ন করা হয়েছে।

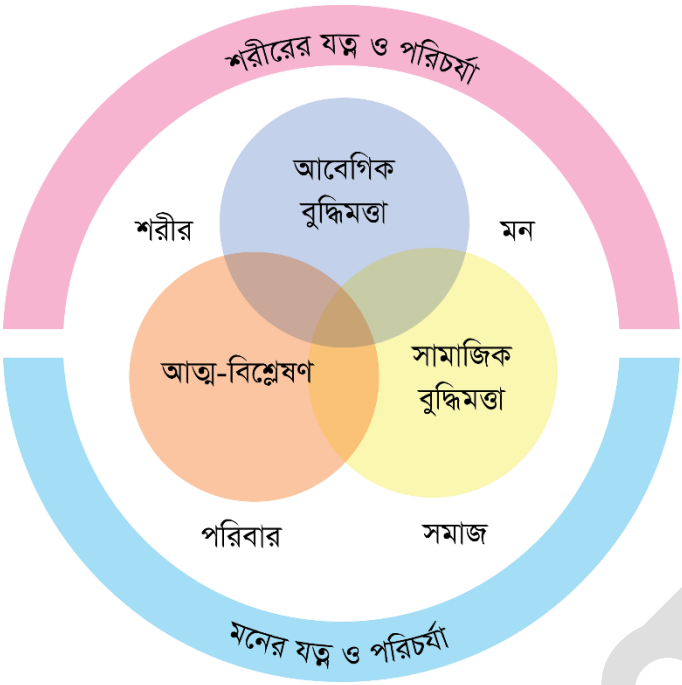

শরীর ও মনের যত্ন ও পরিচর্যা: ভালো থাকার গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হলো নিজের পরিচর্যা অর্থাৎ নিজেকে ভালোবেসে শরীর ও মনের যত্ন ও পরিচর্যা করা। শিক্ষার্থীর শরীর, মন এবং পরিবেশের প্রতিনিয়ত অন্তঃ ও আন্তঃ মিথস্ক্রিয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতির স্বাস্থ্যকর, ইতিবাচক, সংবেদনশীল ও কার্যকরী ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিনিয়ত নিজের যত্ন ও পরিচর্যা করা প্রয়োজন। সুতরাং নিরবিচ্ছিন্নভাবে আত্ম-পরিচর্যা করতে পারার যোগ্যতা প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য অত্যাবশ্যক। **দৈনন্দিন এবং বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি ও খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চা ও খেলাধুলা, রোগ ও দুর্ঘটনা, ঝুঁকি মোকাবেলা, সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা, চাপ মোকাবেলা, শখ ও বিনোদন, অংশগ্রহণ, স্বেচ্ছা সেবা ইত্যাদি সার্বিকভাবে আত্ম-পরিচর্যার অংশ**। আত্ম-পরিচর্যায় শরীর ও মনের সঙ্গে পরিবার ও সমাজের মিথস্ক্রিয়ার প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই নিজে ভালো থাকার অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে অন্যকেও ভালো রাখা। যথাযথভাবে জেনে, বুঝে, অনুধাবন ও উপলব্ধি করে কার্যকরী আত্ম-পরিচর্যা করতে হলে নিম্নবর্ণিত সক্ষমতাসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১. **আবেগিক বুদ্ধিমত্তা** : নিজের আবেগ অনুভূতির অনুধাবন ও উপলব্ধি, ইতিবাচকভাবে প্রকাশ ও ব্যবস্থাপনাসহ অন্যের আবেগ ও অনুভূতি বোঝা এবং তা সম্মান করে যৌক্তিক ও স্বাস্থ্যকর যোগাযোগ ও ব্যবস্থাপনা করতে পারা এবং ধৈর্য্য ও সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করার যোগ্যতা এই ধরণের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত। চিন্তাকে যৌক্তিক, বিশ্লেষণধর্মী ও গঠনমূলক রেখে, প্রাধিকার নির্ধারণ করে ইতিবাচকভাবে ভূমিকা রাখতে পারাও এই যোগ্যতাসমূহের অংশ।

২. **আত্ম-বিশ্লেষণ** : নিজের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি, সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করে বিশ্লেষণ ও যৌক্তিক মুল্যায়নের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ, মূল্যায়নকে বিশ্লেষণধর্মী ও গঠনমূলক রেখে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া, অনুভূতি ও আচরণের সঙ্গে সম্পর্ক এবং প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ সহায়তা চাইতে পারা ইত্যাদি এই ধরনের যোগ্যতাসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

৩. **সামাজিক বুদ্ধিমত্তা** : সমাজের সক্রিয় সদস্য হিসেবে সকলের সংগে থেকে সামাজিক কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক অংশগ্রহণ ও ভূমিকা রাখা এবং নিজের কার্যক্রম ও ভূমিকায় সন্তুষ্ট থেকে নিজেকে শ্রদ্ধা করা ও ভালোবাসতে পারার জন্য সামাজিক বুদ্ধিমত্তা সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজের এবং অন্যের সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করে যৌক্তিকভাবে আত্ম-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক গঠন ও বজায় রাখা, আন্তঃ সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ও চাপ মোকাবেলা/ব্যবস্থাপনা, ধৈর্য্য ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে আবেগ ও চাপমুক্ত থেকে দৃঢ়তা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রত্যয় ও নমনীয়তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব নিরসন ও সমঝোতা করতে পারা এবং সামাজিক নেটওয়ার্ক বজায় রাখতে পারা সামাজিক বুদ্ধিমত্তার অন্যতম যোগ্যতা।

Working Draft

সুতরাং শরীর, মন, পরিবার ও সমাজের প্রতিনিয়ত মিথস্ক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে আবেগিক বুদ্ধিমত্তা, আত্মবিশ্লেষণ এবং সামাজিক বুদ্ধিমত্তা অর্জন করে নিজেকে ভালোবেসে নিজের দায়িত্ব উপলব্ধি করে নিরবিচ্ছিন্নভাবে শরীর ও মনের যথাযথ যত্ন ও পরিচর্যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভালো থাকার এবং অন্যকে ভালো রাখার যোগ্যতা অর্জন করবে।

Working Draft

বিষয়: ভালো থাকা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখনক্রম

প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি	৯ম শ্রেণি	১০ম শ্রেণি
নিজের বয়োসপযোগী পরিচর্যায় উদ্যোগী হওয়ার পাশাপাশি মৌলিক অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে পারা। বয়স ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী অন্যের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারা এবং অপছন্দ, অস্বস্তি, সমস্যা নিকটতম কারো কাছে জানাতে পারা	বয়োসপযোগী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যায় উদ্যোগী হওয়ার পাশাপাশি মৌলিক অনুভূতিগুলো বুঝতে ও প্রকাশ করতে পারা। নিজের সম্পর্কে জেনে বয়স ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী অন্যের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারা এবং প্রয়োজনে বিশ্বস্ত কারো কাছে সহায়তা চাইতে পারা	বয়োসপযোগী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা করতে পারার পাশাপাশি মৌলিক অনুভূতির ইতিবাচক প্রকাশ করতে পারা এবং অস্বস্তিকর পরিস্থিতিকে 'না' বলতে পারা । নিজের বৈশিষ্ট্য ও দুর্বলতা সম্পর্কে জেনে বয়স ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী অন্যের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারা এবং প্রয়োজনে বিশ্বস্ত কারো কাছে সহায়তা চাইতে পারা	বয়োসপযোগী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার দায়িত্ব নিতে পারা। নিজ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি অনুধাবন করে নিজের ভুমিকা নির্ধারণ করতে পারা এবং ভাব বিনিময়ের সময় অন্যের আবেগ ও অনুভূতি বোঝে সে অনুযায়ী নিজের মত প্রকাশ করতে পারা। পছন্দের ব্যক্তি/বন্ধু নির্বাচন করতে পারা এবং অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে অন্যের সহযোগিতা নিতে পারা	বয়োসপযোগী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা পাশাপাশি বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারা। নিজের ও অন্যের বৈশিষ্ট্য, আবেগ ও অনুভূতি অনুধাবন করে ভাব বিনিময় করতে পারা এবং ব্যক্তিগত সীমানা ও প্রধান্য চিহ্নিত করতে পারা। সম্পর্ক বজায় রাখতে বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ছিন্ন করতে পারা।	বয়োসপযোগী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা পাশাপাশি বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়া এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিতে পারা। অন্যের অনুভবকে সম্মান করে নিজ অনুভূতির প্রকাশ সংযত ও সংশোধিত করতে পারা এবং নিজের সামর্থ্য ও দুর্বলতার প্রাথমিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে হারজিত মেনে নিয়ে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে পারা। ব্যক্তিগত সীমানা মেনে সম্মান ও সহনশীলতার সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারা এবং নিরাপদ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারা।	বয়োসপযোগী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার পাশাপাশি বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং এ সংক্রান্ত মানসিক ও আবেগিক চাপ মোকাবেলা করতে পারা। নিজ ও অন্যের অনুভবকে সম্মান করে এবং অন্যের মূল্যায়নে প্রভাবিত না হয়ে সামর্থ্য ও দুর্বলতার আত্মমূল্যায়ন করে সহনশীলতার সঙ্গে পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভাব বিনিময় করতে পারা। আন্তঃসম্পর্ক ঝুঁকি নির্ণয় করে প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী তা মোকাবেলা করতে পারা।	বয়োসপযোগী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার পাশাপাশি বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং এ সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলা করতে পারা। প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজ ও অন্যের অনুভবকে সম্মান করে এবং সামর্থ্য ও দুর্বলতা, ব্যর্থতা ও সফলতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানসিক চাপ, রাগ, ক্ষোভ ইত্যাদির ইতিবাচক ব্যবস্থাপনা করতে পারা। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণপূর্বক বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গি এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ভাব বিনিময় করতে পারা এবং আন্তঃসম্পর্ক ঝুঁকি নির্ণয় ও মোকাবেলা করে নিরাপদ ও চাপমুক্তভাবে বিভিন্ন সম্পর্ক বজায় রাখতে বা ছিন্ন করতে পারা	বয়োসপযোগী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার পাশাপাশি বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং এ সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলা করে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারা। চিন্তা ও যুক্তিকে আবেগ ও অনুভূতি মুক্ত রেখে এবং সফলতা ও ব্যর্থতা মেনে নিয়ে আত্ম বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে ইতিবাচক ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারা এবং এ সংক্রান্ত মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক কৌশল প্রয়োগ করতে পারা। ভিন্ন মতকে সম্মান করে নিজের দ্বিমত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে পারা এবং উদ্ভূত দ্বন্দ্ব নিরসনে উদ্যোগী হওয়া এবং সহনশীল আচরণ করতে পারা ।	বয়োসপযোগী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার পাশাপাশি বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং এ সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলা করে অন্যকে সম্পৃক্ত করতে পারা। অনুভূতির সঙ্গে আচরণের সম্পর্ক অনুধাবন করে সংবেদনশীল ও ইতিবাচকভাবে প্রকাশ করতে পারা এবং মূল্যায়ন আবেগ ও অনুভূতিভিত্তিক না করে যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক করতে পারা। হিংসা, বিদ্বেষ ও দ্বন্ধ পরিহার করে সমঝোতার ভিত্তিতে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা। মানসিক চাপ মোকাবেলায় বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির/ সেবার সহায়তায় নিতে পারা এবং পরিস্থিতি সহনশীলতার সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারা।	বয়োসপযোগী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার পাশাপাশি বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্য ও সামাজিক ঝুঁকি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারা। নিজের সামর্থ্য ও দুর্বলতা বিবেচনায় ধৈর্য্য ও সহনশীলতার সঙ্গে দায়িত্ব, ভূমিকা, পছন্দ নির্ধারণ করতে এবং এ সংক্রান্ত ঝুঁকি নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা করতে পারা। দ্বন্ধ নিরসনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নমনীয় ও দৃঢ়তা প্রদর্শন এবং বিভিন্ন ধরণের বৈষম্যমূলক আচরণ চিহ্নিত করে সেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারা।
নিজের জিনিস নিজে গুছিয়ে রেখে পরিচ্ছন্ন ও উৎফুল্ল থাকতে উদ্যোগী হওয়া	নিজেকে সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও উৎফুল্ল রাখতে উদ্যোগী হওয়া	নিজেকে সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও উৎফুল্ল রাখতে নিজের বয়স-উপযোগী যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারা	নিজেকে সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত রাখতে বয়স উপযোগী নিজের যত্ন ও পরিচর্যার দায়িত্ব নিতে পারা	সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারা এবং অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারা। ।	সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারা এবং অন্যকে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করতে পারা।	সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারা এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ নির্ণয় ও মোকাবেলায় উদ্যোগী হওয়া।	সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারা এবং এ সংক্রান্ত ঝুঁকিসমূহ নির্ণয় মোকাবেলা করতে পারা।	সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজেকে ঝুঁকিমুক্ত রেখে দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারা এবং অন্যকে উদ্ভূত ও সহায়তা করতে পারা।	সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারা এবং নিজ ও অন্যকে এ সংক্রান্ত ঝুঁকি ও চাপমুক্ত রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারা	সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারা এবং অন্যকে সহায়তা করতে পারা
			শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনসমূহ অনুধাবন করতে পারা	শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারা	শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়া এবং পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিতে পারা	শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ও এর প্রভাবের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করে পরিবর্তনের সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে পারা	শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি নির্ণয় ও অনুধাবন করে পরিবর্তনের সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে পারা	শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর উপায়ে মানিয়ে নিয়ে ঝুঁকিমুক্তভাবে পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা করতে পারা এবং অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারা	শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর উপায়ে মানিয়ে নিয়ে ঝুঁকিমুক্ত থেকে যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করতে পারা এবং অন্যকে সম্পৃক্ত করতে পারা	স্বাস্থ্য ও সামাজিক ঝুঁকি থেকে নিজেকে রক্ষা করে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন যথাযথ ব্যবস্থাপনা করতে পারা এবং পারিবারিক ও সামাজিকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় থাকতে পারা

প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি	৯ম শ্রেণি	১০ম শ্রেণি
মৌলিক অনুভূতি (আনন্দ, দুঃখ, রাগ ও ভয়) সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারা	মৌলিক অনুভূতি (আনন্দ, দুঃখ, রাগ ও ভয়) অনুধাবন ও সঠিকভাবে প্রকাশ এবং নিজের অস্বস্তি প্রকাশ করতে পারা।	নিজের ও অন্যের আবেগ ও অনুভূতি অনুধাবন করে ইতিবাচক উপায়ে প্রকাশ ও যোগাযোগ করতে পারা এবং অস্বস্তিকর পরিস্থিতিকে 'না' বলতে পারা	নিজের মত প্রকাশের ক্ষেত্রে অন্যের আবেগ ও অনুভূতি অনুধাবন করতে উদ্যোগী হওয়া	নিজের আবেগ ও অনুভূতি অনুধাবন করে মত প্রকাশের ক্ষেত্রে অন্যের আবেগ ও অনুভূতি বিবেচনায় নিতে পারা	অন্যের আবেগ ও অনুভূতি অনুধাবন করে নিজের আবেগ ও অনুভূতির যৌক্তিক ও স্বাস্থ্যকর প্রকাশ করতে পারা, সংশোধিত করতে পারা এবং অস্বস্তিকর ও নির্যাতনমূলক পরিস্থিতিতে দৃঢ়ভাবে নিজের যথাযথ অবস্থান প্রকাশ করতে পারা।	অন্যের আবেগ ও অনুভূতিকে অনুধাবন ও সম্মান করে এবং নিজের আবেগ বা অনুভূতির প্রতি যত্নবান হয়ে তার ইতিবাচক প্রকাশ করতে পারা।	প্রেক্ষাপট অনুযায়ী অন্যের আবেগ ও অনুভূতিকে অনুধাবন ও সম্মান করে নিজের আবেগ বা অনুভূতির ইতিবাচক এবং ফলাফলধর্মী প্রকাশ করতে পারা	চিন্তা ও যুক্তিকে শুধুমাত্র আবেগ ও অনুভূতি চালিত না রেখে বিশ্লেষণনির্ভর ও যৌক্তিক রাখতে পারা এবং সে অনুযায়ী মানসিক অবস্থা (মুড) সংশোধিত করে ইতিবাচক ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারা।	আবেগ ও অনুভূতির সঙ্গে আচরণের সম্পর্ক অনুধাবন করে, নিজ এবং অন্যের অনুভবের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে ইতিবাচকভাবে প্রকাশ করতে পারা।	নিজ এবং অন্যের প্রকৃত ও অনুসঙ্গ আবেগ ও অনুভূতি অনুধাবন করতে পারা এবং আচরণের সংগে তার সম্পর্ক উপলব্ধি করে ধৈর্য্য ও সংবেদনশীল আচরণ করতে পারা
নিজের পছন্দ অপছন্দ সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারা	নিজের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি অনুধাবন করতে পারা	নিজের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির পাশাপাশি সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করতে পারা এবং হারজিত মেনে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হওয়া	নিজ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি অনুধাবন করে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে নিজের ভূমিকা নির্ধারণ করতে পারা	প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি ও সীমাবদ্ধতার আলোকে নিজ সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করতে পারা এবং প্রভাবিত না হয়ে সে অনুযায়ী ভূমিকা নির্ধারণ করতে পারা।	নিজের মতো করে সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতার প্রাথমিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে নিজেকে সম্মান করতে পারা এবং হারজিত মেনে নিয়ে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের অগ্রাধিকারযোগ্য ভূমিকা নির্ধারণ করতে পারা	অন্যের মূল্যায়নে প্রভাবিত না হয়ে সফলতা ও ব্যর্থতা সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতার বিশ্লেষণে আত্ম মূল্যায়ন করে আবেগ অনুভূতির যৌক্তিক, স্বাস্থ্যকর ও গঠনমূলক প্রকাশ করতে পারা এবং উত্তরণে ভূমিকা রাখতে পারা	নিজ ও অন্যের সফলতা ও ব্যর্থতা মেনে নিতে পারা এবং নিজের সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় আত্ম বিশ্লেষন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে নেতিবাচক প্ররোচনায় সাড়া না দিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মানসিক চাপ, দুঃখ, ভয়, রাগ, ক্ষোভ, হতাশা ইত্যাদির ইতিবাচক ব্যবস্থাপনা করতে পারা।	সফলতা ও ব্যর্থতা মেনে নিয়ে আত্ম-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে কার্যকারণ অনুধাবন করে পরবর্তী সময়ে সে আলোকে ব্যবস্থা নিতে পারা এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক কৌশল প্রয়োগ করতে পারা	আত্ম-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শুধুমাত্র আবেগ ও অনুভূতি নির্ভর না করে যৌক্তিক (কী এবং কেন) ও বিশ্লেষণমূলকভাবে পরিচালনা করতে পারা এবং যে কোন অপ্রত্যাশিত চাপ মোকাবেলায় ইতিবাচক কৌশল প্রয়োগ করতে পারা	নিজের সামর্থ্য, সীমাবদ্ধতা ও পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় নিজ দায়িত্ব, ভূমিকা, পছন্দ নির্ধারণ করতে এবং এ সংক্রান্ত আবেগিক ঝুঁকি নির্ণয় ও সে অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা নিতে পারা
বয়স ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী অন্যের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারা	বয়স ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী যথাযথভাবে অন্যের সঙ্গে ভাব বিনিময় (ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ইত্যাদি) করতে পারা	ভাব বিনিময়ের সময় অন্যকে শোনা এবং নিজের মত প্রকাশ করতে পারা	ভাব বিনিময়ের সময় অন্যের আবেগ ও অনুভূতি বোঝে সে অনুযায়ী নিজের মত প্রকাশ করতে পারা	ভাব বিনিময়ের সময় ব্যক্তিগত সীমানা চিহ্নিত করতে পারা এবং পরিস্থিতি, সম্পর্ক ও প্রাধান্য অনুযায়ী তার প্রয়োগ করতে পারা	বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগত সীমানা মেনে এবং অন্যের সীমানাকে সম্মান করে সংবেদনশীলতার সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারা।	পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বয়স উপযোগী বিভিন্ন পরিসরে অন্যের ভাব, আবেগ ও অনুভূতিকে সম্মাণ করে সংবেদনশীলতার সঙ্গে নিজের মত ও ধারণা প্রকাশ করতে পারা।	পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণপূর্বক নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গি এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ভাব বিনিময় করতে পারা	বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে আবেগ ও চাপমুক্ত থাকতে পারা এবং ভিন্ন মতকে সম্মান করে নিজের দ্বিমত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে পারা ও অন্যকেও তা করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারা।	ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে সহনশীল মনোভাব ও ইতিবাচক আচরণের মাধ্যমে সমঝোতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারা এবং হিংসা, বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব পরিহার করে দায়িত্বশীল আচরণ করা ও করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারা	ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমঝোতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে অসমর্থ হলে সচেতনভাবে আবেগ ব্যবস্থাপনা করে নমনীয় ও দৃঢ়তার (Assertiveness) সঙ্গে দ্বন্দ্ব নিরসনে উদ্যোগী হওয়া ও অন্যকে তা করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারা।
নিজের অপছন্দ, অস্বস্তি ও সমস্যা নিকটতম কাউকে জানাতে পারা	যেকোনো পরিস্থিতিতে বিশ্বস্ত কারো কাছে সহায়তা চাইতে পারা	ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অস্বস্তি অনুধাবন করে বিশ্বস্ত কাউকে বলতে পারা।	পছন্দের ব্যক্তি/বন্ধু নির্বাচন করতে পারা এবং যেকোনো অস্বস্তিকর পরিস্তিতিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিতে পারা	পছন্দের ব্যক্তি/বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে (অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে) সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারা	নিজের বৈশিষ্ট্য সামর্থ্য, সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নিয়ে একের অধিক ব্যক্তি/বন্ধুর সঙ্গে স্বাস্থ্যকর ও চাপমুক্ত সম্পর্ক বজায় রাখতে পারা এবং যেকোনো অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে বিদ্যমান সেবা ও সহযোগিতা নিতে পারা	আন্তঃসম্পর্ক ঝুঁকি নির্ণয় করতে পারা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী মোকাবেলা করতে ও বিদ্যমান সেবাকাঠামো থেকে সহায়তা নিতে পারা।	আন্তঃসম্পর্ক ঝুঁকি নির্ণয় ও মোকাবেলা করে নিরাপদ ও চাপমুক্তভাবে বিভিন্ন সম্পর্ক বজায় রাখতে বা ছিন্ন করতে পারা	ভাব বিনিময় এবং সম্পর্ক ব্যবস্থাপনায় চাপ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনা করতে, উদ্ভূত দ্বন্দ্ব নিরসনে উদ্যোগী হতে এবং সহনশীল আচরণ করতে পারা	অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণে সৃষ্ট মানসিক চাপ মোকাবেলায় বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির/ সেবার সহায়তায় নিতে পারা এবং পরিস্থিতি সহনশীলতার সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারা।	সামাজিক পরিমণ্ডলে সেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারা এবং বিভিন্ন ধরণের বৈষম্যমূলক আচরণ চিহ্নিত করে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা এ অন্যকে গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারা।

Work in Progress

বিষয়: শিল্প ও সংস্কৃতি

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

প্রাকৃতিক ও সামাজিক বৈচিত্র্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক অবলোকন, অনুভব করে প্রতিলিপি বা প্রতিরূপ তৈরি এবং পারস্পরিক রূপান্তরের মাধ্যমে শিল্পকলার অন্তর্গত দৃশ্যকলা ও উপস্থাপনকলার বিভিন্ন সৃজনশীল ধারা (চারু ও কারুকলা, নৃত্য, সংগীত, যন্ত্রসংগীত, আবৃত্তি, অভিনয়, সাহিত্য, ইত্যাদি) ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে রস আস্বাদন করতে পারা এবং সেসবের চর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারা; সংবেদনশীলতা ও নান্দনিকতার বিকাশ সাধন করতে পারা; নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ ও লালন এবং অন্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারা, শিল্পকলাকে উপজীব্য করে উচ্চতর শিক্ষা বা আত্মনির্ভরশীল হতে শিল্পকলার যেকোনো ধারাকে বিবেচনা করতে পারা।

বিষয়ের ধারণায়ন

নিজস্ব জাতিসত্তার ঐতিহ্যবাহী রূপকে নান্দনিকভাবে বিশ্বজনীন করে তোলার জন্য শিল্প ও সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বায়নের এই যুগে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক জাতি শিল্প ও সংস্কৃতি নির্ভর শিক্ষার মধ্য দিয়ে নিজেদের ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে পৃথিবীব্যাপী তুলে ধরেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিজেদের শিল্পবোধ ও নান্দনিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নান্দনিকবোধসম্পন্ন আত্মনির্ভরশীল নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিল্প ও সংস্কৃতি যথাযথভাবে অনুধাবন ও উপলব্ধি করার গুরুত্ব অপরিসীম। শিল্পের ভাষা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা। গুহাযুগ থেকে পৃথিবীর সকল সভ্যতার পথ ধরে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিল্প ও সংস্কৃতি মানুষের জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ অংশ। রেঁনেসার সময়ে শিল্প ও সংস্কৃতি-নির্ভর জীবনদর্শন ইউরোপকে দিয়েছিল এক অনন্য উঁচুমাত্রা। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দেশীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহারে নান্দনিকবোধসম্পন্ন আত্মনির্ভরশীল নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতেও শিল্প ও সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। যে জাতি নিজের সংস্কৃতিকে ভালোবাসে সে অন্যের সংস্কৃতিকেও সম্মান করে। শিল্প ও সংস্কৃতি শিক্ষার মধ্য দিয়ে সংবেদনশীল, মানবিক গুণাবলি ও পরমতসহিষ্ণু নতুন প্রজন্ম তৈরির সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে সৃজনীগুণসম্পন্ন আত্মনির্ভরশীল রূপে গড়ে তোলাকে শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের কাছে আনন্দময় করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের নান্দনিক ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন করে গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো শিল্প ও সংস্কৃতি । শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে শিশুদের সৃজনশীল চিন্তার সঠিক বিকাশও মূল্যায়ন করা যায়। এই শিক্ষাক্রম রূপরেখায় শিল্প ও সংস্কৃতিকে শিখন-ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করার উদ্দেশ্য হলো শিল্পকে উপজীব্য করে শিশুদের সঠিক মনোবিকাশে সহায়তা করা।

শিল্প ও সংস্কৃতি শিখন-ক্ষেত্রটিকে এমন একটি সমন্বিত বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেখানে শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন সৃজনশীল ধারা (চারু ও কারুকলা, নৃত্য, সংগীত, যন্ত্রসংগীত, আবৃত্তি, অভিনয় ও সাহিত্য) চর্চার সুযোগ রয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী একজন নান্দনিক, রুচিশীল ও শিল্পবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে এবং জীবন যাপন করতে পারবে। শিক্ষার্থীর ইচ্ছা ও প্রয়োজনবোধে সৃজনশীল সক্ষমতাকে উচ্চতর শিক্ষা, কর্মজগৎ বা আত্মনির্ভরশীল হতে বিবেচনা করারও সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন শ্রেণি এবং

জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরিতে শিল্প ও সংস্কৃতিকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সূত্রে তাদের অভিভাবকদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরিতেও শিল্পবোধকে কাজে লাগানোর চিন্তা করা হয়েছে।

এজন্য শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়টিতে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত সৃজনশীলতার ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখা হয়েছে যেখানে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরকেই শিল্প ও সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

এই শিক্ষাক্রম রূপরেখায় শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ না করে প্রকৃতি, পরিবেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি-নির্ভর করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে লোকজ, প্রাকৃতিক উপাদান ও উপকরণ ব্যবহার করে শিশুদের শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। শিশুদের কল্পনাপ্রবণ, অনুসন্ধিৎসু মনোজগতকে প্রাধান্য দিয়ে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে উদার, সংবেদনশীল, নান্দনিকবোধ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকৃতি পাঠ, শিল্প ও সংস্কৃতি-নির্ভর শিক্ষাপদ্ধতি এবং তার সঙ্গে সমসাময়িক বিশ্বের সৃজনশীল শিক্ষার মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে সামনে রেখেই এই শিল্প ও সংস্কৃতি এর সমন্বিত শিখন বিষয়টি পরিকল্পনা করা হয়েছে। যার পদ্ধতিটি হবে নিম্নরূপ :

প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বৈচিত্র অবলোকন, অনুভব ও প্রতিলিপি বা প্রতিরূপ তৈরি

প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বৈচিত্রকে অবলোকন ও অনুভব করে (দেখে, শুনে, স্পর্শ ও অনুধাবন করে) শিল্পের উপাদান হিসেবে আকার, আকৃতি, রং সুর, তাল, লয়, ছন্দ ইত্যাদি অনুসন্ধান ও উপলব্ধি করা এবং তার প্রতিলিপি ও প্রতিরূপ তৈরি।

রূপান্তর

প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বৈচিত্রকে অবলোকন ও অনুভব করে শিল্পের উপাদানসমূহের নান্দনিক ও সৃজনশীল রূপান্তরের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ

নান্দনিক ও সৃজনশীল রূপান্তরের ধারণা ও যোগ্যতার দৈনন্দিন কাজ ও বিশেষত্ব তৈরিতে বহুমাত্রিকভাবে প্রয়োগ।

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা

Working Draft

যাপিত জীবনে নান্দনিকতার মাধ্যমে মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও গুণাবলির বিকাশ (জাতীয়তা, বিশ্ব-নাগরিকত্ব, পরিবেশ সংরক্ষণ, মানবিকতা, বৈচিত্রকে সম্মান, সৃষ্টিশীলতা ইত্যাদি)।

Working Draft

বিষয় : শিল্প ও সংস্কৃতি

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখনক্রম

প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি	৯ম শ্রেণি	১০ম শ্রেণি
প্রকৃতিনির্ভর আনন্দময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে, শিশুর কল্পনাপ্রবণ মন ও অনুসন্ধিৎসাকে কাজে লাগিয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে পারা	নিকট প্রকৃতি ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে, আনন্দময় পরিবেশে শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার (চারু ও কারু, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি) মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে আগ্রহী ও উৎসাহী হওয়া। শিল্পের বিভিন্ন শাখার বয়স উপযোগী কার্যক্রমে আগ্রহ, স্বতঃস্ফূর্ততা ও আনন্দের সংগে অংশগ্রহণ করতে পারা।	নিকট প্রকৃতি ও পরিবেশ অবলোকন (দেখে, শুনে, স্পর্শ করে) করে শিল্প রীতি অনুসরনের মধ্য দিয়ে সাবলীলভাবে শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে পারা। শিল্পের বিভিন্ন শাখার বয়স উপযোগী কার্যক্রমে আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহণ এবং তার বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রকৃতি, পরিবেশ ও ঘটনাকে সংযুক্ত করতে আগ্রহী হওয়া।	নিকট প্রকৃতি ও পরিবেশ চিন্তাশীলভাবে পর্যবেক্ষণ করে পারিবারিক ও সামাজিক ঘটনা দেখে, শুনে তার উপাদানসমূহের আন্তঃসম্পর্ক ও পরিবর্তন উপলব্ধি করে সৃজনশীল ধারার মাধ্যমে তা প্রকাশে আগ্রহী হওয়া। শিল্পকলার সৃজনশীল বয়স উপযোগী কার্যক্রমে একক ও দলীয়ভাবে আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারা এবং কার্যক্রমের সঙ্গে প্রকৃতি ও পরিবেশকে সংযুক্ত করতে পারা।	নিকট প্রকৃতি ও পরিবেশ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে বা কোন ঘটনা, গল্প শুনে তার উপাদানসমূহের আন্তঃসম্পর্ক ও পরিবর্তন উপলব্ধি করা, শিল্পের বিভিন্ন ধারার বয়স উপযোগী লোকজ ও দেশীয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারা এবং শিল্পকর্মের মূলভাব বুঝতে আগ্রহী হয়ে সে অনুযায়ী নিজের অনুভূতি, আবেগ ও কল্পনা শিল্পের বিভিন্ন শাখায় রীতি অনুসরণের মধ্য দিয়ে সংবেদনশীল প্রকাশে আগ্রহী হওয়া।	প্রকৃতি ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং জাতীয় ও সামাজিক ঘটনা দেখে, শুনে নিজের মতো করে উপলব্ধি করে নিজ অনুভূতি ও কল্পনা শিল্পের বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারা। শিল্পকলার সৃজনশীল শাখার কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করা এবং যেকোনো একটি শাখায় আগ্রহ ও অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য প্রদর্শন করতে পারা। লোকজ, দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী হয়ে সৃজনশীল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারা।	প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন, অনুধাবন করে এবং পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ দেখে, শুনে রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার শাখার মাধ্যমে সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া। শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার সৃজনশীল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ কিংবা শ্রোতা/দর্শক হিসেবে তার রস/স্বাদ/আনন্দ আস্বাদন/উপভোগ করতে পারা। কোনো একটি শাখায় নিজের আগ্রহ, উৎসাহ, দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা এবং লোকজ, দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা করতে পারা।	পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা শিল্পকলার এক বা একাধিক শাখার (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা। শিল্পের বিভিন্ন শাখার প্রদর্শন ও পরিবেশনা বুঝে ও উপলব্ধি করে বিনোদিত হতে পারা এবং দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা ও প্রকাশে সম্পৃক্ত হতে পারা। নিজের দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার প্রয়োগ করতে পারা।	পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসরণে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা সংবেদনশীলভাবে করণ কৌশল অনুশীলন করে শিল্পকলার শাখার মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/ প্রদর্শন করতে পারা। শিল্পের বিভিন্ন শাখার প্রদর্শন ও পরিবেশনার করণকৌশল নিজের মতো করে মূল্যায়ন করে উপভোগ করতে পারে এবং রূচিশীলভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারা। দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার প্রয়োগ করতে পারা।	শিল্পকলার এক বা একাধিক শাখার চর্চার মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব অন্যান্য কার্যক্রমে (দৈনন্দিন কাজ, অন্যান্য বিষয়ে পড়াশুনা, ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক কার্যক্রম বা সম্পর্ক ইত্যাদি) ব্যবহার করতে পারা। শিল্পকর্ম বা পরিবেশনা প্রদর্শন বা উপস্থাপনের মাধ্যমে নিজস্ব সৃজনশীলতার প্রকাশ করতে পারা। লোকজ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার রস আস্বাদনে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু হওয়া।	জীবনযাপনে শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার ধারা অব্যাহত রাখতে পারা এবং সকল ক্ষেত্রে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার প্রতিফলন ঘটাতে পারা। দেশীয় সংস্কৃতিকে ধারণ করে শিল্পকলার বৈশ্বিক রস ও আনন্দ আস্বাদন ও উপভোগ করতে পারা। শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার দক্ষতাকে আত্মনির্ভরশীল হতে বিবেচনা করতে পারা।
প্রাণবন্ত শারীরিক ভঙ্গি ও বিভিন্ন মাধ্যমে নিজের কল্পনা ও অনুভূতির প্রকাশ করতে পারা	প্রকৃতি ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে, আনন্দের সঙ্গে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের কল্পনা প্রবনতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিলিপি তৈরি করতে পারা	নিকট প্রকৃতি, পরিবেশ অবলোকন (দেখে, শুনে, স্পর্শ করে) করে নির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ এবং বিভিন্ন উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে আনন্দের সঙ্গে নিজের কল্পনা প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিলিপি তৈরি করতে পারা ।	নিকট প্রকৃতি ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও অনুভবের মাধ্যমে তার উপাদানসমূহের পরিবর্তন ও আন্তঃসম্পর্ক উপলব্ধি করে নির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করে শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় প্রকাশে আগ্রহী হওয়া।	নিকট প্রকৃতি ও পরিবেশ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তার উপাদানসমূহের পরিবর্তন আন্তঃসম্পর্ক ও রূপান্তর উপলব্ধি করে নিজের অনুভূতি, আবেগ ও কল্পনা নির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করে শিল্পের বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীল প্রকাশে আগ্রহী ও উদ্যোগী হওয়া।	প্রকৃতি ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করে নিজ অনুভূতি ও কল্পনা নির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করে শিল্পের বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারা।	প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন, অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।	পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা শিল্পকলার যেকোন একটি ধারায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।	পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসরণে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা সংবেদনশীলভাবে করণ কৌশল অনুশীলন করে শিল্পকলার যেকোনো ধারার মাধ্যমে প্রকাশ/ প্রদর্শন করতে পারা।	নিজের কল্পনা, অনুভূতি, উপলব্ধি ও ভাব শিল্পকলার যেকোনো একটি ধারায় সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করতে চর্চা অব্যাহত রাখতে পারা	শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার ধারা অব্যাহত রাখতে পারা এবং শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলতা ও সৃজনশীলতা প্রদর্শন করতে পারা।
নিকট ব্যক্তি/পরিচিত জন এবং ঘটনার অনুকরণ করতে পারা	পারিবারিক ও সামাজিক ঘটনা অবলোকন করে শারীরিক অঙ্গভঙ্গি ও কণ্ঠের মাধ্যমে তার অনুকরণ করতে পারা	পারিবারিক ও নিকট পরিবেশের ঘটনা অবলোকন ও অনুভব (দেখে, শুনে, স্পর্শ করে) করে নিজের কল্পনা প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে আনন্দের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে অনুভূতির প্রকাশ করতে পারা ।	পারিবারিক ও সামাজিক ঘটনা অবলোকন ও অনুভবের মাধ্যমে ঘটনাক্রম উপলব্ধি করে নির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করে শিল্পকলার ধারার মাধ্যমে প্রকাশে আগ্রহী হওয়া।	কোন ঘটনা, গল্প শুনে বা দৃশ্যপট দেখে তার মূলভাব উপলব্ধি করে নিজের অনুভূতি, আবেগ ও কল্পনা নির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করে শিল্পের বিভিন্ন ধারার মধ্য দিয়ে সংবেদনশীল প্রকাশে আগ্রহী ও উদ্যোগী হওয়া।	পারিবারিক ও সামাজিক ঘটনাবলি দেখে শুনে উপলব্ধি করে নিজ অনুভূতি ও কল্পনা নির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করে শিল্পের বিভিন্ন ধারায় প্রকাশ করতে পারা।	পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ দেখে, শুনে রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া	গল্প বা ঘটনা শুনে বিশ্লেষণ, অনুধাবন ও রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিশেলে শিল্পকলার যে কোন একটি ধারায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।	নিজের কল্পনা ও কল্পনা-সংশ্লিষ্ট ভাব, অনুভূতি, উপলব্ধি ও শিল্পকলার যেকোনো একটি ধারায় সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা	নিজের কল্পনা, অনুভূতি, উপলব্ধি ও ভাব শিল্পকলার যেকোনো একটি ধারায় সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করতে চর্চা অব্যাহত রাখতে পারা	শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার ধারা অব্যাহত রাখতে পারা এবং শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলতা ও সৃজনশীলতা প্রদর্শন করতে পারা।
শিশুতোষ কার্যক্রমে আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে	শিল্পের বিভিন্ন ধারার বয়স উপযোগী কার্যক্রমে আগ্রহ, স্বতঃস্ফূর্ততা, আনন্দ ও	শিল্পের বিভিন্ন ধারার বয়স উপযোগী কার্যক্রমে আগ্রহ স্বতঃস্ফূর্ততা, আনন্দ ও	শিল্পের বিভিন্ন ধারার বয়স উপযোগী কার্যক্রমে আগ্রহ স্বতঃস্ফূর্ততা, আনন্দ ও সংবেদনশীলতার সংগে	শিল্পের বিভিন্ন ধারার বয়স উপযোগী লোকজ ও দেশীয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ	শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করা, লোকজ, দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির	শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার সৃজনশীল কার্যক্রমে আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহণ, লোকজ, দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা করে	শিল্পের বিভিন্ন ধারার প্রদর্শন ও পরিবেশনা বুঝে ও উপলব্ধি করে বিনোদিত হতে পারা এবং দেশীয় সংস্কৃতি ও	শিল্পের বিভিন্ন ধারার প্রদর্শন ও পরিবেশনার করণকৌশল নিজের মতো করে মূল্যায়ন করে উপভোগ করতে পারা	শিল্পকর্ম বা পরিবেশনা প্রদর্শন বা উপস্থাপনের মাধ্যমে নিজস্ব সৃজনশীলতার প্রকাশ করতে পারা এবং	দেশীয় সংস্কৃতিকে ধারণ করে শিল্পকলার বৈশ্বিক রস ও আনন্দ আস্বাদন ও উপভোগ

প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি	৯ম শ্রেণি	১০ম শ্রেণি
অংশগ্রহণ করতে পারা।	সংবেদনশীলতর সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারা	সংবেদনশীলতার সঙ্গে অংশগ্রহণ এবং তার বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রকৃতি, পরিবেশ ও ঘটনাকে সংযুক্ত করতে আগ্রহী হওয়া।	একক ও যৌথভাবে অংশগ্রহণ করতে পারা এবং কার্যক্রমের সঙ্গে প্রকৃতি ও পরিবেশকে সংযুক্ত করতে পারা।	করতে পারা এবং শিল্পকর্মের মূলভাব বুঝতে পারা এবং সে অনুযায়ী অনুভূতির সংবেদনশীল প্রকাশে আগ্রহী হওয়া।	প্রতি আগ্রহী হয়ে শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় তা চর্চা করা এবং যেকোনো একটি শাখায় আগ্রহ ও অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য প্রদর্শন করতে পারা।	যেকোন একটি শাখায় নিজের আগ্রহ, উৎসাহ দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা, এবং শ্রোতা/দর্শক হিসেবে তার রস/স্বাদ/আনন্দ আস্বাদন/উপভোগ করতে পারা।	ঐতিহ্যের চর্চা ও প্রকাশে সম্পৃক্ত হতে পারা।	এবং রুচিশীলভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারা। লোকজ ও দেশীয় শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার রস আস্বাদনে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু হতে পারা।	লোকজ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার রস আস্বাদনে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু হতে পারা।	করতে পারা এবং শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার দক্ষতাকে আত্মনির্ভরশীল হতে বিবেচনা করতে পারা।
বয়স উপযোগী অডিও ভিজ্যুয়াল বিষয়বস্তু উপভোগ করতে পারা।	বয়স উপযোগী অডিও ভিজ্যুয়াল বিষয়বস্তু উপভোগ করার পাশাপাশি নিজের পছন্দ প্রকাশ করতে পারা	বয়স উপযোগী অডিও ভিজ্যুয়াল বিষয়বস্তু উপভোগ করতে পারা এবং পছন্দ অপছন্দ প্রকাশ করতে পারা	বয়স উপযোগী অডিও ভিজ্যুয়াল বিষয়বস্তু উপভোগ করে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারা	বয়স উপযোগী অডিও ভিজ্যুয়াল বিষয়বস্তু উপভোগ করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুভূতির প্রকাশ করতে পারা	বয়স উপযোগী অডিও ভিজ্যুয়াল বিষয়বস্তু উপভোগ করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুভূতির প্রকাশ ও নিজের মতামত দিতে পারা	বয়স উপযোগী অডিও ভিজ্যুয়াল বিষয়বস্তু উপভোগ করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুধাবন করে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারা এবং পরিবেশ ও ঘটনার সংগে সংযুক্ত করতে পারা	বয়স উপযোগী অডিও ভিজ্যুয়াল উপভোগ করে তা বিশ্লেষনের মাধ্যমে নিজের মতামত যুক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারা	বয়স উপযোগী অডিও ভিজ্যুয়াল উপভোগ করে তা বিশ্লেষনের মাধ্যমে নিজের মতামত যৌক্তিকভাবে প্রকাশ করতে পারা এবং অন্যের মুল্যায়নকে সংবেদনশীলভাবে গ্রহণ করতে পারা	বয়স উপযোগী অডিও ভিজ্যুয়াল উপভোগ করে তা সুক্ষ বিশ্লেষনের মাধ্যমে যৌক্তিক সমালোচনা করতে পারা	বয়স উপযোগী অডিও ভিজ্যুয়াল উপভোগ করে তা সুক্ষ বিশ্লেষনের মাধ্যমে যৌক্তিক ও ইতিবাচকভাবে সমালোচনা করতে পারা
নিজের জিনিস নিজে গুছিয়ে রাখতে পারা	নিজেকে পরিছন্ন ও গুছিয়ে রাখতে আগ্রহ প্রদর্শন করতে পারা	নিজেকে সুন্দরভাবে প্রকাশে বা উপস্থাপনে সচেতনভাবে উদ্যোগী হতে পারা	নিজেকে সুন্দরভাবে প্রকাশে বা উপস্থাপনের পাশাপাশি অন্যের সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে পারা	নিজের চারপাশকে সম্মিলিতভাবে পরিছন্ন ও গুছানো রাখতে উদ্যোগী হতে পারা	নিজেকে রুচিশীলভাবে উপস্থাপনের পাশাপাশি রুচির বৈচিত্র বুঝে সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারা	নিজের দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার প্রয়োগ করতে পারা।	দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার চর্চা করতে পারা ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারা।	নিজের বিশেষত্বকে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার মাধ্যমে প্রকাশ এবং ব্র্যান্ডিং করতে পারা এবং অন্যের বিশেষত্ব অনুধাবন করতে পারা	শিল্পকলার ধারা চর্চার মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব অন্যান্য কার্যক্রমে (দৈনন্দিন কাজ, অন্যান্য বিষয়ে পড়াশুনা, ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক কার্যক্রম বা সম্পর্ক ইত্যাদি) রূপান্তর করে ব্যবহার করতে পারা।	জীবন যাপনে শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার ধারা অব্যাহত রাখতে পারা এবং সকল ক্ষেত্রে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার প্রতিফলন ঘটাতে পারা।

Working Draft

২.১৩ মাধ্যমিক স্তর (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি)

ব্যক্তি তাঁর চারপাশের প্রকৃতি,পরিবেশ, সমাজ, সংস্কৃতির বাইরে পৃথক কোনো সত্তা নয় বরং এসব কিছুর মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে ওঠা একজন পরিপূর্ণ মানুষ। তাই শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার পাশাপাশি কর্মজীবনের সঙ্গেও শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করতে হবে। আমাদের প্রচলিত শিক্ষায় মাধ্যমিক স্তরের শেষ পর্যায় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি। এই স্তরের শিক্ষার্থীর বয়স সাধারণত ১৬ থেকে ১৮ বছর। শিক্ষার্থীর জীবনে এই দুইটি বছর অন্তবর্তীকাল হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ এই পর্যায় শেষে শিক্ষার্থী স্নাতক বা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায়, আবার একটি বড় অংশের শিক্ষার্থী কর্মজগতে প্রবেশ করে। তাই যারা স্নাতক স্তর কিংবা কর্মজগতে প্রবেশ করবে তাঁদের জন্য এ স্তরের শিক্ষাক্রম এমনভাবে বিন্যস্ত করা হবে যেন তাদের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি উচ্চ শিক্ষা এবং ভবিষ্যত কর্মজগতের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়। পাশাপাশি পরিবর্তনশীল বিশ্বে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যাতে সে ইতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে সেই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হবে।

২.১৩.১ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বিষয় নির্ধারণ

এই স্তরকে বিশেষায়নের জন্য প্রস্তুতির স্তর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই স্তরে অনেক শিক্ষার্থীকে যেমন উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয় আবার অনেক শিক্ষার্থীকে পরিস্থিতি বিবেচনায় কর্মজগতে প্রবেশের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে যেন সে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং ব্যক্তিক, সামাজিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যাতে সে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে সে উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে সকল শিক্ষার্থীর জন্য এই স্তরে আবশ্যিক একাধিক বিষয় থাকবে। প্রতিটি আবশ্যিক বিষয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম রূপরেখায় চিহ্নিত এক বা একাধিক শিখন-ক্ষেত্রের প্রতিফলন থাকবে।

যেহেতু একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিখনের সার্বিক উদ্দেশ্য বিশেষায়নের জন্য প্রস্তুতি তাই নৈর্বাচনিক বিশেষায়িত বিষয়সমূহের জন্য এই স্তরে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। শিক্ষার্থী তাঁর আগ্রহ, সামর্থ্য ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনটি বিশেষায়িত বিষয় নির্বাচন করতে পারবে।

জীবন ও জীবিকা শিখন-ক্ষেত্রের আলোকে শিক্ষার্থীরা যেন আত্ম-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ হয় তার জন্য পেশাদারি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রায়োগিক বিষয়সমূহ নির্বাচন করা যাবে। নির্বাচিত প্রায়োগিক বিষয়সমূহ থেকে ঐচ্ছিক হিসেবে যেকোনো একটি বিষয় নেয়া যাবে। এক্ষেত্রে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির জীবন ও জীবিকা বিষয়ে কর্মজীবনের পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত বয়সোপযোগী যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে তাদের আগ্রহ, ইচ্ছা, সক্ষমতা অনুযায়ী ভবিষ্যতের পরিকল্পনার মাধ্যমে বিষয় ও পথ নির্ধারণ করতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বিষয় নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে সংক্ষেপে নিচে দেয়া হলো

- **আবশ্যিক বিষয় :** একাধিক শিখনক্ষেত্রসমূহের ভিত্তিতে নির্ধারিত ২/৩ টি বিষয় যা সকল শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক হবে।
- **নৈর্বাচনিক বিষয় :** প্রচলিত সাধারণ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষার নৈর্বাচনিক, আবশ্যিক বিষয়সমূহ উন্মুক্ত রেখে বা প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে বিষয়গুচ্ছ নির্বাচন করা যেতে পারে। নির্বাচিত বিষয়গুচ্ছ থেকে একজন শিক্ষার্থীকে তার আগ্রহ ও ক্যারিয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী যেকোনো তিনটি বিষয় নির্বাচন করার সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

- **প্রায়োগিক বিষয় (ঐচ্ছিক) :** পেশাদারি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নির্ধারিত বিষয়সমূহ থেকে শিক্ষার্থীকে তার আগ্রহ ও ক্যারিয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী যেকোন একটি বিষয় বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

২.১৩.২ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির আবশ্যিক বিষয়সমূহের প্রকৃতি ও বিন্যাস

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বিশেষায়িত বিষয়সমূহ যেহেতু বেশি প্রাধান্য পাবে, সেহেতু এ বিষয়সমূহের বিন্যাস এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আবশ্যিক বিষয়সমূহের প্রকৃতি ও পরিসর নির্দিষ্ট করার পরে বিষয়ভিত্তিক শিখনযোগ্যতাসমূহ নির্ধারণ করা হবে। আবশ্যিক এক বা একাধিক বিষয়ে বিভিন্ন শিখন-ক্ষেত্রের সমন্বয় থাকতে পারে। নিচের ছকে চিহ্নিত শিখন-ক্ষেত্রসমূহ থেকে গুরুত্ব অনুযায়ী কিছু সম্ভাব্য থিম বা ইস্যু উল্লেখ করা হল, যেগুলোর প্রতিফলন আবশ্যিক বিষয়সমূহে থাকতে পারে।

শিখন-ক্ষেত্র		**সমন্বিত বিষয়/বিষয়সমূহের জন্য প্রাসঙ্গিক থিম/ইস্যুসমূহ**
ভাষা ও যোগাযোগ	বাংলা	• ব্যক্তিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও বৈশ্বিক পরিসরে আন্তঃযোগাযোগ • ইতিবাচকতা ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে ভাষা-যোগাযোগ • যুক্তি ও তথ্যসহ অভিমত ব্যক্ত করা • সামাজিক অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণকে নন্দনতাত্ত্বিক, বিশ্লেষণাত্মক ও সৃষ্টিশীল মাধ্যমে প্রকাশ
	English	• Articulating personal viewpoint and reflective thinking • Preference in linguistic norms • Aesthetic aspects in English literary texts from different contexts • Producing and analyzing academic text
গণিত ও যুক্তি		• যুক্তিতর্ক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি		• বিজ্ঞান ও সমাজ • বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা ও মেটাকগনিশন
তথ্য, যোগাযোগ ও ডিজিটাল প্রযুক্তি		• উপযুক্ত প্রযুক্তি নির্বাচন ও ব্যবহার করে যেকোনো তথ্যের প্রেক্ষাপট, উৎস, ধরন ইত্যাদি বিশ্লেষণ • মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ আইন ও নৈতিকতা • তথ্য-প্রযুক্তির প্রসারে সামাজিক পরিবর্তনের প্যাটার্ন, সম্ভাবনা ও ঝুঁকিসমূহ • ডিজিটাল সলিউশন তৈরি
পরিবেশ ও জলবায়ু		• জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন
সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব		• চিন্তার ইতিহাস • সভ্যতা ও সংস্কৃতি • সাংস্কৃতিক বহুত্ব ও পারস্পরিক সহাবস্থান
জীবন ও জীবিকা*		
মূল্যবোধ ও নৈতিকতা		• বৈচিত্র্য ও সহনশীলতা • সামষ্টিক চেতনা • শিষ্টাচার ও ন্যায়বোধ

শিখন-ক্ষেত্র	সমন্বিত বিষয়/বিষয়সমূহের জন্য প্রাসঙ্গিক থিম/ইস্যুসমূহ
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা	• ব্যক্তিগত পরিচর্যার মাধ্যমে সুরক্ষা ও ইতিবাচক জীবন ধারার চর্চা • আবেগ ব্যবস্থাপনা ও এ-সংক্রান্ত ঝুঁকিসমূহ • নিজের সামাজিক ও মানবিক গুণাবলি ও দক্ষতার চর্চা
শিল্প ও সংস্কৃতি	• দেশীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধারার শিল্পকলা • শিল্পকলার এক বা একাধিক শাখায় সৃষ্টিশীলতা • সামাজিক বা পেশাগত কাজে শিল্পকলার সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা • সংবেদনশীলতা ও মানবিক আচরণ
**জীবন ও জীবিকা* শিখন-ক্ষেত্রের আলোকে একটি ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে বিধায় সমন্বিত বিষয়ে এই শিখনক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।	

২.১৪ শিখন সময় (Learning Time) ও শিখন সময়ের বিষয়ভিত্তিক বণ্টন

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মূল কৌশল হচ্ছে অভিজ্ঞতাভিত্তিক সক্রিয় শিখন – যা শুধু শ্রেণিকক্ষে পাঠদান প্রক্রিয়া বা সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার্থী বিভিন্ন কৌশলে শ্রেণিকক্ষে, বিদ্যালয়ে, বাড়িতে, নিকট পরিবেশে বিভিন্ন কার্যক্রম ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখন সম্পন্ন করে নির্ধারিত যোগ্যতাসমূহ অর্জন করে। এরূপ নানাবিধ শিখন শেখানো কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনা করতে হলে পর্যাপ্ত শিখন সময় থাকা প্রয়োজন তবে তা শুধু শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক নয়। বিভিন্ন দেশের শিক্ষাক্রমে শিখন সময়কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ইউনেস্কোর শিক্ষাক্রম পরিভাষায় শিখন সময়ের বিভিন্ন পরিভাষা ও তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। যেমন : কনট্যাক্ট পিরিয়ড (**Contact period**) বলতে শ্রেণিকক্ষ ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সক্রিয় শিখন শেখানো সময়কে ধরা হয়েছে। ইন্সট্রাকশনাল টাইম (**Instructional time)** বলতে সেই নির্দিষ্ট সময়কে বোঝানো হয়েছে যেখানে শ্রেণিকক্ষে বা ভার্চুয়াল পরিবেশে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাছ থেকে সরাসরি শিখনের জন্য সহায়তা পেয়ে থাকে। আবার শিখন সময় (**Learning time**) বলতে সেই নির্দিষ্ট সময়কে বিবেচনা করা হয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে কোনো শিখন-সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত থাকে অথবা কার্যকর শিখনে নিবিষ্ট থাকে।[৩] যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে যোগ্যতা অর্জনের জন্য একজন শিক্ষার্থীকে যেহেতু বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং এই অভিজ্ঞতা সব সময় বিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না ও থাকতে পারে বিধায় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় শিখন সময়কে শ্রেণিকক্ষ ও শ্রেণিকক্ষের বাহিরে সক্রিয় শিখনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সময়কে বিবেচনা করা হয়েছে। ফলে শিখন সময়ের হিসাবও শুধু শ্রেণিকক্ষেও জন্য প্রদত্ত সময় ধরে করা হয়নি। বরং শিক্ষার্থী একক বা পারস্পরিকভাবে সব মিলিয়ে শিখন কার্যক্রমে যে সময়টুকু ব্যয় করবে তার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নে বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে শিখন সময়ের একটি পরিকল্পনা দেয়া হলো।

মোট ছুটি = ৮৫ দিন[৪] + ৫২ দিন (শুক্রবার) = ১৩৭ দিন

সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন ধরে মোট কর্মদিবস = ৩৬৫ দিন - ১৩৭ দিন - ৪০ (৫২-৯-৩) দিন = **১৮৫ দিন** [৫]

[3] http://www.ibe.unesco.org/es/node/12011

[4]http://www.dpe.gov.bd/sites/default/files/files/dpe.portal.gov.bd/notices/5545a07b_dc5d_460d_8b0c_fec2e21be5d4/Class%20routine%20(revised)%20(1).pdf

[5] ৫২টি শনিবারের মধ্যে ৯টি শনিবার অন্যান্য ছুটির (৮৫ দিন) মধ্যে পড়েছে তাই অবশিষ্ট ৪৩টি শনিবার ধরে হিবেস করা হয়েছে।

সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন (শুক্রবার ও শনিবার) ধরে শিখন সময় প্রাক্কলন

শ্রেণি	শিখন ঘন্টা (স্কুল)		শিখন ঘণ্টা (বাহির)	মোট শিখন ঘণ্টা	মন্তব্য
প্রাক-প্রাথমিক	২.৫ x ১৮৫	৪৬২.৫	৩৭.৫	৫০০	শুক্র ও শনিবার ছুটি
১ম - ৩য়	৩.৫ x ১৮৫	৫৫৫	৭৫	৬৩০	শুক্র ও শনিবার ছুটি
৪র্থ - ৫ম	৪ x ১৮৫	৭৪০	১০০	৮৪০	শুক্র ও শনিবার ছুটি
৬ষ্ঠ - ৮ম	৫ x ১৮৫	৯২৫	১২৫	১০৫০	শুক্র ও শনিবার ছুটি
৯ম - ১০ম	৫.৫ x ১৮৫	১০১৭.৫	১০০	১১১৭.৫	শুক্র ও শনিবার ছুটি
১১শ - ১২শ	৫.৫ x ১৮৫	১০১৭.৫	১৫০	১১৬৭.৫	শুক্র ও শনিবার ছুটি

শিখনঘণ্টা (স্কুল) বলতে স্কুল কর্মদিবসে শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের ভিতরে শিখন-শেখনো কাজে ব্যবহৃত সময়কে বোঝানো হয়েছে। শিখনঘণ্টা (বাহির) বলতে বিদ্যালয়ের বাহিরে অথবা স্কুল কর্মদিবস ব্যতিত অন্যান্য দিনে বিদ্যালয়ের ভিতরে পরিকল্পিত শিখন কাজের জন্য ব্যয়িত সময়কে বিবেচনা করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম রূপকল্পে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন, অনুসন্ধানমূলক শিখন ও প্রজেক্টভিত্তিক শিখনকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই ধরনের শিখনের জন্য শিক্ষার্থীকে পরিকল্পিতভাবে বিদ্যালয়ের বাহিরে বা ভিতরে তথ্য সংগ্রহ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, ক্যাম্পেইনসহ বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হতে হবে। এসব কাজের জন্য প্রদত্ত সময়কে শিখনঘণ্টা বাহির হিসেবে প্রাক্কলন করা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণিতে শিখনঘন্টা বাহিরের জন্য ন্যূনতম সময় বিবেচনা করে প্রাক্কলন করা হয়েছে যা শিখনঘন্টা (স্কুল) এর ১০% থেকে ১৫% সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে, বাড়িতে নিজ উদ্যোগে পড়া-লেখা করা বা তথাকথিত বাড়ির কাজ করা এই সময়ের আওতাধীন নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, OECD ও এর সহযোগী দেশের ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত গড় শিখন ঘণ্টা ৭৯৯ এবং ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত গড় শিখন ঘন্টা ৯১৯ ঘন্টা।

উপর্যুক্ত হিসেব অনুযায়ী বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো সপ্তাহে দুইদিন ছুটি বিবেচনায় নিয়েও যথাযথ শিখন সময় বরাদ্দ করা সম্ভব । প্রচলিত ছুটির হিসেবকে বিবেচনায় রেখে মোট কর্মদিবস ১৮৫ দিন প্রাক্কলন করা হয়েছে । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শুক্রবার ও শনিবার দুইদিন সাপ্তাহিক ছুটি থাকবে। দশম শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষায় বর্তমানে ৩২ কর্মদিবস প্রয়োজন হয়, নতুন শিক্ষাক্রমে বিষয় বিন্যাস ও মূল্যায়ন কৌশল পরিবর্তনের কারনে এ পরীক্ষা ৫ কর্মদিবসেই সম্পন্ন হবে। প্রাথমিক স্তরে এ ক্ষেত্রে আরো সময় বেশি পাওয়া যাবে। তাছাড়া বর্তমানে দুইটি সাময়িক পরীক্ষার জন্য ১২ কর্মদিবস করে মোট ২৪ কর্মদিবস এর স্থলে নতুন শিক্ষাক্রমে ৫ কর্মদিবস করে মোট ১০ কর্মদিবস প্রয়োজন হবে। এছাড়া শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, জাতীয় শোক দিবস এবং বিজয় দিবস এই ৫টি জাতীয় দিবসের কার্যক্রম নতুন শিক্ষাক্রমে শিখন সময় (বাহির) এর অন্তর্ভুক্ত বিধায় এখানে কর্মদিবস হিসেবে ধরা হয়েছে।

ওইসিডি (OECD) ও এর সহযোগী দেশসমূহের বাৎসরিক গড় স্কুল দিবস হলো ১৮৫ দিন এবং ইউরোপিয়ান ২৩টি দেশের বাৎসরিক গড় স্কুল দিবস হলো ১৮১ দিন। প্রতিবেশি দেশ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে স্কুল কর্মদিবস বিভিন্ন, যেমন মেঘালয়ে ১৯২ দিন আবার মহারাষ্ট্রে ২০০ দিন। এই প্রেক্ষিতে সপ্তাহে দুইদিন ছুটি হিসেব করে প্রস্তাবিত মোট কর্মদিবস ও শিখন ঘন্টা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ।

শিখন সময়ের বিষয়ভিত্তিক বণ্টন

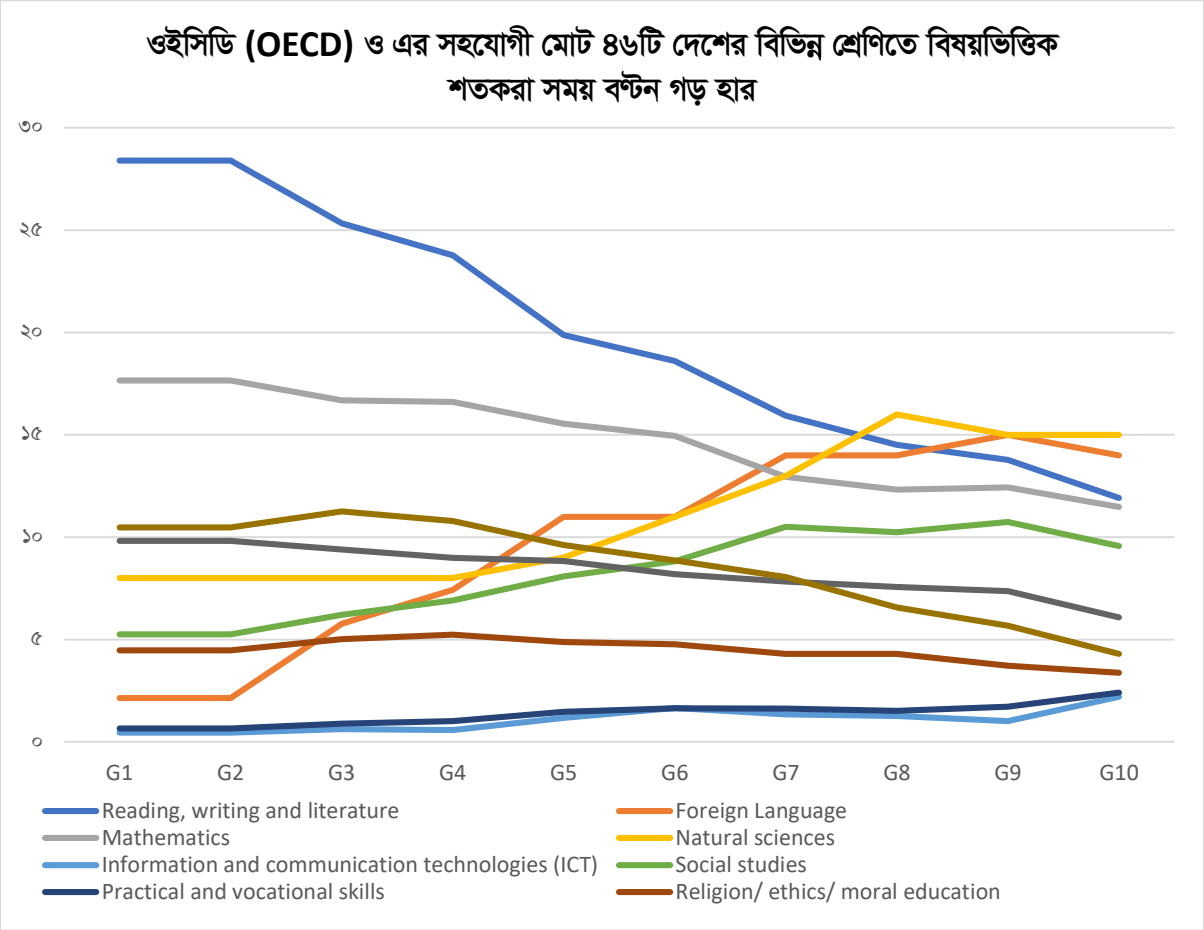

তথ্যসূত্র: Education at a Glance 2019; OECD INDICATORS.

ওইসিডি (OECD) ও এর সহযোগী দেশসমূহের ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার প্রায় ৪৬টি দেশের মোট শিখন সময়ের বিষয়ভিত্তিক বন্টনের শতকরা হার ওপরের গ্রাফে দেখানো হয়েছে। উপরিউক্ত গ্রাফ অনুযায়ী ওইসিডি (OECD) ও এর সহযোগী দেশসমূহে গড়ে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা, গণিত ও শিল্পকলা বিষয়ে মোট শিখন সময়ের ৫২% সময় বরাদ্দ রাখা হয়। কিন্তু, মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা, বিদেশি ভাষা ও গণিত বিষয়ের জন্য মোট শিখন সময়ের ৪২% সময় বরাদ্দ থাকে। বিভিন্ন দেশের শ্রেণি অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক সময় বণ্টন পর্যালোচনা, বাংলাদেশের বিষয়ভিত্তিক সময় বণ্টনের প্রেক্ষিত বিবেচনা করে, সেই সঙ্গে প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম রূপরেখার চাহিদার প্রেক্ষিতে বিষয়ভিত্তিক সময় বণ্টনের প্রস্তাবিত গড়ন নিম্নরূপ :

বিষয়ভিত্তিক শিখন সময়ের শতকরা হার

বিষয়/শিখন-ক্ষেত্র	শিখন সময় (%) প্রাক-প্রাথমিক		শিখন সময় (%) প্রাথমিক					শিখন সময় (%) মাধ্যমিক						
শ্রেণি	-২	-১	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম	১১শ	১২শ
বাংলা	২৫	২৫	২৮	২৮	২৮	২০	২০	১৮	১৬	১৫	১৪	১২	২৫	২৫
ইংরেজি			৮	৮	৮	১২	১২	১২	১২	১৪	১৪	১৪		
গণিত	২০	২০	১৮	১৮	১৮	১৬	১৬	১৫	১৩	১২	১২	১২		
বিজ্ঞান	১০	১০	১০	১০	১০	১৪	১৪	১৪	১৪	১৫	১৪	১৫		
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি								৫	৫	৫	৫	৫		
সামাজিক বিজ্ঞান	১০	১০	১০	১০	১০	১২	১২	১২	১৩	১৩	১৩	১৫		
জীবন ও জীবিকা								৫	৮	৮	১০	১০		
ধর্ম শিক্ষা	৮	৮	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬		
ভালো থাকা	১২	১২	১০	১০	১০	১০	১০	৮	৮	৭	৭	৬		
শিল্প ও সংস্কৃতি	১৫	১৫	১০	১০	১০	১০	১০	৫	৫	৫	৫	৫		
বিশেষায়িত													৭৫	৭৫
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক সময়ে মাতৃভাষা, গণিত ও শিল্প সংস্কৃতি শিখনক্ষেত্রে শিশুদের অধিক সময় বরাদ্দ করা হয়েছে যা প্রাক-প্রাথমিকে মোট স্কুল শিখন সময়ের প্রায় ৬০% এবং প্রাথমিক স্তরে বাংলা, গণিত ও শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ে প্রায় ৫৬% শিখন সময় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৯ম-১০ম শ্রেণিতে মোট শিখন সময়ের প্রায় ৪৫% সময় বরাদ্দ করা হয়েছে ইংরেজি, সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য।

Working Draft

সপ্তাহে দুইদিন ছুটি বিবেচনায় মোট শিখন ঘন্টার বিষয়ভিত্তিক বণ্টন নিম্নরূপ;

বিষয়	শিখন সময় (ঘণ্টা) প্রাক-প্রাথমিক		শিখন সময় (ঘণ্টা) প্রাথমিক					শিখন সময় (ঘণ্টা) মাধ্যমিক						
	-২	-১	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম	১১শ	১২শ
বাংলা	১২৫	১২৫	১৭৬	১৭৬	১৭৬	১৬৮	১৬৮	১৮৯	১৬৮	১৫৮	১৫৭	১৩৪	৩৫০	৩৫০
ইংরেজি			৫০	৫০	৫০	১০১	১০১	১২৬	১২৬	১৪৭	১৫৭	১৫৭		
গণিত	১০০	১০০	১১৩	১১৩	১১৩	১৩৪	১৩৪	১৫৮	১৩৭	১২৬	১৩৪	১৩৪		
বিজ্ঞান	৫০	৫০	৬৩	৬৩	৬৩	১১৮	১১৮	১৪৭	১৪৭	১৫৮	১৫৭	১৬৮		
ডিজিটাল প্রযুক্তি								৫৩	৫৩	৫৩	৫৬	৫৬		
সামাজিক বিজ্ঞান	৫০	৫০	৬৩	৬৩	৬৩	১০১	১০১	১২৬	১৩৭	১৩৭	১৪৫	১৬৮		
জীবন ও জীবিকা								৫৩	৮৪	৮৪	১১২	১১২		
ধর্ম শিক্ষা	৪০	৪০	৩৮	৩৮	৩৮	৫০	৫০	৬৩	৬৩	৬৩	৬৭	৬৭		
ভালো থাকা	৬০	৬০	৬৩	৬৩	৬৩	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪	৭৪	৭৮	৬৭		
শিল্প ও সংস্কৃতি	৭৫	৭৫	৬৩	৬৩	৬৩	৮৪	৮৪	৫৩	৫৩	৫৩	৫৬	৫৬		
বিশেষায়িত													৮১৭	৮১৭
মোট	৫০০	৫০০	৬৩০	৬৩০	৬৩০	৮৪০	৮৪০	১০৫০	১০৫০	১০৫০	১১১৮	১১১৮	১১৬৭	১১৬৭

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে আবশ্যিক বিষয়সমূহের জন্য মোট শিখন সময়ের ২৫% সময় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। নৈর্বাচনিক ৩টি বিশেষায়িত বিষয়মূহের জন্য মোট শিখন সময়ের ৭৫% সময় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া একটি ঐচ্ছিক প্রায়োগিক বিষয়ের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আলাদা করে সময় বরাদ্দ করবে।

প্রতিটি স্তরের জন্য মোট শিখন সময়কে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই সময়কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারবে। আবার যেসব বিষয় ও শিখন-ক্ষেত্রে স্কুল সময়ের বাহিরের পরিবেশে যোগ্যতা অর্জনের প্রাধান্য রয়েছে সেসব ক্ষেত্রেও এই শিখন সময়কে ব্যবহার করা হবে। এই শিখন সময়কে মূলত 'প্রজেক্টভিত্তিক শিখন', একাধিক বিষয় বা শিখনক্ষেত্রের আওতায় সমন্বিত শিখন এবং বিদ্যালয়ভিত্তিক সহ-শিক্ষাক্রমিক কাজের জন্য ব্যবহার করা হবে।

২.১৫ শিখন-শেখানো কৌশল

রেনেসাঁ-পরবর্তী আধুনিক যুগে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপে শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণ করার উদ্দেশ্যে যে গণশিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার আদলেই শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটেছিল বিশ্বজুড়ে।[৬] এই শিক্ষা ব্যবস্থায় মুখস্থ-নির্ভর সাক্ষরতা অর্জনের যে ধারণার উদ্ভব ঘটে সেখানে শিক্ষার্থীর নিজস্বতার তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। সেই সময়ের প্রেক্ষিতেই আচরণবাদী (Behaviourism) শিখন-শেখানো দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটে। আচরণবাদী শিখন-শেখানো মতবাদের প্রবক্তা হিসেবে প্যাবলভ, থর্নডাইক, স্কিনারের নাম উল্লেখযোগ্য (Fosnot, 1996)। আচরণবাদী শিখন-শেখানো দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষার্থী কী শিখবে, কীভাবে শিখবে, কখন শিখবে, কোথায় শিখবে, কেন শিখবে তা আগে থেকে ঠিক করে দিতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নিজস্ব চিন্তা, পছন্দ বা

[6] Robinson K (2009) The element: how finding your passion changes everything. Penguin, New York

দৃষ্টিভঙ্গির তেমন কোন গুরুত্ব থাকেনা (Glasersfeld, 1995 eds. Steffe & Gale, 1995)। আচরণবাদ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত শিখন নিশ্চিত করার জন্য বলবর্ধক বা শাস্তি প্রদান করতে হয় (Fosnot, 1996)। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীর শিখন কখন, কীভাবে কিংবা কতবার আচরণ দিয়ে প্রকাশ পাবে এবং সেগুলো কীভাবে পরিমাপ করে শিক্ষার্থীর শিখনকে মূল্যায়ন করা হবে তাও আগে থেকে ঠিক করা থাকতে হবে। আচরণবাদপ্রসূত এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই মুখস্থনির্ভর, লিখিত পরীক্ষাভিত্তিক, নম্বরভিত্তিক মূল্যায়ন, শিক্ষককেন্দ্রিক, একমুখী, তত্ত্বনির্ভর একটি শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার প্রচলন ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষক এর মূল দায়িত্ব হল জ্ঞান বিতরণ করা এবং শিক্ষার্থীর প্রধান দায়িত্ব হল সেই জ্ঞান কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়া মুখস্থ করে পুনরুৎপাদন করা। আচরণবাদনির্ভর এই কাঠামোবদ্ধ এবং অনমনীয় শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীর সৃষ্টিশীলতা পরিপন্থী এবং ব্যক্তির ব্যক্তিগত চাহিদা ও সম্ভাবনা পরিচর্যায় অপারগ। তবে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পূর্ব-নির্ধারিত যান্ত্রিক আচরণিক প্রতিক্রিয়া লাভের জন্য আচরণবাদী শিখন-শেখানো দৃষ্টিভঙ্গি বেশ কার্যকর, যা পরবর্তী কালে একটি দুর্বল শিখন প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত। তাছাড়া আচরণবাদের সঙ্গে যুক্ত হয় শিক্ষার্থীর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিকাশের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা নির্ধারণ করে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া নিরূপণ করা, যা পরিপক্বতাবাদ (Maturationism) হিসেবে পরিচিত (Fosnot, 1996)।

শিখন-প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের ধারণা শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মধ্যে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। বিশেষ করে বর্তমানের দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য শুধু জ্ঞান অর্জন করলে চলবেনা। অর্জিত জ্ঞানকে পরিবেশ অনুযায়ী অভিযোজনের জন্য প্রয়োগ করার দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গিও অর্জন করতে হবে। কাজেই শিখন কোন পূর্ব-নির্ধারিত আচরণ হুবহু অর্জন করা নয়, বরং শিক্ষার্থীর সঙ্গে পরিবেশের অবিরাম মিথস্ক্রিয়া যার মাধ্যমে তার বৈশিষ্ট্য ও পারদর্শিতা এবং পরিবেশের উপাদান উভয়ের মধ্যেই পরিবর্তন ঘটবে এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থী পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের জ্ঞান-দক্ষতা-দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার এই ধারণা গঠনবাদ/ জ্ঞানীয় বিকাশ তত্ত্ব (constructivism/Cognitivism) নামে পরিচিত, যার প্রবক্তা জ্যা পিঁয়াজে। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় গঠনবাদের ধারণা প্রাথমিক পর্যায়ে পরিপক্বতাবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিল, যার ফলে বিকাশের স্তর অনুযায়ী শিক্ষার্থীর শিখনের ধারা নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তী কালে গবেষকগণ পর্যবেক্ষণ করেন যে, শিশুকে ভাব বিনিময় দক্ষতা এবং সৃষ্টিশীলতা, চিন্তাশীলতা, অভিজ্ঞতা, পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করার পরিবেশ দিতে পারলে সে শিখনের পরিপক্বতার ধারণাকেও অতিক্রম করে যেতে পারে। শিখনের এই উত্তরাধুনিক যুগের ধারণাই সামাজিক গঠনবাদ (Social constructivism) হিসেবে পরিচিত। এর প্রধান প্রবক্তা হলেন রুশ দার্শনিক লেভ ভাইগটস্কি (Richardson, 1997; Fosnot, 1996) । এই মতবাদ অনুযায়ী শিশু জ্ঞান মুখস্থ করার বদলে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করবে। শিক্ষক এক্ষেত্রে জ্ঞান বিতরণকারীর ভূমিকায় না থেকে সহায়ক বা মেনটর এর ভূমিকা পালন করবেন। এই শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার ধারণা অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা প্রোজেক্ট-বেজড বা প্রবলেম-বেজড লার্নিং-এর চর্চা করবে। আর নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা না করে সহযোগিতামূলক শিখনের চর্চা করবে। এর পাশাপাশি প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সক্ষমতা ও চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে শিক্ষার্থী কী শিখবে, কীভাবে শিখবে, কখন শিখবে, কোথায় শিখবে এবং কেন শিখবে তা তার নিজের পছন্দ ও পারদর্শিতা বিবেচনা করে নির্ধারিত হবে। যা ব্যক্তিগত ও স্ব-প্রণোদিত শিখনের সংমিশ্রণে পারস্পরিক যোগাযোগের ভিত্তিতে চর্চা করা হয়। কাজেই এই শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া অনেক বেশি নমনীয় এবং এর মূল্যায়নও মুখস্থনির্ভর লিখিত পরীক্ষাভিত্তিক নয়; বরং পারদর্শিতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বহুমুখী এবং বহু অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি পরিপূর্ণ বিকাশের পোর্টফলিও তৈরির মাধ্যমে করা হয়। পরিবেশ ও প্রতিবেশের সঙ্গে মানুষের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে যে সহাবস্থান তার উপরে ভিত্তি করে মানুষের শিখন-প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে আরেকটি মতবাদ প্রবর্তিত হয়েছে, যা ব্রুনফ্রেনব্রেনারের ইকলজিকাল সিস্টেম থিওরি নামে

পরিচিত। তাছাড়া বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল টেকনোলজির প্রয়োগ মানুষের শিখনের ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে পুরোপুরি। এর ফলে মানুষ এখন আর্টিফিশিয়াল বুদ্ধিমত্তা ব্যাবহার করে জ্ঞান বা তথ্য মুখস্থ করে ধারণ করেনা, বরং বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য যাচাই, সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করে নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা সৃষ্টির মাধ্যমে জ্ঞানক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতাগুলোকে পূরণ করে সমস্যা সমাধানের নতুন কৌশল বের করার চেষ্টা করে। এই ডিজিটাল টেকনোলজির প্রয়োগের ফলে মানুষের শিখনের ক্ষেত্রে বাক্তিনির্ভর স্বাধীনতা (শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও প্রেষণা অনুযায়ী শিখনের সময়, বিষয়বস্তু, শিখনের স্থান, উদ্দেশ্য, ও শিখনের প্রক্রিয়াতে বহুমাত্রিক নমনীয়তা নিশ্চিত করা) এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ স্থাপন করার ভিত্তিতে এক নতুন শিখন ধারণার উদ্ভব ঘটেছে, যা সংযোগবাদ (Connectivism) নামে পরিচিত (Siemens, 2004)। প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম রূপরেখায় এই সামাজিক গঠনবাদ ভিত্তিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া এবং সংযোগবাদকে প্রধান শিখন ধারণা ও প্রায়োগিক কৌশল হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ডিজিটাল টেকনোলজির প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মাঝে আন্তঃযোগাযোগ স্থাপন করার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম রূপরেখায় এই সামাজিক গঠনবাদভিত্তিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকেই প্রধান প্রায়োগিক কৌশল হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে, **যার মূল ভিত্তি হচ্ছে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন**। এর মাধ্যমে যে প্রক্রিয়াগুলোর চর্চার সুযোগ রাখা হয়েছে সেগুলো হল : আনন্দময় শিখন, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে ও কাজভিত্তিক বা হাতে কলমে শিখন, অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন, প্রজেক্টভিত্তিক, সমস্যাভিত্তিক এবং চ্যালেঞ্জভিত্তিক শিখন, সহযোগিতামূলক শিখন, অনুসন্ধানভিত্তিক শিখন, একক, জোড়া এবং দলীয় কাজসহ স্ব-প্রণোদিত শিখনের সংমিশ্রণ, বিষয়নির্ভর না হয়ে প্রক্রিয়া এবং প্রেক্ষাপটনির্ভর শিখন, অনলাইন শিখনের ব্যবহার ইত্যাদি। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনকে ফলপ্রসূ করতে শিক্ষকের ভূমিকাকেও স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়তামূলক ও একীভূত শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখনের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে নিজের শিখন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিজেই নিতে পারবে। শ্রেণিকক্ষের শিখন পরিবেশ হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, গণতান্ত্রিক ও সহযোগিতামূলক। প্রতিটি শিক্ষার্থীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, শিখন চাহিদা ও যোগ্যতা বিবেচনায় নিয়ে শিখনকার্যক্রম আবর্তিত হবে। শিক্ষার্থীরা বাস্তব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে Surface learning থেকে Deep learning এর দিকে ধাবিত হবে যা তাদের শিখনকে নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের বাইরেও সাধারণীকরণ করতে সাহায্য করবে। শিখনের এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের প্রতিফলনমূলক শিখনে (Reflective learning) আগ্রহী করে তুলতে শিক্ষক সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করবেন। প্রচলিত ভূমিকার ঊর্ধ্বে গিয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক হয়ে উঠবেন সহ-শিক্ষার্থী। প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের সাথে তাল মিলিয়ে প্রতিফলনমূলক শিখনের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেও ঋদ্ধ হবেন।

শিক্ষা সমাজবিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। তাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের উপর এই শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে শিক্ষকের দায়িত্ব শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে যাতে শিখন কার্যক্রম অব্যাহত থাকে সেজন্য তার পরিবার, এমনকি সমাজকেও শিখন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এই শিক্ষাক্রমে যেহেতু শিখন সময় নির্ধারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরের শিখন সময়কেও হিসেব করা হয়েছে সেজন্য শিখন অভিজ্ঞতা পরিকল্পনায় শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পরিসরের সংশ্লিষ্টতাও বিবেচনা করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম রূপরেখা অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরের শিখন-শেখানো কৌশল নির্ভর করবে শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা, বিকাশের পর্যায় ও আগ্রহের ওওপর। প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত শিখন-শেখানো কৌশল প্রধানত হবে খেলা, ক্রিয়াকলাপভিত্তিক (play and activity based) ও অনুসন্ধানমূলক। টিমটিচিং বা ব্লক টিচিংকে উৎসাহিত করা হবে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন খেলা ও কাজের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে শিখনে অংশগ্রহণ করবে এবং আনন্দের সঙ্গে জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, গুণাবলি ও চেতনার উন্নয়ন ঘটাবে। শিখন-শেখানো পদ্ধতির অংশ হিসেবে প্রধানত গাঠনিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করা হবে। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিখন-শেখানো

কৌশলের পরিসর হবে আর একটু বৃহত্তর ও সমন্বিত। শিক্ষার্থীদের শিখনে খেলা ও হাতে-কলমে কাজের পাশাপাশি অনুসন্ধানমূলক শিখন ও সমস্যা সমাধানমূলক শিখনকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির শিখন-শেখানো কৌশল হবে আরো সংগঠিত। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের শিখন পরিচালিত হবে। সকল শ্রেণিতে বিভিন্ন শিখন-শেখানো কৌশল প্রয়োগের পাশাপাশি সুসংগঠিত অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন-শেখানো কৌশলের (প্রজেক্টভিত্তিক শিখন) মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উঁচু স্তরের চিন্তন দক্ষতা অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকবে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিখন-শেখানো কৌশল বাস্তবায়নে প্রতিটি বিষয়ের জন্য বিশেষায়িত শিক্ষকের ব্যবস্থা থাকবে। শিখন-শেখানো কৌশল হবে বিশেষত অভিজ্ঞতাভিত্তিক। শিখন-শেখানো কৌশল বিষয়বস্তুনির্ভর না হয়ে হবে প্রক্রিয়ানির্ভর। শিখন-শেখানো কৌশলে প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী হাতে কলমে শিখন, প্রজেক্ট এবং সমস্যাভিত্তিক শিখন, সহযোগিতামূলক শিখন, অনুসন্ধানভিত্তিক শিখন, স্ব-প্রণোদিত শিখনের সংমিশ্রণ ব্যবহার করা হবে, পাশাপাশি অনলাইন শিখনের ব্যবহারও উৎসাহিত করা হবে। নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সকল শ্রেণিতে প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শিখন কৌশল অনুসৃত হবে।

শিখন-শেখানো সামগ্রী :

বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাক্রমের মূল বাহন হলো শিখন-শেখানো সামগ্রী। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য প্রণীত শিখন-শেখানো সামগ্রী যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতাসমূহ শিক্ষার্থীরা অর্জন করে। শিক্ষাক্রম রূপরেখায় শিখন-শেখানো সামগ্রী বলতে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত ওয়ার্কবুক, পাঠ্যপুস্তক, সম্পূরক পঠন-সামগ্রী, গল্প ও ছড়ার বই, চার্ট, কার্ড, মডেল এবং শিক্ষকের জন্য শিক্ষক সংস্করণ বা শিক্ষক নির্দেশিকাকে বোঝানো হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন উপকরণ, চারপাশের পরিবেশের উপাদান ইত্যাদিও শিখন-শেখানো সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

প্রাক-প্রাথমিক: প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য মূল শিখন-শেখানো সামগ্রী হলো শিক্ষক সহায়িকা। এ পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা যেহেতু পড়তে বা লিখতে পারে না তাই প্রাক-প্রাথমিকের সকল যোগ্যতা অর্জনের জন্য বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হবে শিক্ষক সহায়িকাতে। শিক্ষক সহায়িকাতে উল্লেখিত নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন খেলা ও কাজের মাধ্যমে শিখন অভিজ্ঞতা নিয়ে শিক্ষার্থীরা মূলত এই পর্যায়ের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতাসমূহ অর্জন করবে। শিক্ষক সহায়িকার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য ওয়ার্কবুক, গল্প ও ছড়ার বই, চার্ট, কার্ড, মডেল উন্নয়নসহ খেলনা ও বিভিন্ন উপকরণ, অডিও-ভিজুয়াল সংগ্রহ ও সরবরাহ করা হবে।

প্রাথমিক (১ম থেকে ৩য়) : এ স্তরের একটি মূল উদ্দেশ্য হলো শিশুদের পড়তে, লিখতে ও অনুসন্ধান করতে শেখাকে নিশ্চিত করা। শিশুরা যেহেতু এই স্তরেও ঠিকমতো মুক্ত পাঠের দক্ষতা অর্জন করেনা তাই এই স্তরের মূল শিখন-শেখানো সামগ্রী হলো শিক্ষক নির্দেশিকা। শিক্ষক নির্দেশিকাতে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন খেলা, কাজ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখন যোগ্যতাসমূহ অর্জন করবে। বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক নির্দেশিকার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী ওয়ার্কবুক, পাঠ্যপুস্তক, সম্পূরক পঠন-সামগ্রী, চার্ট ও কার্ডের উন্নয়নসহ খেলনা সামগ্রী, অডিও-ভিজুয়াল ও বিভিন্ন উপকরণ প্রচলন করা হবে। পারিবারিক ও সামাজিক পরিসর ও প্রেক্ষাপট ও শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতা অর্জনের অন্যতম উপাদান।

প্রাথমিক (৪র্থ থেকে ৫ম) : এই স্তরের শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে পড়তে ও লিখতে পারে তাই শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক ও বিভিন্ন সম্পূরক পঠন সামগ্রী থাকবে। তবে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষায় শিখন অভিজ্ঞতাই যেহেতু শিখন অর্জনের মূল সেহেতু শিক্ষক নির্দেশিকা এক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। পাঠ্যপুস্তক সহায়ক হলেও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দক্ষতা, মূল্যবোধ, গুণাবলি ও চেতনার বিকাশের জন্য তাদের নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা ও হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে যেতে হবে পাশাপাশি বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের তাদের বিকাশের অবস্থা, শিখন

চাহিদা ও আগ্রহ বিবেচনায় প্রাসঙ্গিক শিখন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে পরিচালিত করার জন্য শিক্ষকদের জন্য থাকবে শিক্ষক নির্দেশিকা। এছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী ওয়ার্কবুক, সম্পূরক পঠন-সামগ্রী, চার্ট ও কার্ডের উন্নয়নসহ স্থানীয় উপকরণ, অডিও-ভিজুয়াল, পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ শিখন উপকরণ/সামগ্রী/উপাদান হিসেবে প্রচলন করা হবে।

মাধ্যমিক : মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্যও পাঠ্যপুস্তক এবং বিভিন্ন পঠন-সামগ্রী থাকবে। এছাড়াও শিক্ষাক্রম রূপরেখার কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, চেতনা, মূল্যবোধ, গুণাবলি অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা ও আগ্রহ বিবেচনায় প্রাসঙ্গিক শিখন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের পরিচালিত করার জন্য শিক্ষকদের জন্য থাকবে শিক্ষক নির্দেশিকা। এর বাইরে প্রয়োজন অনুযায়ী ওয়ার্কবুক, সম্পূরক পঠন-সামগ্রী, চার্ট, কার্ড ও অডিও-ভিজ্যুয়াল সামগ্রীর উন্নয়ন ও প্রচলন করা হবে। এক্ষেত্রে পরিবার, বিদ্যালয়, সামাজিক পরিবেশ শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে।

২.১৬ মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং ব্যবস্থা

মূল্যায়ন শিক্ষাব্যবস্থার একটি অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষাক্রম রূপরেখায় মূল্যায়নকে কেবল শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পুরো শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন, শিখন পরিবেশের মূল্যায়ন ও সেই সঙ্গে শিখনের মূল্যায়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে মুখস্থ বিদ্যাভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি থেকে সরে এসে বহুমাত্রিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন মাত্রার জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, গুণাবলি ও চেতনা বিকাশের ধারাকে মূল্যায়নের আওতায় আনা হয়েছে। সকল ধরনের শিখন মূল্যায়নের ভিত্তি হবে যোগ্যতা।

শিখন মূল্যায়ন

শিখন অগ্রগতি পরিমাপের জন্য কী ধরনের মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত কীভাবে নানা পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবহার করা হচ্ছে, তার উপর শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনের সাফল্যের মাত্রা অনেকাংশে নির্ভর করে। শিখনের এই উত্তরাধুনিক যুগের সামাজিক গঠনবাদী ধারণা অনুযায়ী মূল্যায়ন কৌশল গতানুগতিক নয়। এছাড়া যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, ও গুণাবলির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে যোগ্যতার পরিমাপ করা। কাজেই জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও গুণাবলিকে পৃথকভাবে মূল্যায়ন না করে এই উপাদানগুলোর মিথস্ক্রিয়ায় অর্জিত সক্ষমতার মূল্যায়ন করা জরুরি। এই মতবাদ (The theory of planned behavior-**Icek Ajzen, 1991**) অনুযায়ী শিক্ষাক্রম রূপরেখায় মূল্যায়নের যে কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলো হল : শিখনকালীন মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব দিয়ে বহুমাত্রিক উপায়ে মূল্যায়ন, শিখনের জন্য মূল্যায়ন এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন, পর্যবেক্ষণ, প্রতিফলনভিত্তিক ও প্রক্রিয়া নির্ভর মূল্যায়ন, ধারাবাহিক মূল্যায়ন, সতীর্থ মূল্যায়ন, অংশীজন মূল্যায়ন, মূল্যায়নে টেকনোলজির (অ্যাপস) ব্যবহার, মূল্যায়নে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করা এবং ইতিবাচক ফলাবর্তন প্রদান।

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে মূল্যায়নের যেসকল বিষয় অনুসরণ করা হবে সেগুলো হলো :

- শিখনের জন্য শিখনকালীন মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ;
- পরীক্ষাভিত্তিক সামষ্টিক মূল্যায়ন হ্রাস;
- বিকল্প মূল্যায়ন (স্ব-মূল্যায়ন, সহপাঠি বা দল কতৃক মূল্যায়ন ইত্যাদি) ব্যবস্থা চালু;
- যোগ্যতার মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণ;
- মূল্যায়নের মূলনীতি অনুসরণ;
- মূল্যায়নের ধারাবাহিক রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

Working Draft

শিক্ষাক্রমে মূল্যায়ন কৌশলের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা নিচে চিত্রের মাধ্যমে উল্লেখ করা হল-

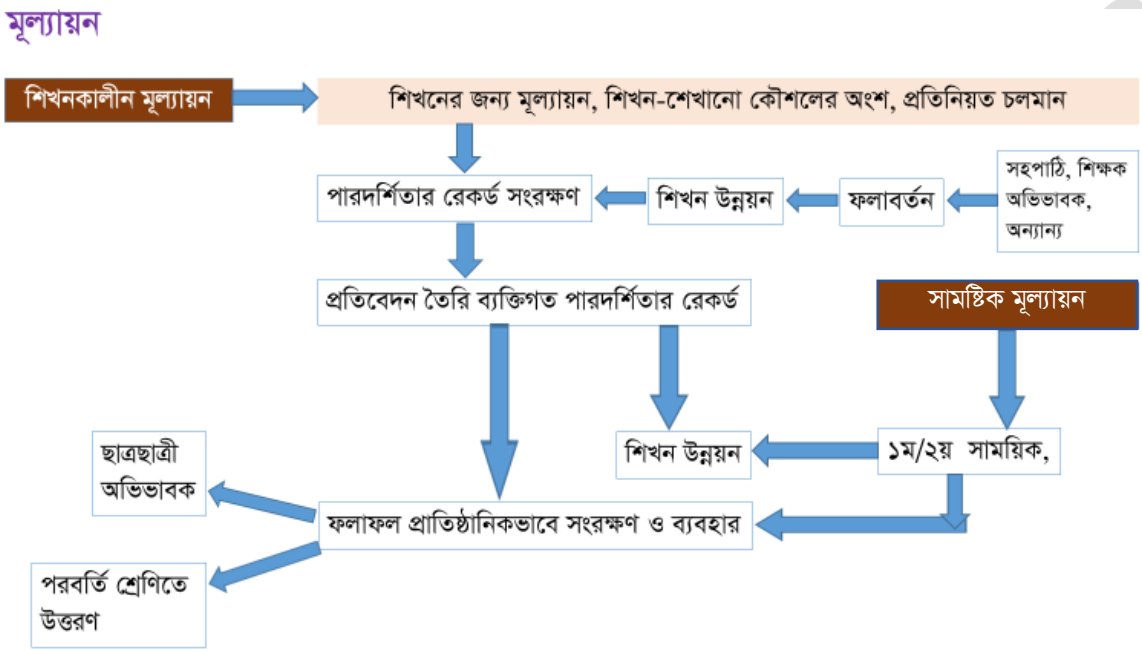

মূল্যায়ন কৌশল

স্তরভিত্তিক মূল্যায়ন কৌশল এর সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

প্রাক-প্রাথমিক	প্রাথমিক		মাধ্যমিক		
	১ম - ৩য় শ্রেণি	৪র্থ - ৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ - ৮ম শ্রেণি	৯ম - ১০ম শ্রেণি	১১শ - ১২শ
শিখনকালীন মূল্যায়ন (১০০%)	শিখনকালীন মূল্যায়ন (১০০%)	শিখনকালীন মূল্যায়ন (৭০%) সামষ্টিক মূল্যায়ন (৩০%)	শিখনকালীন মূল্যায়ন (৬০%) সামষ্টিক মূল্যায়ন (৪০%)	শিখনকালীন মূল্যায়ন (৫০%) সামষ্টিক মূল্যায়ন (৫০%) পাবলিক পরীক্ষা (১০ম শ্রেণি শেষে শুধুমাত্র ১০ম শ্রেণির উপর) ▪ সামষ্টিক মূল্যায়ন ▪ শিখনকালীন মূল্যায়ন	শিখনকালীন মূল্যায়ন (৩০%) সামষ্টিক মূল্যায়ন (৭০%) পাবলিক পরীক্ষা ▪ দুই ভাগে, একাদশ শ্রেণি শেষে একটি এবং দ্বাদশ শ্রেণি শেষে একটি পাবলিক পরীক্ষা

শিক্ষার্থী মূল্যায়নে শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়নের সংমিশ্রণ করা হয়েছে। প্রারম্ভিক শ্রেণিগুলোতে শিখনকালীন মূল্যায়নের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে উচু শ্রেণিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন কমে এসে এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

পাবলিক পরীক্ষা:

শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষাক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। মূল্যায়ন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে উপযুক্ত পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ। সারা বিশ্বে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে পরীক্ষা পদ্ধতির ওয়াশব্যাক ইফেক্ট (Washback Effect) এর কারণে শিক্ষাক্রমের অর্জন, শিখন-শেখানো পদ্ধতি, শিখন সংস্কৃতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।[৭] শেখার চেয়ে পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়াই মূল উদ্দেশ্য হয়ে যেতে পারে। শিক্ষাক্রমে যোগ্যতাকে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং গুণাবলি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি বিশেষত পাবলিক পরীক্ষা শিক্ষার্থীর মূলত বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ (Cognitive development) মূল্যায়ন করে। তাই প্রচলিত পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতি বহাল রেখে শিক্ষাক্রমের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পাশাপাশি দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং গুণাবলি ও মূল্যবোধ অর্জন সম্ভবপর হবে না। তাই পাবলিক পরীক্ষায় সামষ্টিক মূল্যায়নের পাশাপাশি শিখনকালীন মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম রূপরেখা অনুযায়ী,

- দশম শ্রেণির শেষে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
- একাদশ শ্রেণি শেষে এবং দ্বাদশ শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তবে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির সম্মিলিত ফলাফলের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হবে।

দশম শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষা

দশম শ্রেণির ১০ টি বিষয়ের মধ্যে ৫টি বিষয়ে (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান) সামষ্টিক মূল্যায়ন ও শিখনকালীন মূল্যায়ন উভয়ের ভিত্তিতেই শিক্ষার্থীকে ম্যূলায়ন করা হবে। অবশিষ্ট ৫টি থিমভিত্তিক বিষয় (জীবন ও জীবিকা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, ভালো থাকা, ধর্ম শিক্ষা এবং শিল্প ও সংস্কৃতি) বিদ্যালয়ে শিখনকালীন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে।

বিষয়সমূহ	শিখনকালীন মূল্যায়ন	সামষ্টিক মূল্যায়ন
বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান	৫০%	৫০%
জীবন ও জীবিকা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, ভালো থাকা, ধর্ম শিক্ষা এবং শিল্প ও সংস্কৃতি	১০০%	-

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাবলিক পরীক্ষা

- ৩টি আবশ্যিক বিষয়ে ৩০% শিখনকালীন মূল্যায়ন ও ৭০% সামষ্টিক মূল্যায়ন হবে;

[7] Asifa Abbas and Sahiba Sarwar Thaheem, "Washback Impact on Teachers' Instruction Resulting from Students' Apathy", Research on Humanities and Social Sciences, ISSN 2224-5766 (Paper) ISSN 2225-0484 (Online), Vol.8, No.6, 2018

Lynda Taylor, Washback and impact, ELT Journal Volume 59/2 April 2005QOxford University Pressdoi:10.1093/eltj/cci030

Tsagari D., Cheng L. (2017) Washback, Impact, and Consequences Revisited. In: Shohamy E., Or I., May S. (eds) Language Testing and Assessment. Encyclopedia of Language and Education (3rd ed.). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02261-1_24

Working Draft

- ৩টি নৈর্বাচনিক/ বিশেষায়িত বিষয়ে বিষয়-কাঠামো ও ধারণায়ন অনুযায়ী সামষ্টিক মূল্যায়নের পাশাপাশি প্রজেক্টওয়ার্ক-ভিত্তিক মূল্যায়ন, প্র্যাক্টিক্যাল ও অন্যান্য উপায়ে শিখনকালীন মূল্যায়নের সুযোগ থাকবে;
- প্রায়োগিক ১ টি বিষয় বা ঐচ্ছিক বিষয়ে হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে শিখনকালীন মূল্যায়ন হবে।

শিখন মূল্যায়নের মূলনীতি:

- যেকোনো ধরনের মূল্যায়নের ভিত্তি হলো যোগ্যতা। জ্ঞান, দক্ষতা, চেতনা, গুণাবলি ও মূল্যবোধ যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। তবে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা না করে তাদের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বিবেচনা করে মূল্যায়ন পরিকল্পনা করতে হবে।
- মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়নকে নিশ্চিত করতে হবে। মূল্যায়নের উদ্দেশ্য বিবেচনা করে মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। কী মূল্যায়ন করতে হবে তার ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন পদ্ধতি ঠিক করতে হবে। মূল্যায়ন শুধুমাত্র পেপার-পেন্সিল পরীক্ষার ওপর নির্ভর না করে পর্যবেক্ষণ, পোর্টফোলিও, প্রতিফলনভিত্তিক ও প্রক্রিয়া নির্ভর মূল্যায়ন, ধারাবাহিক মূল্যায়ন, সতীর্থ মূল্যায়ন, অংশীজন মূল্যায়ন ও মুল্যায়নে টেকনোলজির (অ্যাপস) ব্যবহার করা যেতে পারে।
- শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন অর্জনকে স্বীকৃতি দেয়া ও প্রশংসা করার পাশাপাশি তার পরিপূর্ণ সম্ভাবনার বিকাশ ও দুর্বলতাসমূহ দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- শিখনকালীন মূল্যায়ন সম্পূর্ণরূপে অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় পরিচালন করতে হবে। শিখনকালীন মূল্যায়ন শিখন-শেখানো কার্যাবলীর অংশ হিসেবে অনুশীলন করতে হবে।
- মূল্যায়নের রেকর্ড যথাযথ উপায়ে সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু রেকর্ড সংরক্ষণের চাইতে মূল্যায়নের মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
- মূল্যায়ন কৌশল এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে এর ফলাফল ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হয়। এক্ষেত্রে সতীর্থ মূল্যায়ন, স্ব-মূল্যায়ন, পোর্টফোলিও সংরক্ষণসহ প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন উপায় গ্রহণ করা যেতে পারে।

রিপোর্টিং

প্রচলিত নম্বরভিত্তিক রিপোর্ট কার্ডের পরিবর্তে বর্ণনামূলক রিপোর্ট কার্ডের প্রচলন করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন যোগ্যতা অর্জনের অগ্রগতির প্রতিফলন থাকবে। জ্ঞান, দক্ষতা, চেতনা, গুণাবলি ও মূল্যবোধ বিকাশের অবস্থা রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখ থাকবে। রিপোর্ট কার্ডের মাধ্যমেই মূলত স্কুলের সঙ্গে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। রিপোর্ট কার্ডের ভিত্তিতে স্কুল ও বিদ্যালয় যৌথভাবে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারে। শ্রেণিশিক্ষক সরাসরি অভিভাবকের নিকট রিপোর্ট কার্ড প্রদর্শন করবেন এবং শিক্ষার্থীর বিভিন্ন অর্জন ও উন্নয়নের দিক নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করবেন। এনসিটিবি ও শিক্ষা বোর্ডের সমন্বয়ে স্কুলভিত্তিক শিক্ষার্থী মূল্যায়নের রিপোর্ট কার্ড সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে প্রণয়ন ও প্রচলন করা হবে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সিস্টেমনির্ভর মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে যেন ব্যক্তির সততার উপর নির্ভর না করে সিস্টেমের মাধ্যমে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা যায়।

Working Draft

শিখন পরিবেশের মূল্যায়ন

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী কর্তৃক শিখন যোগ্যতা অর্জনের একটি প্রধান উপাদান হলো শিখন পরিবেশ। শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি শুধুমাত্র শিখন-শেখানো সামগ্রী, শিক্ষক এবং শিখন-শেখানো কৌশলের উপর নির্ভর করে না। কোন পরিবেশে শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তাও এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিখন অগ্রগতির পাশাপাশি শিখন পরিবেশ মূল্যায়ন শিক্ষাক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষাক্রম রূপরেখা শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের পাশাপাশি শিখন পরিবেশের মূল্যায়নকে যথাযথভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রয়াসে নিয়মিত শিখন পরিবেশ মূল্যায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। শিখন পরিবেশ মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল যথাযথ পর্যালোচনা করে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন

শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ব্যবস্থা মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি দেশ শিক্ষা ব্যবস্থায় কতটুকু উন্নয়ন করেছে তা বুঝতে পারে। সেই সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে শিক্ষা ব্যবস্থার কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তা বুঝতে পারে। এক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে নমুনাভিত্তিতে শিক্ষার্থীর যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন করা হয়। বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে ২০০২ সাল থেকে জাতীয় কৃতী অভীক্ষা (এনএসএ) ও মাধ্যমিক স্তরে ২০১৩ সাল থেকে Learning Assessment of Secondary Institutions (লাসি) প্রচলিত যার মাধ্যমে শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত শিখনফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন মূল্যায়নের মাধ্যমে জাতীয়ভাবে শিখন অর্জনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হয়।

শিক্ষাক্রম রূপরেখায় শিক্ষাব্যবস্থা মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের জাতীয়ভাবে যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়নের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) পরবর্তিতে মুল্যায়ন ও শিক্ষাক্রম উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-বর্গদের নিয়ে মুল্যায়নের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা (Design), মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং টুলস (Tools) উন্নয়ন ও প্রচলন করবে।

২.১৭ শিক্ষাক্রমে একীভূততা ও জেন্ডার সংবেদনশীলতা

বিশ্বব্যাপী জেন্ডার ও একীভূততার (Inclusiveness) দৃষ্টিভঙ্গির দুই ধরনের চর্চা পরিলক্ষিত হয়- ঘাটতি/সীমাবদ্ধতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি (Deficit view) এবং ন্যায্যতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি (Equitable view)। ঘাটতি/সীমাবদ্ধতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষার্থীর মধ্যেই সমস্যা উপলব্ধ হয়। এ ধরনের সমস্যার উদাহরণ হলো- শিক্ষার্থী হাঁটতে, কথা বলতে, দেখতে বা শুনতে পারে না, শিক্ষার্থীর মাঝারি/তীব্র/গুরুতর প্রতিবন্ধিতা আছে, শিক্ষার্থীর সাহায্য ও পরিচর্যাকারী প্রয়োজন হয়। অপরদিকে ন্যায্যতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে শিক্ষার্থীর পরিবর্তে শিক্ষা ব্যবস্থা ও কাঠামোর প্রতিবন্ধকতা (যেমন, নির্ধারিত শিখন যোগ্যতা সকল শিক্ষার্থীর সামর্থ্যকে বিবেচনা করে না, শিক্ষকের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা, বহুমাত্রিক ভাব বিনিময় কৌশলের অনুপস্থিতি ও উপকরণের অভাব) উপলব্ধি করে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও প্রবণতা অনুযায়ী সামগ্রিক কাঠামোকে নমনীয় করা হয় (Ahsan et al., 2012) । নিচের চিত্রে *(তথ্যসূত্রঃ একীভূত শিক্ষার কার্যপত্র সিরিজ-১*, ACIE, 2017*)* দুটি দৃষ্টিভঙ্গির একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেওয়া হলো-

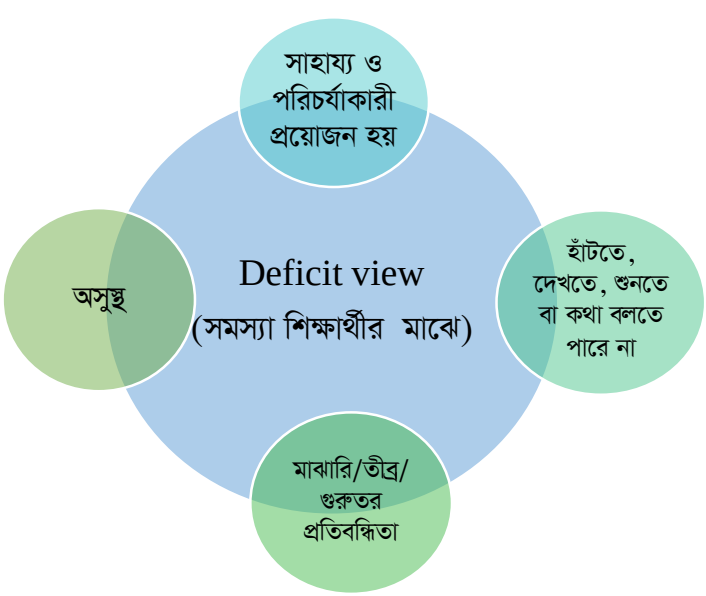

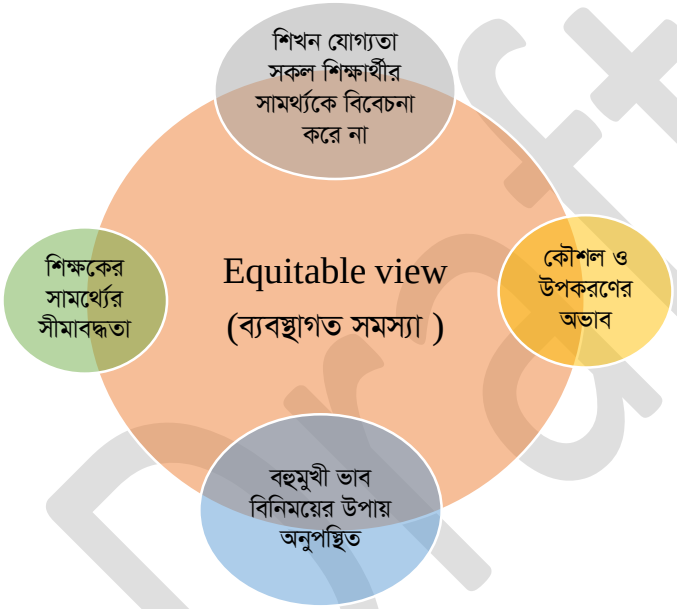

শিক্ষাক্রম রূপরেখায় জেন্ডার ও একীভূততার ন্যায্যতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি (Equitable view) গ্রহণ করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শিক্ষাক্রম রূপরেখার বিভিন্ন উপাদানে সীমাবদ্ধতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ন্যায্যতামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে অবস্থান্তরের জন্য জেন্ডার ও একীভূততা সংশ্লিষ্ট চিন্তার ক্ষেত্রে, ধারণায়, জেন্ডার ও একীভূততার লক্ষ্যদল নির্ধারণে, কর্মসূচি পরিকল্পনায়, সূচক নির্ধারণে, ও সার্বিক ধারণায় একটি বড় ধরনের রূপান্তরের প্রয়োজন। নিচে (ACIE, 2017; Ainscow, 2005; DPE, 2011) বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হল-

চিন্তার ক্ষেত্রে : শিক্ষায় জেন্ডার ও একীভূততা কোনো বিকল্প পছন্দ নয় বরং মানবাধিকার ও আইনগত দায়বদ্ধতা।

ধারণাগত ক্ষেত্রে : শিক্ষায় জেন্ডার ও একীভূততা শিক্ষা বহির্ভূত গোষ্ঠীর জন্য কোনো আলাদা ব্যবস্থা করা নয় বরং সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কাঠামো, পরিবেশ ও ব্যবস্থাগত পরিবর্তন।

লক্ষ্যদল নির্ধারন : শিক্ষায় জেন্ডার ও একীভূততা কোনো পূর্ব-নির্ধারিত গোষ্ঠীর জন্য নয় বরং বৈষম্যের শিকার সকল শিশু (শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী ও শিক্ষা বহির্ভূত) ।

কর্মসূচি পরিকল্পনায় : শিক্ষায় জেন্ডার ও একীভূততা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীকে আলাদাভাবে সেবা প্রদান করা নয় বরং ক্ষমতায়ন ও ব্যবস্থাগত পরিবর্তন করার মাধ্যমে সকলের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক চাহিদা পূরণ।

সূচক নির্ধারন : শিক্ষায় জেন্ডার ও একীভূততা শুধু শিক্ষায় প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা নয় বরং সক্রিয় অংশগ্রহণ, যোগ্যতা অর্জন ও গ্রহনযোগ্যতা নিশ্চিত করা ।

সার্বিক ধারণায় : শিক্ষায় জেন্ডার ও একীভূততা শিক্ষা কোনো বিচ্ছিন্ন সং নয় বরং শিক্ষার সার্বিক সংস্কার।

Working Draft

শিক্ষাক্রম রূপরেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো : এটি নমনীয়, সংবেদনশীল ও যোগ্যতাভিত্তিক; ফলে জেন্ডার সংবেদনশীল ও একীভূততা সহায়ক। একই সঙ্গে অতি মেধাবী শিশুদের শিখন-চাহিদা, সক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় এনে অগ্রগামী শিখনের (accelerated learning) চর্চাকেও বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে এই শিক্ষাক্রম যেন ধারণ করতে পারে তা বিবেচনায় রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থী যেন তার সবলতা অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বয়সের সীমা অতিক্রম করে দ্রুত শিখন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। একই সঙ্গে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীসহ অন্য যেকোনো শিক্ষার্থীর বিশেষ চাহিদা বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রম এবং এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বহুমাত্রিকতা/সহজীকরণ/নমনীয়তার (curriculum differentiation) সুযোগও এক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শিক্ষাক্রম রূপরেখায় শিখন সময়কে শুধু বিদ্যালয়ের পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি, বরং শিক্ষার্থীর পরিবার, এলাকা, খেলাধুলায় যে শিখন হয় তাকেও বিবেচনায় আনা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীর ব্যাক্তিগত চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রমে বহুমাত্রিকতা চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শিশুর বহুমুখী বুদ্ধিমত্তার (Gardner, ১৯৮২) ধারণাকে ব্যবহার করে কোনো শিশুর সবল দিকটিকে উৎসাহ দেয়ার মাধ্যমে তার বুদ্ধিমত্তার যে দিকগুলোতে অধিক পরিচর্যা প্রয়োজন তার জন্য ব্যবস্থার সুযোগ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ জেন্ডার, ধর্ম-বর্ণ, প্রতিবন্ধিতা, সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে শিশুর সামর্থ্য, চাহিদা ও বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্রকে বিবেচনা করে এই শিক্ষাক্রমটি উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন থেকে শুরু করে, শিখন-সামগ্রী তৈরি, শিখন-শেখানো পদ্ধতি, মূল্যায়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শ্রেণি পর্যায়ে বাস্তবায়নসহ সকল ধাপে তা জেন্ডার সংবেদনশীল ও একীভূত শিক্ষা সহায়ক করার জন্য একটি ব্যবহারিক চেকলিস্ট বা লেন্স তৈরি করা হবে যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই ব্যবহারিক চেকলিস্ট বা লেন্সটি তৈরি করার সময় একীভূত শিখন-বান্ধব আর্ন্তজাতিক বা আর্দশায়িত মানদণ্ডগুলো বিবেচনা করা হবে; যেমন : Universal Design for Learning (UDL).

২.১৮ সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষায় টিভিইটি বিষয় অন্তর্ভুক্তি এবং কারিগরি ও বৃত্তিমুলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ধারার ৬ষ্ঠ থেকে মাধ্যমিক-উত্তর (ডিপ্লোমা) স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের রূপরেখা

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকার বিবেচনায় একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে শিক্ষার্থীদের জীবন ও জীবিকার জন্য প্রস্তুত করতে সকল ধরনের শিক্ষা ধারায় মৌলিক (Foundational), পরিবর্তনশীল (Transferable) ও কর্ম সংশ্লিষ্ট (job related) দক্ষতার অন্তর্ভুক্তি ও যথাযথ প্রতিফলন জরুরি। পাশাপাশি এক ধরনের সংগঠিত পথ-নির্দেশনাও প্রয়োজন যেন, যেকোনো ধারার শিক্ষার্থী তাদের অবস্থান, যোগ্যতা, দক্ষতা ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পরস্পর পথ পরিবর্তন করে যথাযথ সহায়তা প্রাপ্তির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ধারার শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। এ লক্ষ্যে সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ধারায় ১ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি বা সমমান পর্যন্ত সকল স্তর ও শ্রেণিতে সমন্বিত ও সুবিন্যস্তভাবে মৌলিক (Foundational) ও পরিবর্তনশীল (Transferable) দক্ষতার যথাযথ অন্তর্ভুক্তি ও প্রতিফলন নিশ্চিত করা হবে।

বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও চাহিদা বিবেচনায় যুগপোযোগী করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টিসহ শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষা নীতিতে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। দেশ ও বিদেশের চাহিদা বিবেচনায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দ্রুত জনশক্তি সৃষ্টি করা এবং দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের আয় বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনাও শিক্ষানীতিতে বিবৃত হয়েছে।এ লক্ষ্যে

Working Draft

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের যুগপোযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নসহ অন্যান্য শিক্ষাধারার সঙ্গে এর সমন্বয়ের বিষয়েও বিভিন্ন দিক নির্দেশনা রয়েছে। চাকুরি বাজারের বিকাশমান ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জনশক্তি তৈরি এবং ভবিষ্যৎ কর্ম-বাজারে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার সংশ্লেষসহ এ ধারার শিক্ষার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, উচ্চ শিক্ষা ও চাকুরির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি বিশ্লেষণে প্রাপ্ত শিক্ষাক্রম-সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপ :

- দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষার সকল ধারার প্রাথমিক স্তর থেকে প্রাক-বৃত্তিমূলক এবং তথ্য ও যোগাযোগ (ডিজিটাল প্রযুক্তি) প্রযুক্তি শিক্ষার অন্তর্ভূক্তি
- অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী কারিগরী শিক্ষা ধারায় ভর্তি হয়ে ধাপে ধাপে তার নির্বাচিত কারিগরি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষায় যাবার সুযোগ।
- অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী যারা মুলধারার শিক্ষায় থাকবে না তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়ে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো অনুযায়ী জাতীয় যোগ্যতা সনদ লেভেল-১ প্রাপ্তির সুযোগ এবং পরবর্তিতে বিটিইবি নিবন্ধনকৃত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আরো প্রশিক্ষণ নিয়ে লেভেল ২ ও ৩ অর্জনের সুযোগ
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারার নবম, দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণি সমাপ্ত করে একজন শিক্ষার্থীর জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো অনুযায়ী যথাক্রমে জাতীয় যোগ্যতা সনদ লেভেল-২, ৩ ও ৪ অর্জনের সুযোগ। এক্ষেত্রে দশম শ্রেণি উত্তীর্ণ এবং জাতীয় যোগ্যতা সনদ ৩ অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির সুযোগ।
- কারিগরি ডিপ্লোমা পর্যায়ের উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা যাচাই করে ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্নাতক পর্যায়ে উচ্চশিক্ষায় ভর্তির সুযোগ; এবং
- প্রত্যেক শিক্ষা ধারায় কিছু মৌলিক বিষয় বাধ্যতামূলক এবং প্রতিটি ধারার স্বাতন্ত্র্য ও আদর্শ মান বজায় রেখে আরো মান উন্নয়ন।

উপরিউক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষানীতি এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিতে বর্ণিত কৌশল এবং জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং এ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর স্তরসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের (টিইভিটি) বিষয় অন্তর্ভুক্তির একটি রূপরেখা নিম্নে দেখানো হলো। একই সঙ্গে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ধারার ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক-উত্তর (ডিপ্লোমা) স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন ধারা থেকে পরস্পর পরিবর্তনের সুযোগ রেখে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের একটি পূর্ণাঙ্গ পথ নির্দেশনা প্রদর্শিত হলো।

Working Draft

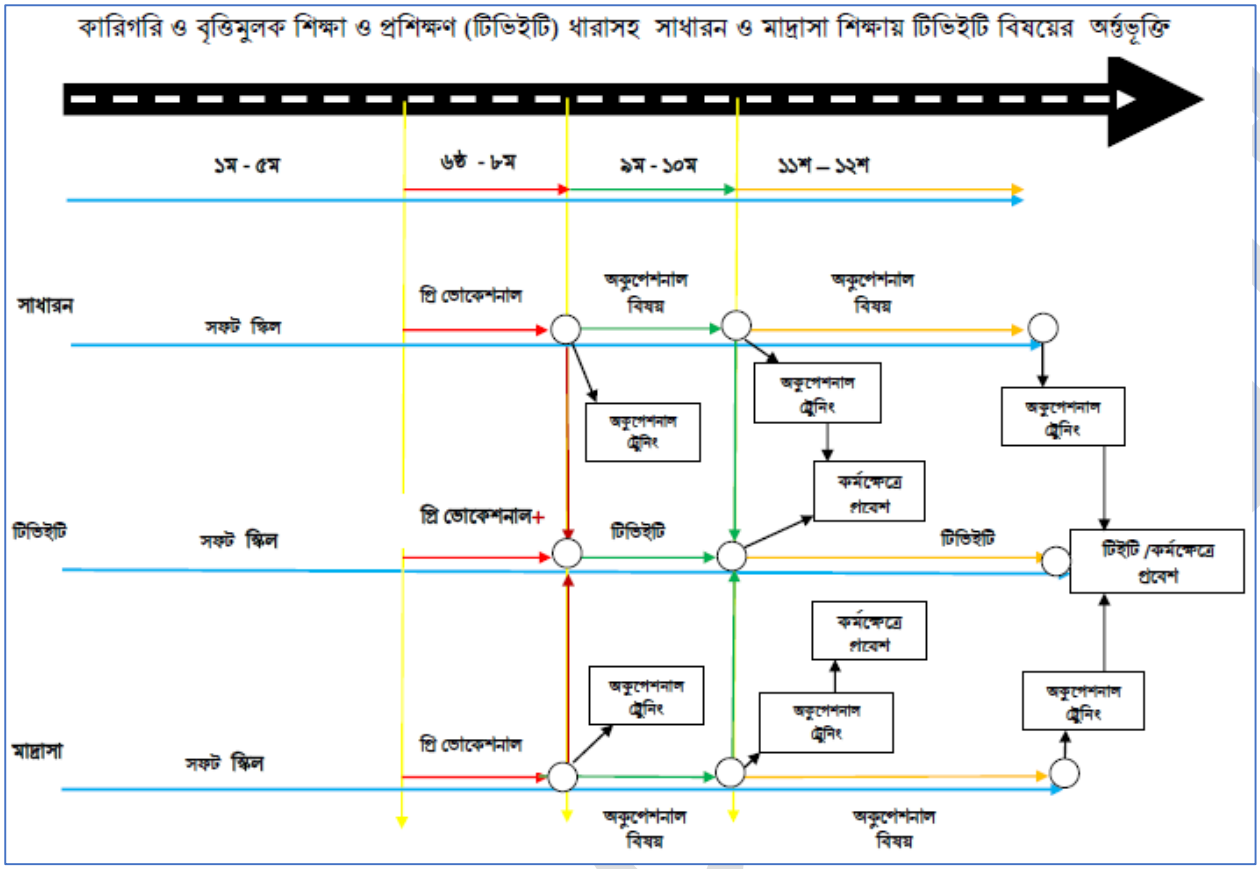

তাছাড়া সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা ধারায় ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে প্রি ভোকেশনাল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হলেও কারিগরি শিক্ষায় তা বর্ধিত কলেবরে হাতে কলমে অনুশীলনসহ থাকবে। একইভাবে কারিগরি শিক্ষা ধারায় দশম শ্রেণি শেষে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশে উপযোগী ন্যূনতম দক্ষতা (লেভেল ৩) অর্জনের ব্যবস্থা থাকলেও সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষায় সে অর্জন সম্পন্ন করতে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে। দশম শ্রেণি শেষে যদি কেউ কারিগরি শিক্ষার সমমানের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ বা পরবর্তী পড়াশোনা কারিগরি শিক্ষা ধারায় করতে আগ্রহী হয় তাহলে অন্তবর্তীকালীন কোর্স বা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে তা করা যাবে। কারিগরি শিক্ষা ধারায় এই অন্তবর্তীকালীন কোর্স বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে যেন সাধারণ বা মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে আগ্রহী শিক্ষার্থীরা তা সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে বা কারিগরি শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারে।

উপরিউক্ত রূপরেখায় সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহের নির্দেশনার প্রতিফলনসহ জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও চাহিদা বিবেচনায় সুপারিশসমূহ নিম্নোক্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার ৮ম ও ১০ম শ্রেণি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের টিভিইটি ধারায় ভর্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অকুপেশনভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- অকুপেশনাল বিষয় ও প্রশিক্ষণ জাতীয় দক্ষতা নীতি এবং জাতীয় কারিগরি-বৃত্তিমুলক যোগ্যতা কাঠামোর (এনটিবিকিউএফ) স্তরসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক-উত্তর (ডিপ্লোমা) পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।
- সাধারণ ও মাদ্রাসা ধারায় সফট স্কিল, প্রি-ভোকেশনাল ও অকুপেশনাল বিষয়সমূহ এমনভাবে বিন্যস্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে এই ধারাদ্বয়কেও টিভিইটি ইনক্লুসিভ শিক্ষা ধারা হিসেবে গন্য করা যায়।

- সর্বোপরি কারিগরি শিক্ষা ধারার স্বাতন্ত্র্য ও নির্ধারিত কাঠামো অনুযায়ী দক্ষতার জাতীয় ও বৈশ্বিক মানদণ্ড অক্ষুণ্ন রেখে শিক্ষাক্রম রূপরেখার সকলের জন্য অর্জিতব্য ১০টি যোগ্যতা অর্জনের নিমিত্তে নির্ধারিত মৌলিক বিষয়সমুহ সমন্বয়ের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রাখা হয়েছে যা আন্তঃধারা বৈষম্য কমাতে সহায়তা করবে।

২.১৯ মাদরাসা শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয়

মাত্রা ভিন্ন হলেও পরিবর্তনশীল পৃথিবী এবং বিশ্বায়নের যুগে সুযোগ এবং সম্ভাবনার যেমন সাধারণীকরণ হয়েছে, তেমনি সকলের সামনের চ্যালেঞ্জ ও বাধাগুলোর ধরনও একই। ন্যূনতম অবশ্য অর্জনীয় দক্ষতাসমূহ না থাকলে সে সব চ্যালেঞ্জ ও বাধা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ধরণের পরিবর্তনের কারণেও প্রতিনিয়ত খাপ খাইয়ে চলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে এবং প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখতে সকল ধারার শিক্ষার্থীদেরই ন্যূনতম মানে সাধারণ (কমন) কিছু যোগ্যতা, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে হয়। এ কারণেই বিভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা সাপেক্ষে বৈষম্য কমিয়ে এনে কতকগুলো মূল যোগ্যতা ও দক্ষতা সকলের জন্য অর্জনযোগ্য নির্বাচন করে শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা ও পরিমার্জন করা জরুরি। জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকার এবং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উন্নত বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সমন্বিত লক্ষ্য ও প্রত্যাশিত যোগ্যতা ও দক্ষতা নির্ধারণের প্রয়াস পেয়েছে। সকলের জন্য বৈষম্যহীন, মানসম্মত এবং সমগ্রহণযোগ্য শিক্ষা নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে প্রণীত শিক্ষাক্রম রূপরেখায় সকল ধারার শিক্ষায় ন্যূনতম অবশ্য অর্জনীয় দক্ষতাসমূহ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যনির্ভর শিক্ষাধারা যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিমার্জনের মাধ্যমে বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। শিক্ষাধারার এ পরিবর্তন নতুন নয়, বরং প্রতিনিয়ত পর্যালোচনা ও পরিমার্জন একদিকে যেমন বিদ্যমান প্রেক্ষাপটের সঙ্গে ধারার সামঞ্জস্যতা বজায় রাখে, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন ধারাসমূহের মাঝে বৈষম্য কমিয়ে যুগোপযোগী হয় এবং বিস্তার লাভ করে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ মাদরাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য কিছু সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলাম ধর্ম শিক্ষার সুযোগ তৈরি করার পাশাপাশি তাই জীবনধারণ-সংক্রান্ত শিক্ষা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে শিক্ষার্থীরা যেন উৎকর্ষতায় ভূমিকা রাখতে পারে তার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এই সুযোগের মাধ্যমে মাদরাসা শিক্ষার্থীরা সাধারণ বা ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমান তালে প্রতিযোগিতায় নিজেদেরকে পারঙ্গম করে বিশ্বনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে।

মাদরাসা শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ স্বরূপ সংক্রান্ত মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড এবং এনসিটিবি-র গবেষণার ফলাফলে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রত্যাশা প্রতিফলিত হয়েছে। গবেষণায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার বিবেচনায় মাদরাসা শিক্ষাকে যুগপোযুগী করার সুপারিশের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে অন্যান্য শিক্ষা ধারার সঙ্গে মাদরাসা শিক্ষার বৈষম্য কমিয়ে মাদরাসা শিক্ষায় যুগের চাহিদা ও ভবিষ্যৎ কর্মজগতের জন্য প্রস্তুতির উপর জোর দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যেন স্বাস্থ্য সচেতনতা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, ডিজিটাল প্রযুক্তিসহ সামাজিক বা অন্যান্য ক্ষেত্রে পিছিয়ে না পরে তা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ গবেষণায় উঠে এসেছে। শ্রেণি-কার্যক্রমকে আনন্দদায়ক, বহুমুখী ও কার্যক্রমনির্ভর করে দক্ষতা ও যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন চালুর সুপারিশের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর যথাযথ শিখন অর্জনে গঠনকালীন মূল্যায়ন প্রয়োজন বলেও অংশীজনরা মতামত দিয়েছেন।

যৌক্তিকতা, নীতি-নির্দেশনা, ঐতিহাসিক পটভূমি এবং সর্বোপরি অংশীজনদের মতামত বিশ্লেষণে মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বিত ও সর্বজন প্রত্যাশাসমূহ নিম্নরূপ :

- সকল শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষাক্রম রূপরেখায় বর্ণিত ১০টি মূল যোগ্যতা অর্জনের ব্যবস্থা;
- সাধারণ বা অন্যান্য শিক্ষাধারার সঙ্গে মাদরাসা শিক্ষার বিদ্যমান বৈষম্য (বিষয়, বিষয়বস্তু, নম্বর, সময়, ভর ইত্যাদি) কমিয়ে এনে যুগোপযোগীকরণের মাধ্যমে অন্যান্য ধারার সঙ্গে সমযোগ্যতা ও সমগ্রহণযোগ্যতা যেন নিশ্চিত হয় সে লক্ষ্যে পরিমার্জনের উদ্যোগ;
- মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ
- পরিবর্তনশীল কর্মবাজারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের ব্যবস্থা;
- শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সার্বিকভাবে সুস্থ ও ভালো থাকার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ;
- শিল্প, সংস্কৃতি, খেলাধুলা ইত্যাদি ধর্মীয় নীতি নির্দেশনা ও ভাব গাম্ভীর্যের আলোকে সংযুক্ত ও চর্চার সুযোগ;
- স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সাধারণ শিক্ষায় প্রস্তাবিত ১ম থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত মৌলিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও বিষয় চালুর প্রায়োগিক ধারণাটি বিবেচনা করা;
- ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল সমন্বয়ের মাধ্যমে শিখন শেখানো কার্যক্রম আনন্দদায়ক, অংশগ্রহণমূলক, অভিজ্ঞতাভিত্তিক এবং বহুমুখী করা;
- যোগ্যতা ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পাশাপাশি শিখনকালীন ধারাবাহিক মূল্যায়নকে গুরুত্ব দক্ষতা ও যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন চালু;
- ধর্মীয় শিক্ষার গভীরতা ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ;
- শিক্ষাক্রম রূপরেখায় বর্ণিত মূল্যবোধ, গুণাবলি, দক্ষতা, যোগ্যতা ও মূলনীতি অনুসরণ করে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন।

উপর্যুক্ত প্রত্যাশা, মতামত এবং সর্বজনগ্রাহ্য পরামর্শের সফল প্রতিফলনে মাদরাসা শিক্ষাক্রম পরিমার্জনে নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহ অবলম্বন করা হবে :

- ১০টি মূল যোগ্যতা অর্জনকে প্রাধান্য দিয়ে বিষয়নির্ভরতা কমিয়ে যোগ্যতা ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন;
- যে বিষয়বস্তুসমূহ নিশ্চিতভাবেই থাকতে হবে তা নির্ধারণ করে নিজস্বতা/স্বকীয়তা বজায় রেখে পরিমার্জন করা;
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মুখস্থনির্ভরতা কমিয়ে যোগ্যতাভিত্তিক অভিগমনে (অ্যাপ্রোচে) কার্য ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন পদ্ধতির মাধ্যমে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করে বিষয় এবং বিষয়বস্তুর ভার কমানো;
- ধারার স্বকীয়তা বজায় রেখে সমন্বিত প্রক্রিয়ায় আন্তঃবিষয় এবং আন্তঃশাখাভিত্তিক কৌশল প্রয়োগ করে বিষয় এবং বিষয়বস্তুর ভার, সময়, নম্বর ইত্যাদির বৈষম্য কমিয়ে আনা;
- নীতি-নির্দেশনা ও গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা এবং রূপরেখার মৌলিক নির্দেশনাসমূহ অনুসরণে কারিগরি অনুশীলনের মাধ্যমে শিখন-ক্ষেত্র ও বিষয়-সংক্রান্ত পদ্ধতিগত বৈষম্য কমিয়ে আনা;
- অবশ্য গ্রহণীয় বিষয়সমূহ অগ্রাধিকারভিত্তিতে চিহ্নিত করে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিদ্যমান বৈষম্য কমানো;
- শিক্ষার্থী যেন অন্য যেকোনো ধারায় শিক্ষার সমান সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা রাখা;
- বিষয়, বিষয়বস্তুর প্রাধান্য কমিয়ে যোগ্যতা ও দক্ষতাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা;

শিক্ষা-কার্যক্রম শেষে একজন শিক্ষার্থীর কাছে যে প্রত্যাশা থাকে তা যথাযথভাবে অর্জন হচ্ছে কিনা সে বিষয় বিবেচনায় নিয়ে পরিমার্জন কার্যক্রম পরিচালনা করলে বিষয়বস্তুর ভার অনেকাংশে কমানো সম্ভব। শিক্ষার্থীকে অনেক বেশি বিষয়বস্তু না দিয়ে কি করে অন্বেষণ বা অনুসন্ধান করে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি বা

Working Draft

যোগ্যতা অর্জন করতে হয় তা শেখানো গেলেই জীবনব্যাপী শিখনের ক্ষেত্র তৈরি করে দেখা সম্ভব। আর মৌলিক শিক্ষার লক্ষ্য সেটাই।

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, মাদরাসা অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। শিক্ষাক্রম রূপরেখা ও নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে পরিমার্জন সাধিত হবে।

২.২০ শিক্ষাক্রম বিস্তরণ (Curriculum Dissemination)

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ গুণগত পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে। এই পরিবর্তন সম্পর্কে সকল অংশীজনকে পরিপূর্ণ ও সঠিক ধারণা প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ। সকল পর্যায়ে একই ধারণা প্রদান করা না গেলে শিক্ষাক্রমের সঠিক ও সফল বাস্তবায়ন অসম্ভব। কাজেই বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় শিক্ষাক্রম কাঠামো, শিক্ষাক্রমের ধারণার ব্যপক বিস্তরণের জন্য একটি যোগাযোগ ও বিস্তরণ কর্ম-কৌশল গ্রহণ করা হবে। এই কর্ম পরিকল্পনার আওতায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক, বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষক, নীতি নির্ধারক পর্যায়ের ব্যক্তিদের দায়িত্ব ও ভূমিকা পর্যালোচনা করে আলোচনা, সেমিনার, যোগাযোগ উপকরণ তৈরি, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা প্রভৃতি আয়োজন করা হবে। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ একদিকে যেমন সরাসরি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যমে বিস্তরণ ঘটানো হবে, সেই সঙ্গে আইসিটি ব্যবহার করে বিভিন্ন মিডিয়াতে অনলাইন ও অফলাইন বিস্তরণের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালন করবেন শিক্ষক সমাজ। প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের পূর্বেই সকল শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট স্টাফের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষাক্রম বিস্তরণে অফলাইন ও অনলাইন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রস্তুত করা হবে।

এনসিটিবি প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম বিস্তরণের জন্য মাস্টার ট্রেইনার পুল তৈরি করবে। পরবর্তী কালে ২০২২ সাল থেকে সারা দেশব্যাপী শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের পূর্বেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করবেন।

এছাড়াও এনসিটিবি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ও ইস্যুভিত্তিক অনলাইন কোর্স চালু করবেন।

২.২১ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও প্রচলনের পর অংশীজনদের প্রত্যাশা শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়ন। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জন। শিক্ষাক্রম রূপরেখার পরিমার্জন ও পরিবর্তনসমূহ বিবেচনায় নিয়ে যথাযথভাবে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করতে হলে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে তার যথাযথ গ্রন্থণ, অনুধাবন, অনুশীলন, প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা জরুরি। অন্যথায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিমার্জন বা সংস্কার ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নও গুরুত্বপূর্ণ। যে সকল পর্যায়ে উন্নয়ন বা সংস্কার অত্যাবশ্যক সেগুলো হলো:

Working Draft

ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষাক্রম, বিষয় ও শিখন-শেখানো পদ্ধতির চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত দক্ষ, পেশাদার, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক - শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের মূল চালিকা শক্তি হলেন শিক্ষক। শ্রেণিকক্ষ বা এর বাইরে পরিকল্পিতভাবে যে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হবে তার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষাক্রমের যোগ্যতাসমূহ অর্জন করবে। সুতরাং শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন নতুন বিষয় ও শিখন-শেখানো পদ্ধতির চাহিদা অনুযায়ি পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ, পেশাদার, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক। প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম রূপরেখায় শিখন ক্ষেত্র, যোগ্যতা ও তার বাস্তবায়ন কৌশলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা, দায়িত্ব, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে তার প্রতিফলন প্রয়োজন। বিদ্যমান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ি পেশাদার শিক্ষক নিয়োগ করে এ পরিবর্তন পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। একইসঙ্গে বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেকোনো জরুরি অবস্থায় শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতা থাকাও একজন শিক্ষকের জন্য অতীব জরুরি। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষক উন্নয়ন মানদণ্ড নির্ধারণ করে সে অনুযায়ি শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে শিক্ষাক্রম রূপরেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। বিদ্যমান শিক্ষক এবং ভবিষ্যতে যারা নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন তাদের নিয়ে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে সকল বিদ্যালয়ে প্রয়োজন অনুযায়ি শিক্ষক নিয়োগ করার এ কার্যক্রম যত দ্রুত সম্ভব শুরু করতে হবে।

বিদ্যালয়ভিত্তিক ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদিসহ সামাজিক পরীক্ষাগার (সোস্যাল ল্যাব), বিজ্ঞান ল্যাব, আইসিটি ল্যাব, আইটি অবকাঠামো স্থাপন ও প্রয়োজনীয় নন টিচিং ষ্টাফ - একুশ শতকের শিক্ষা ব্যবস্থার চাহিদা অনুযায়ি প্রণিত রূপরেখার সফল বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ের পরিমার্জিত নকশা প্রণয়নে আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন ভৌত অবকাঠামোর সংগে ব্যায়ামাগার, সুইমিংপুল ইত্যাদি সংযুক্ত করা যেতে পারে। তাছাড়া শিক্ষাক্রমের গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতাসমূহ অর্জন নিশ্চিত করার স্বার্থে বিদ্যালয়ে সামাজিক পরীক্ষাগার (সোস্যাল ল্যাব), বিজ্ঞান ল্যাব, আইসিটি ল্যাব ও আইটি অবকাঠামো স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে। একই সংগে বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় নন টিচিং ষ্টাফ নিয়োগের ব্যবস্থা করাও অত্যন্ত জরুরী।

উপযুক্ত শিখন পরিবেশ - শিক্ষাক্রমের উল্লিখিত শিখন যোগ্যতা অর্জনের জন্য বিদ্যালয় পর্যায়ে যথাযথ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। শিখনের সার্বজনীন ডিজাইন অনুযায়ি প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধাদির পাশাপাশি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর যথাযথ সংখ্যা, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও নিয়মিত স্টেশনারি সরবরাহ, অভিভাবকসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ, স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ইত্যাদিও মাধ্যমে কার্যকর শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

কার্যকর শিখন-শেখানো সামগ্রী: শিখন যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষকের পাশাপাশি শিখন-শেখানো সামগ্রী বড় ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার্থীদের বয়স, বিকাশের পর্যায়, আগ্রহ বিবেচনায় নিয়ে যথাযথ শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখন যোগ্যতা অর্জনের জন্য কার্যকর শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও সামগ্রী উন্নয়ন করতে হবে। প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম রূপরেখার যোগ্যতাসমূহ অর্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্ভরতা কমিয়ে শিক্ষক নির্দেশিকা ও অন্যান্য সম্পূরক পঠন-সামগ্রীর ওপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কারণ শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতাসমূহ অর্জনের জন্য প্রাসঙ্গিক শিখন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে যা শিক্ষক নির্দেশিকাতে উল্লেখ থাকবে। তাছাড়া বিদ্যালয়, সমাজ ও চারপাশের পরিবেশ শিক্ষা কার্যক্রমের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করবে। সুতরাং শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন প্রয়োজনীয় শিক্ষক নির্দেশনা এবং সঠিক সময়ে সামগ্রিক পরিবেশ ও কার্যকর মাল্টি সেন্সরি শিখন-শেখানো সামগ্রীর সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

বিদ্যালয়ের সাথে তার আশেপাশের সেবাখাত, শিল্প খাত, ব্যবসা, স্থানীয় সরকার ও সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিখন সম্পর্ক - শিক্ষার্থীরা পরিকল্পিতভাবে পরিবার, সমাজ, আশেপাশের সেবা, ব্যবসা ও

সামাজিক অন্যান্য খাতসহ জনপ্রশাসন খাতের সংগে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত হবে এবং সেখানে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করবে, অনুসন্ধান করবে, ধারণা পরখ করবে এবং এর মাধ্যমে তারা জ্ঞান, দক্ষতা, চেতনা, গুণাবলি ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাবে। ফলে বিদ্যালয়ের সংগে বর্ণিত খাতসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য যে, শিক্ষাক্রম রূপরেখার সফল বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের বাইরের সময়কেও কার্যকর শিখন সময় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা পদ্ধতিগতভাবে কার্যকর শিখনের জন্য নিবিষ্ট হবে।এজন্য বিদ্যালয়ের সংগে এ নিবিড় যোগাযোগঅত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে পরিবার ও সমাজ যেমন শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনে সহযোগিতা করবে সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ও তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে পরিবার ও সমাজকে সংযুক্ত করবে।

কারিগরি স্কুল ও কলেজের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ - শিক্ষাক্রম রূপরেখায় সাধারন ও কারিগরী শিক্ষার সংগে যে সমন্বয় সাধনের কৌশল বর্ণিত হয়েছে তার যথাযথ বাস্তবায়নে কারিগরি স্কুল ও কলেজের সাথে বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ স্থাপন জরুরী। তাছাড়া সাধারণ শিক্ষায় জীবন ও জীবিকা বিষয়ের কার্যকর বাস্তবায়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষা থেকে কারিগরী শিক্ষায় স্থানান্তরের প্রয়োজনে কিংবা দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ তৈরির জন্যও এ প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ স্থাপন করা জরুরী।

বিদ্যালয়কে সামাজিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা (School as Social hub) - শিক্ষাক্রম রূপরেখায় শিক্ষার ধারণায়ন এবং কৌশলে যে পরিবর্তন ও পরিমার্জন প্রস্তাব করা হয়েছে তার সফল বাস্তবায়নে বিদ্যালয়কে সামাজিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। বিদ্যালয়ের সংগে সমাজ ও তার উপাদানসমূহের প্রত্যক্ষ সংযুক্ততা শিক্ষার কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করবে যা একুশ শতকের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম অনুষঙ্গ।

খ) শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ের পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থায়ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিমার্জন, পরিবর্তন বা সংস্কার জরুরী। নিম্নে তেমনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করা হলো।

শিক্ষাক্রম রূপরেখা অনুযায়ি প্রণীতব্য শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নে-

- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের ধারণায়ন, কৌশল, পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর সাথে শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের সমন্বয় করা প্রয়োজন।
- সমন্বিত ও ধারাবাহিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা জরুরী। তাছাড়াও শিক্ষকদের প্রাক-চাকুরী যোগ্যতা ও দক্ষতা নির্ধারণ, মানদন্ড তৈরির মাধ্যমে সুস্পষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রশিক্ষণ এবং কৌশল নির্ধারণ করে শিক্ষকদের ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুগোপযোগি করে তোলা প্রয়োজন।
- শিক্ষা প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকদের জন্যও শিক্ষাক্রমের ধারণায়ন, কৌশল, পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন যেন তারা বিদ্যালয়কে কার্যকর সহায়তা দিতে পারে।
- কার্যকর মনিটরিং ও মেন্টরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে একটি বিশ্বস্ত, গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা তৈরি করা প্রয়োজন।
- ব্যক্তি নিরপেক্ষ/ নৈর্বক্তিক শিখনকালীন মূল্যায়ন কাঠামো ও ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা জরুরী। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ক্ষমতায়নে সবোর্চ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে একটি বিশ্বস্ত, গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা তৈরি করা প্রয়োজন।

- শিক্ষাক্রমের দর্শন, ধারণায়ন, কৌশল, পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর সাথে উচ্চশিক্ষা ও এসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয় করা প্রয়োজন, যেমন; ভর্তি প্রক্রিয়া, বিষয়, শিক্ষাক্রম, আন্ত:বিষয়ক ব্যবস্থাপনা ও সংযোগ ইত্যাদি।

- শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ছাড়াও বাস্তবায়নে এনসিটিবি এর ভূমিকা সুনির্দিষ্টকরণ করা প্রয়োজন যেন শিক্ষাক্রমের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ি গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন, পরিবর্ধন, পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা না করে প্রতিনিয়ত একাজ চলমান রাখা যায়। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন মনিটরিং, মুল্যায়ন, গবেষণা এবং প্রয়োজন অনুযায়ি পরিমার্জন একুশ শতকের শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যার জন্য পেশাদার, দক্ষ বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন।

- বাস্তবায়নের সংগে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ে **বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ মহাপরিকল্পনা** প্রণয়ন ও তার সমন্বিত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সঠিক ও সতর্কতার সংগে কারিগরি ধাপসমূহ অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে না করলে কার্যকর ফলাফল প্রাপ্তির চেয়ে বাস্তবায়ন দুর্যোগের সম্ভাবনা বেশী থাকে এবং কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হয় না।

- শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষকসহ সকল অংশীজনের সক্রিয় সমর্থন ও অংশগ্রহণের জন্য **সমন্বিত গণযোগাযোগ কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন** করা প্রয়োজন। সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণ বাস্তবায়ন বাধাঁ সহজেই দূরিভূত করে ফলে কার্য়কর ফলাফল দ্রুত অর্জন করা যায়।

গ) নীতি ও পরিকল্পনা

শিক্ষাক্রম রূপরেখা অনুযায়ি প্রণীতব্য শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতি নির্দেশনার পরিমার্জন যেমন প্রয়োজন হতে পারে তেমনি নতুন নির্দেশনারও প্রয়োজন হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, অর্থায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে নীতি নির্দেশনার সুযোগ রেখে প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নিতে এ ক্ষেত্রে নিম্নবর্নিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপিত হলো;

- শিক্ষানীতি ২০১০ এর পরিমার্জনে শিক্ষাক্রম রূপরেখায় বর্ণিত বিষয়সমূহের যথাযথ প্রতিফলন এবং বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা অন্তর্ভূক্তকরণ
- শিক্ষাক্রম রূপরেখায় বর্ণিত পরিবর্তন ও পরিমার্জনসমূহ শিক্ষা ব্যবস্থাসহ সকল পর্যায়ের অংশীজনের যথাযথভাবে অনুধাবন, প্রযোজ্য স্থানে প্রতিফলন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি-নির্দেশনা, কৌশল, পরিকল্পনা ও অর্থায়ন
- শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, দক্ষতা, ক্ষমতায়ন ও অর্থায়নের উদ্যোগ
- শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত অংশীজনদের সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার মধ্যে সম্পৃক্তকরণ যেন পুরো ব্যবস্থার পারদর্শিতা সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ করে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা সেয়া যায়।
- শিক্ষায় টেকনোলজির ব্যবহার এবং তার সহজ প্রাপ্তি ও ব্যবহারে প্রয়োজনীয় নীতি নির্দেশনা প্রণয়ন।

Working Draft

Bibliography

A

Ahsan, M. T., Sharma, U., Deppeler, J. (2012) Challenges to prepare pre-service teachers for inclusive education in Bangladesh: beliefs of higher educational institutional heads. *Asia Pacific Journal of Education (APJE), 32*(2); 1-17. Available at: DOI: 10.1080/02188791.2012.655372

Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: What are the levers for change? *Journal of Educational Change* 6: 109-124.

Ajzen, Icek (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes. 50*(2), 179–211.

acara (), *Australian Curriculum*. Australian curriculum assessment and reporting authority

acara. (2010). *Information and Communication Technology (ICT) competence.* Retrived from http://consultation.australiancurriculum.edu.au/GeneralCapabilities/ICT/ConceptualStatement

Albrecht, K. (2004). *Social Intilligence theory.* K A International

Asian Centre for Inclusive Education-ACIE (2017). *Inclusive Education Working Paper Series 1: Redefining the Concept and Actions for Inclusive Education*. Dhaka: ACIE.

B

Basic Education. (2020). Retrieved from https://www.oph.fi/en/education-system/basic-education

Benchmarks Online ~ Project 2061 ~ AAAS. (2020). Retrieved from http://www.project2061.org/publications/bsl/online/index.php?home=true

Brookings. (2016). *Brookings Annual Report*. Washington DC: The Brookings Institution. Retrieved from https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/12/2016-annualreport.pdf

Building Student Success - BC's New Curriculum. (2020). Retrieved from https://curriculum.gov.bc.ca/

bcsea. (2019). *National Education Assessment Framework 2019*. Bcsea-RGB

Brolpito, A. (2018). *Digital skills and competence, and digital and online learning*. ETF

C

Curriculum for the compulsory school, preschool class and school-age educare (revised 2018). (2020). Retrieved 1 November 2020, from https://www.skolverket.se/publikationer?id=3984

Care, E. (2020). *Optimizing assessment for all: Assessment as a Stimulus for Scaling 21st Century Skills in Education Systems.* Brookings

Commonwealth of Australia, (2005). *National Framework for Values Education in Australian Schools.* DEST, Australian Government.

Working Draft

Cheng, K. & Jackson, L. (2017). *Advancing 21 century competencies in Hong Kong*. Asia Society.

Curiculum for excellence – Religious and moral education -Principles and practice. Retrived from www.curriculumforexcellencescotland.gov.uk

Common core state standards for mathematics.

D

DPE (2011). *Third primary education development programme (PEDP3): Main document*. Dhaka: DPE.

E

Education - OECD. (2020). Retrieved from https://www.oecd.org/education/

F

F-10 curriculum. (2020). Retrieved from https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/

Fosnot, C. T. (1996). *Constructivism: Theory, perspectives and practice*. NY: Teahers College Press.

Future of Education and Skills 2030 – OECD. (2020). Retrieved from https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/learning-compass-2030/

Fraillon, J., Ainley, J., Schulz, W., Duckworth, D., Friedman, T (2018). *Computer and information literacy Assessment Framework.* IEA-ICILS

G

Gardner, H. (1983). *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. New York: Basic Books.

Gromada, A. & Shewbridge, C. (2016) *Student Learning Time: A literature review.* OECD - Education working paper -127

Great Schools Partnership (). *The principles of competency-based learning*. CCA

Grayson, H., Heron, M., O'Donnell, S., Sargent, C., Sturman, L., Taylor, A. (2014). *Education about Religions and Beliefs and Ethics in Primary Education*. NFER

H

Hwb. (2019). *Health and Well-being* retrived from https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/health-and-well-being/

Working Draft

Herman, B. & Collins, R. (2018). *Social and Emotional Learning Competencie.* Wisconsin Department of Public Instruction

I

Innovation Unit, Aga Khan Education Services and the Aga Khan Foundation (2018) *Raising Learning Outcomes: the opportunities and challenges of ICT for learning.* UNICEF Eastern and Southern Africa Regional Office and West and Central Regional Office, Nairobi.

IBE UNESCO. (2017). *Prototype of a national curriculum framework*. IBE-UNESCO

Ioannidou, F. & Konstantikaki, V. (2008). *Empathy and emotional intelligence: What is it really about?* International Journal of Caring Sciences, 1(3):118–123

J

K

Kabita, D. & Ji, L. (2017). *The Why, What and How of Competency-Based Curriculum Reforms: The Kenyan Experience*. IBE-UNESCO

KICD (2017). *Basic Education Curriculum Framework*. KICD-Kenya

L

Levine, E. & Patrick, S. (2019). *What is competency-based education? An updated definition.* Vienna, VA: Aurora Institute.

Lewin, L., McNicol, S. (). *Supporting the Development of 21st Century Skills through ICT.* Manchester Metropolitan University

M

Matthes, M. Pulkkinen, L. Clouder, C. Heys, B (2018). *Improving the Quality of Childhood in Europe.* Alliance for Childhood European Network Foundation, Brussels, Belgium

McMaster University (2018). *Fostering K-12 Students' Global Competencies*. Forum+

Ministry of Education, Namibia (2016). *National Curriculum for Basic Education.* NIED-MOE

N

National curricula 2014 | Estonian Ministry of Education and Research. (2020). Retrieved from https://www.hm.ee/en/national-curricula-2014

National Research Council. (2012). *A framework for K-12 science education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas*. National Academies Press.

Working Draft

NCERT. (2017). *Curricula for ICT in Education*. NECRT

Department of Education (2014). *National Curriculum standards and Benchmark Mathmatics Grade I t0 XII*. Department of Education FSM

O

OECD. (2020). *Learning Framework 2030*. Author. Retrieved from http://www.oecd.org/education/2030/learning-framework-2030.htm/

Ogwora et al. (2013). Philosophy as a key instrument in establishing curriculum, educational policy, objectives, goals of education, vision and mission of education. *Journal of Education and Practice, 4*(11), 95-101.

P

PISA 2021: Mathematics Framework. (2020). Retrieved from https://pisa2021-maths.oecd.org/

PISA 2021: ICT Framework (2020). Retrieved from https://www.oecd.org/pisa/sitedocument/PISA-2021-ICT-Framework.pdf

PISA (2018) *Preparing our youth for an inclusive and sustainable world The OECD PISA global competence framework*. OECD

Pre-school Education Unit (). *Nurturing Early Learners – A Framework for a Kindergarten Curriculum in Singapore.* Ministry of Education, Singapore.

Q

Quebec Education Program. (2011). *Progression of Learning in Secondary School-Ethics and Religious Culture.* QEP

QAA. (2014). *Subject benchmark statement – Theology and religious study*. QAA

R

Richardson, V. (1997). *Constructivist teacher education*. London: The Falmer Press.

S

Siemens, G. (2004). *Connectivism: A learning theory for the digital age.* Retrieved from http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm

Steffe, L. P., & Gale, J. (Eds.). (1995). *Constructivism in education*. NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Stabback, P. (2016). *What Makes a Quality Curriculum?* IBE-UNESCO

Working Draft

scsa (2017). *Health and Physical Education*. School curriculum and standards authority, Western Australia.

Schols, M. & Bottema, J. (2014). *A National ICT Competency Framework for Student Teachers.* ResearchGate

SEAMEO (2012). *K to 12 Toolkit*. *Philippines* SEAMEO INNOTECH

T

The Digital Competence Framework 2.0 - EU Science Hub - European Commission. (2020). Retrieved from https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework

The Economist. (2018). *Worldwide educationg for the future index 2018*. The Economist intelligence unit.

U

UNESCO. (2016). *UNESCO strategy on Education for Health and Well-being.* UNESCO

UNESCO (2018) *UNESCO ICT Competency Framework for Teachers*. UNESCO

V

Vitikka, E. & Krokfors, L. & Hurmerinta, H. (2012). *The Finnish National core curriculum: Structure and Development.*

Valencia, T., Serna-Collazos, A., Ochoa-Angrino, S., María Caicedo-Tamayo, A., Andrés Montes-González, J., David Chávez-Vescance, J. (2016) *ICT standards and competencies from the pedagogical dimension: A perspective from levels of ICT adoption in teachers' education practice*. Pontificia Universidad Javeriana

W

World Economic Forum (2015). *New Vision for Education - Unlocking the Potential of Technology*. WEF

World Economic Forum (2020). *School of the future- Defining New Models of Education for the Fourth Industrial Revolution.* WEF

World Economic Forum (2014). *Education and Skills 2.0.*

WEF (2014). *What's The Difference Between ICT Capabilities & the Digital Technologies Learning Area?* Retrived from https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/systems-thinking

Z

CDC, (2013). *Zambia Education Curriculum Framework.* MOESVTEE, Zambia.

Working Draft